Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সীরাহ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রুমানা খাতুন

রোলঃ 227020380

২৫ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সীরাহ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রুমানা খাতুন

রোলঃ 227020380

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "সীরাহ" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে রুমানা খাতুন, আইডিঃ 227020380 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ সীরাহ ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৫ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

রুমানা খাতুন

আইডিঃ 227020380

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 1

বংশ পরিচিতি, জন্ম ও শৈশব 3

দুধ পান ও শৈশব 7

বক্ষ বিদারন 10

নবীজীর মায়ের ইন্তেকাল: 10

আব্দুল মুত্তালিবের ইন্তেকাল 11

শাম সফরে নবীজী 11

ব্যবসার কাজে দ্বিতীয়বার শাম সফর 12

নবীজীর বৈবাহিক জীবন 13

কাবা পুনঃ নির্মাণ 17

নবুয়াত জীবনের পূর্ব মুহূর্ত 19

নবুয়াহ, দাওয়া এবং প্রতিক্রিয়া 22

ওয়াহী: আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত ঐশী বাণীর বিভিন্ন রূপ 29

প্রকাশ্য দাওয়াতের শুরু 33

প্রকাশ্য দাওয়াতের পর মদিনায় প্রতিক্রিয়া 38

চরিত্র হননের চেষ্টা 42

ইসলামকে বিকৃত করে উপস্থাপন করা 46

দু:খের বছর 57

তায়েফের দিন 59

ইসরা ও মিরাজ 61

আকাবার বাইয়াত 76

আকাবার দ্বিতীয় শফথ 81
বাইয়াতের রাত 85
হিজরতের পটভূমি -গুপ্ত হত্যার চেষ্টা 91
হিজরতের সিদ্ধান্ত: 93
বাসভবন ঘেরাও 94
মদীনার পথে 95
হুলিয়া জারি ও মাথার দাম ঘোষণা 98
মদিনার আর্থ সামাজিক কাঠামো 104
ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা 106
কিবলার পরিবর্তন 117
সামরিক অভিযানের শুরু 119
গাজওয়া ও সারিয়া: 119
গাজওয়া বদর-বদর যুদ্ধ 124
খন্দকের যুদ্ধ 136
হুদায়বিয়ার সন্ধি 138
বিদায় হজ্জ 152
জীবন সায়াহ্নে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 158
বিদায়বেলা 163
নবীজীর দাফন 174
ফেরার পথে 178

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর নগণ্য কিছু বান্দাকে তাঁর শ্রেষ্ঠতম বান্দার জীবনকথা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার তৌফিক দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ হচ্ছেন এমন একজন, চৌদ্দশো বছর পরেও যাকে নিয়ে মুগ্ধতা এতটুকু কমেনি। যারা তাকে জেনেছে, তারা তাঁকে ভালোবেসেছে; যত বেশি জেনেছে, তত বেশি ভালোবেসেছে। যারা তাঁকে জানেনি, তাঁরা ভালোবাসার নদী দেখলেও মহাসমুদ্র দেখেনি। না-দেখেও যাকে পৃথিবীর মানুষ সবচাইতে বেশি ভালোবেসেছে, তিনি হলেন রাসূলুল্লাহ।

গল্পের নায়কদের কথা মানুষ খানিক বাদেই ভুলে যায়, ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের প্রভাব টিকে থাকে বড়জোর কয়েকটা বছর, কিন্তু রাসূলুল্লাহ । এমন একজন যাকে এত বছর পরেও লোকেরা ভালোবাসে, তাঁর অনুসরণ করে, তাঁর সম্মানে নিজের জীবন দিয়ে দেয়। জীবদ্দশায় আবু জাহেলরা তাঁকে ভয় করতো, মৃত্যুর পরে আবু জাহেলের উত্তরসূরিরা তাঁর অনুসারীদের ভয় করে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, যে জাতির কাছে 'মুহাম্মাদ' আছে, সে জাতিকে আজ টং এর মামা থেকে শুরু করে বারাক ওবামা প্রত্যেকেই দিকনির্দেশনা দিতে ব্যতিব্যস্ত। মুসলিমদের আজকে অমুসলিমরা ইসলাম শেখায়, উন্নয়ন আর সমৃদ্ধির সবক দেয়। বিষয়টা লজ্জা আর গ্লানির।

আমরা রাসূলুল্লাহকে চিনলেও তাঁকে আমরা জানিনা। জানিনা বলেই তিনি কারো কাছে নিছক একজন 'ভালো মানুষ', আর দশজন মনীষির মতো, যারা কিনা কিছু দার্শনিক তত্ত্ব আর নীতিকথা বলে খালাস! কিংবা কারো কাছে তিনি একজন 'ধর্মপ্রচারক', কিছু ভালো ভালো কাজ করেছেন, এই যা!

কিন্তু তাঁর আসল পরিচয় হচ্ছে তিনি একজন রাসূল। তিনি একটা গ্লোবাল মিশন নিয়ে এসেছিলেন এবং আমরা সেই মিশনের অংশ। আল্লাহ এই সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটিকে পাঠিয়েছেন আমাদের জীবনের প্রতিটি বিষয়ে পথ দেখানোর জন্য। তিনি মানুষকে সেই পথ দেখিয়ে গেছেন যে পথ খুঁজে পেতে আমাদের বুদ্ধিজীবী-দার্শনিক-বিজ্ঞানী- আমলারা মাথা কুটে মরে, কিন্তু সমাধান খুঁজে পায় না।

এই সমস্যার একটিই সমাধান। তা হলো রাসূলুল্লাহকে জানা। আর জানার জন্যই তাঁর সীরাহ পড়া। রাসূলুল্লাহর সীরাহ হচ্ছে তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর ব্যক্তি জীবন, তাঁর নবিজির নবুওয়াত, তাঁর নেতৃত্ব এবং তাঁর চারপাশের মানুষগুলো নিয়ে একটি চমৎকার কাহিনীপ্রবাহ। রাসূলুল্লাহর সীরাহ পড়লে ইনশা আল্লাহ, ইসলাম সম্পর্কে আমাদের সংকীর্ণ ধারণার দেয়ালগুলো ভেঙে যাবে। রাসূলুল্লাহর জীবন সম্পর্কে জানলে, ইসলামবিদ্বেষীদের প্রোপাগান্ডা শুনে আমাদের মনে যে 'খচখচ' হয় সেটা দূর হয়ে যাবে, বিইযনিল্লাহ। আমরা জানব রাসূলুল্লাহ কত চমৎকার একজন মানুষ ছিলেন। তিনি কারো মন জয় করতেন, কাউকে রুখে দিতেন, আর কাউকে মোকাবিলা করতেন। নিজের ঘর থেকে শুরু করে যুদ্ধের ময়দান প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্ব। যারা তাঁকে ভালোবেসেছে, তাদের জীবন আমূল বদলে গেছে, যে জাতি তাঁর অনুসরণ করেছে, তাদের ভাগ্য বদলে গেছে। এমন একজন মানুষ সম্বন্ধে যদি আমরা না জানি, না মানি, তাহলে তো আমরাই 'মিস' করলাম!

আদর্শিক দৈন্যতার কারণে ইতিহাস বলতে হয়তো আমরা ৫২ বা ৭১ এর আগে কিছু চিন্তা করতে পারি না, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ও তাঁর সাহাবাদের ইতিহাসের সামনে সকল ইতিহাসই ম্লান। পৃথিবীর যত বিপ্লব, তার সবক'টা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কিছু পরিবর্তন করে কয়েক দশক বা সর্বোচ্চ কয়েক শতক পরেই হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। কিন্তু যে বিপ্লবের সূচনা রাসূলুল্লাহ করেছেন, সেটা চলবে ততদিন, যতদিন না মুসলিম জাতির সমগ্র পৃথিবীর উপর বিজয়ী হবে।

বাংলা ভাষায় রাসূলুল্লাহর একাধিক সীরাহ থাকা সত্ত্বেও আমরা এই সীরাহতে হাত দিয়েছি মূলত দুটি কারণে। একটা হলো, মুসলিমরা সীরাহকে গল্প হিসেবে পড়ে, কিন্তু সেখান থেকে কিছু শেখে না। এই সমাজের আবু জাহেল কিংবা মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবন উবাইদেরকে তারা চিনতে পারে না। এই সীরাহতে প্রায় প্রতিটি ঘটনা থেকে কী শেখার আছে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ব্যাপারটি ভাষাগত। দীর্ঘদিন ধরে ইসলামকে আমাদের দেশের মূলধারার শিক্ষা থেকে দূরে ঠেলে দেওয়ায় ইসলামী সাহিত্যের সাথে সাধারণ মানুষের বেশ দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের দেশের স্কুল-কলেজগুলোতে যে ধরনের সাহিত্য আমরা পড়েছি, সেগুলোর সাথে ইসলামী সাহিত্যকর্মের ভাষাগত ব্যবধান তৈরি হওয়ায় বরেণ্য আলিমদের লেখা বইগুলো পড়েও মানুষ যথাযথভাবে উপকৃত হতে ব্যর্থ হচ্ছে। এই সীরাহ সেই ব্যবধানকে কমিয়ে আনার প্রয়াস। চৌদ্দশো বছর আগের কথাগুলো যেন আমরা আমাদের পরিস্থিতির সাথে মেলাতে পারি, সেই সময়ের আলোয় নিজেদের দেখতে পারি সে জন্য প্রয়োজন ভাষাগত দেয়ালটি ভেঙে ফেলা। সে উদ্দেশ্যে এই সীরাহতে কাহিনিগুলোকে বর্ণনা করা হয়েছে কিছুটা আধুনিক যুগের ঢঙে, যেন পাঠক স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে নবীজির যুগে প্রবেশ করতে পারে।

বংশ পরিচিতি, জন্ম ও শৈশব

নবীজীর বংশ পরিচিতি:

নবিজি-এর পবিত্র বংশধারা পৃথিবীর সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাশীল। এটি এমন এক বাস্তব সত্য যে, মক্কার সকল কাফির এমনকি তাঁর চরম শত্রুও তা অস্বীকার করতে পারেনি। আবু সুফিয়ান রা. ইসলামগ্রহণের আগে রোম সম্রাটের সামনে এ সত্য গোপন করতে পারেননি; বরং সত্যটাই স্বীকার করতে হয়েছিল তাঁকে। অথচ তখন তিনি মনে মনে চাচ্ছিলেন, যদি কোনো সুযোগ পাওয়া যায়, তাহলে নবিজির ওপর কোনো না কোনো দোষ চাপাবেন।

নবীজীর বংশ ধারা:

পিতার দিক থেকে নবিজির বংশপরিক্রমা:

মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু আবদুল মুত্তালিব ইবনু হাশিম ইবনু আবদি মানাফ ইবনু কুসাই ইবনু কিলাব ইবনু মুররা ইবনু কাআব ইবনু লুওয়াই ইবনু গালিব ইবনু ফিহর ইবনু মালিক ইবনু নাজার' ইবনু কিনানা ইবনু খুজায়মা ইবনু মুদরিকা ইবনু ইলয়াস ইবনু নিজার ইবনু মাআদ ইবনু আদনান।

এ পর্যন্ত নবিজির বংশধারা সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত ও প্রমাণিত। এর পর থেকে আদম আ. পর্যন্ত তাঁর বংশধারা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে, তাই সেটুকু আর উল্লেখ করা হলো না।

মায়ের দিক থেকে নবিজির বংশপরিক্রমা:

মুহাম্মাদ ইবনু আমিনা বিনতু ওয়াহাব ইবনু আবদি মানাফ ইবনু জুহরা ইবনু কিলাব।

দালায়িলে আবু নায়িমে মারফু সূত্রে বর্ণিত আছে: জিবরিল আ. বলেছেন, 'আমি পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম

প্রান্ত সফর করেছি; কিন্তু বনু হাশিমের চেয়ে সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাশীল কোনো বংশ দেখিনি।

নবিজির জন্মপূর্ব বরকতের সুবাস:

প্রভাত হওয়ার আগে সুবহে সাদিকের আলো এবং রক্তিম পূবাকাশ যেমন পৃথিবীকে আলোকোজ্জ্বল সূর্যোদয়ের জানান দেয়, তেমনি নবুওয়াতি সূর্যের উদয়-মুহূর্ত যখন একেবারে নিকটে, তখন পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় এমন সব ঘটনা ঘটতে লাগল, যা নবিজির শুভ জন্মের আগমনী-সংবাদ দিচ্ছিল। মুহাদ্দিস ও ইতিহাসবিদদের পরিভাষায় সেগুলোকে 'ইরহাসাত' বা অপেক্ষমাণ নিদর্শন বলা হয়।

নবিজি -এর সম্মানিত মা আমিনা থেকে বর্ণিত; নবিজি যখন তাঁর মাতৃগর্ভে, তখন আমিনাকে স্বপ্নে সুসংবাদ দেওয়া হয়- 'তোমার গর্ভে যে শিশু রয়েছে, সে এ উম্মাহর নেতা হবে। শিশুটি যখন ভূমিষ্ঠ হবে, তখন তুমি এ দুআ করবে-"আমি তাঁকে এক আল্লাহর আশ্রয়ে সমর্পণ করছি" এবং তাঁর নাম রাখবে মুহাম্মাদ।'

আমিনা আরও বলেন, মুহাম্মাদ যখন আমার গর্ভে আসেন, তখন আমি একবার এমন একটি আলো দেখতে পাই, যে আলোতে শামের বসরা শহরের বড় বড় প্রাসাদ আমার দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল!"

তিনি আরও বলেন, আমি এমন কোনো মহিলাকে দেখিনি, যারা গর্ভবতী হয়ে আমার মতো এত হালকা ও সহজবোধ করেছেন। কেননা, গর্ভে সন্তান থাকলে মহিলাদের যে বমি বমি ভাব, অসুস্থতা-অলসতা ইত্যাদি বিষয় পরিলক্ষিত হয়, আমার ক্ষেত্রে সে রকম কিছুই হয়নি। এ ছাড়া এমন আরও অসংখ্য ঘটনা নবিজির জন্মের আগে প্রকাশ পেয়েছে, যেগুলো এই ছোট গ্রন্থে উল্লেখের সুযোগ নেই।

নবীজীর জন্ম-

এ বিষয়ে সবাই একমত যে, নবিজি সে বছরের রবিউল আউয়ালে জন্মান, যে বছর 'আসহাবে ফিল' বা আবরাহার হস্তিবাহিনী পবিত্র কাবায় হামলা করতে এসেছিল। তবে আল্লাহ তাআলা কতিপয় ক্ষুদ্র আবাবিলের মাধ্যমে পাথরকণা নিক্ষেপ করে তাদের পরাস্ত করেছিলেন। কুরআনেও এ ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে। মূলত এ ঘটনা নবিজির জন্মপূর্ব বরকতের সূচনা হিসেবে প্রকাশ পেয়েছিল। নবিজি যে ঘরে জন্মান, পরবর্তী সময়ে সে ঘর হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফের ভাই মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফের অধিকারে এসেছিল।'

কোনো কোনো ইতিহাসবিদ লিখেছেন, হস্তিবাহিনীর ঘটনা ৫৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২০ এপ্রিল ঘটেছিল।' এর মাধ্যমে জানা গেল যে, ইসা আ.-এর জন্মের ৫৭১ বছর পর নবিজির জন্ম হয়।

ইবনু আসাকির' রাহ, পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন, আদম ও নূহ আ.-এর মধ্যখানে ১ হাজার ২০০ বছরের ব্যবধান ছিল। নুহ আ. ও ইবরাহিম আ.-এর মধ্যখানে ছিল ১ হাজার ১৪২ বছরের ব্যবধান। ইবরাহিম থেকে মুসা আ. পর্যন্ত ৫৬৫ বছরের। মুসা থেকে দাউদ আ. পর্যন্ত ৫৬৯ বছরের। দাউদ থেকে ইসা আ. পর্যন্ত ১ হাজার ৩৫৬ বছর এবং ইসা আ. থেকে শেষ নবি মুহাম্মাদ ৬০০ বছরের ব্যবধান ছিল। পর্যন্ত

এ হিসাবে আদম থেকে আমাদের নবি মুহাম্মাদ পর্যন্ত ৫ হাজার ৩২ বছরের ব্যবধান ছিল। তা ছাড়া প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী আদম আ.-এর বয়স হয়েছিল ৯৬০ বছর। তাই আদম আ.-এর পৃথিবীতে আগমনের প্রায় ৬ হাজার বছর পর অর্থাৎ, সপ্তম সহস্রাব্দে নবিজির জন্ম হয়।

** এ সম্পর্কে অনেক বর্ণনা রয়েছে, তবে ইবনু আসাকির এ বর্ণনাটি সঠিক বলেছেন।

>> এ বিষয়ে সবাই একমত যে, নবিজির জন্ম রবিউল আউয়ালের সোমবার দিনে হয়েছিল; কিন্তু কোন তারিখে, সেটা নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে বিস্তর মতপার্থক্য রয়েছে। তবে জন্মতারিখ নিয়ে চারটি প্রসিদ্ধ মত রয়েছে-২, ৮, ১০ ও ১২ রবিউল আউয়াল। হাফিজ মুগলতাই রাহ, ২ তারিখকে গ্রহণ করে অন্যগুলোকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তবে প্রসিদ্ধ হচ্ছে ১২ তারিখের বর্ণনা। ইবনু ইসহাকও এ তারিখ গ্রহণ করেছেন। ইবনু হাজার আসকালানি রাহ, ১২ তারিখের বর্ণনার ওপর সবাই একমত বলে দাবি করেছেন।

তখন একদিকে পৃথিবীতে নববি সূর্যের আলোকরশ্মি কিরণ ছড়ায়, অন্যদিকে পারস্য-সাম্রাজ্যে কিসরার শাহি প্রাসাদে ভূ-কম্পন সৃষ্টি হয়। এর ফলে কিসরার শাহি প্রাসাদের ১৪টি চূড়া' ভূপাতিত হয়। পারস্যের সাওয়া উপসাগর আচমকা শুকিয়ে যায়। এ ছাড়া পারস্যের সেই অগ্নিকুন্ড, যা ১ হাজার বছর ধরে একমুহূর্তের জন্যও নেভেনি, তা-ও নিজ থেকেই নিভে যায়।১০

বস্তুত, এসব ঘটনা ছিল অগ্নিপূজা এবং সর্বপ্রকার অজ্ঞতা ও ভ্রান্তির পরিসমাপ্তির সূচনা। হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য পতনের ইঙ্গিত।

সহিহ হাদিসে বর্ণিত আছে, নবিজির জন্মের সময় তাঁর সম্মানিত মায়ের উদর থেকে এমন একটি নূর প্রকাশিত হয়েছিল, যার আলোয় পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত আলোকিত হয়ে যায়। এ ছাড়া কোনো বর্ণনায় রয়েছে, নবিজি তাঁর জন্মের সময় দুহাতের ওপর ভর দেওয়া ছিলেন। এরপর হাতে একমুঠো মাটি নিয়ে আকাশের দিকে তাকান।"

পিতা আবদুল্লাহর ইন্তেকাল:

নবিজি-এর তখনো জন্ম হয়নি, পিতা আবদুল্লাহকে তাঁর পিতা (নবিজির দাদা) আবদুল মুত্তালিব মদিনা থেকে খেজুর নিয়ে আসার নির্দেশ দেন। আবদুল্লাহ তখন পিতার নির্দেশে নবিজিকে স্ত্রীগর্ভে রেখে মদিনায় যান। ঘটনাক্রমে সেখানেই তিনি ইনতিকাল করেন। ফলে জন্মের আগেই নবিজির মাথার ওপর থেকে পিতৃছায়া উঠে যায়।

দুধ পান ও শৈশব

নবিজির জন্মের পর প্রথমে তাঁর সম্মানিত মা তাঁকে দুধপান করান। এর কিছুদিন পর করান আবু লাহাবের দাসী সুওয়াইবা। এরপর এই সৌভাগ্য অর্জন করেন হালিমাতুস সাদিয়া রা.।"

তখনকার আরবের সম্ভ্রান্ত লোকদের অভ্যাস ছিল, তারা তাদের নবজাতককে দুধপান করাতে পার্শ্ববর্তী গ্রামে পাঠিয়ে দিতেন। এর মাধ্যমে শিশুর দৈহিক স্বাস্থ্য ভালো থাকত এবং গ্রামের বিশুদ্ধ আরবি ভাষাও তারা সহজে রপ্ত করতে পারত। এ জন্য গ্রামের মহিলারা দুগ্ধপোষ্য শিশু নিতে প্রায়ই শহরে আসত।

নবিজির দুধমা হালিমা সাদিয়া রা. বলেন, 'আমি তায়েফ থেকে সাআদ গোত্রের মহিলাদের সঙ্গে দুগ্ধপোষ্য শিশু সংগ্রহের জন্য মক্কার উদ্দেশে রওনা দিই। সে বছর দেশে দুর্ভিক্ষ চলছিল। তখন আমার কোলেও দুগ্ধপায়ী এক সন্তান ছিল। তবে

অনাহারের ফলে আমার বুকে এতটুকু দুধ ছিল না যে, আমার কোলের শিশুটি তৃপ্তিতে পান করবে। ফলে শিশুটি সারা রাত ক্ষুধায় ছটফট করত; আর আমরা তার কারণে

ঘুমোতে পারতাম না। সারাটি রাত বসে বসে কাটিয়ে দিতাম। আমাদের একটি উটনী ছিল; কিন্তু সেটিরও তখন দুধ ছিল না। এভাবে কষ্ট ও ক্ষুধায় আমরা দিন কাটাতাম । এতো কিছুর পরও আমরা দুগ্ধপোষ্য শিশু নেয়ার মনস্থ করি।

মক্কার উদ্দেশে রওনার সময় আমি যে গাধায় আরোহণ করি, সেটাও নিতান্ত দুর্বল ছিল। ফলে কাফেলার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছিল না। এ জন্য সফরসঙ্গীরা আমাদের ওপর বিরক্তি প্রকাশ করছিল। এভাবে অনেক কষ্টে একপর্যায়ে আমরা মক্কায় পৌঁছাই।

সেখানে পৌঁছার পর কাফেলার মহিলারা শিশু মুহাম্মাদকে দেখার পর যখন জানতে পারে, তিনি পিতৃহীন ইয়াতিম, তখন কেউ-ই তাঁকে নিতে চায়নি। কেননা, এ ধরনের শিশুকে দুধপান ও লালনপালনে তেমন কোনো পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।'

এভাবে একে একে মহিলারা চলে যেতে লাগল; আর হালিমার ভাগ্যাকাশে ঝলমল করে নববি কিরণ আলো ছড়ায়। এ সময় তাঁর বুকের দুধস্বল্পতাই তাঁর জন্য রহমত হয়ে আবির্ভূত হয়। কেননা, তাঁর বুকে দুধ কম থাকায় ইতিপূর্বে কেউ তাঁকে সন্তান দিতে রাজি হয়নি।

হালিমা বলেন, 'আমি আমার স্বামীকে বললাম, এত কষ্টের সফরের পর খালি হাতে ফিরে যাওয়াটা ঠিক হবে না। এভাবে ফিরে যাওয়ার চেয়ে বরং এই ইয়াতিম শিশুকে নিয়ে যাওয়াই ভালো। আমার প্রস্তাবে স্বামীও সম্মত হলেন।' এভাবে তাঁরা এই দুর্লভ রত্ন-ইয়াতিম শিশু মুহাম্মাদকে নিয়ে বাড়িতে ফেরেন, যে রত্ন-আলোতে শুধু হালিমা- আমিনার ঘর নয়; বরং পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত পুরো পৃথিবী আলোকিত হওয়ার অপেক্ষায় ছিল।

আল্লাহ তাআলার রহমতে তখনই হালিমার ভাগ্য খুলে যায়। সৃষ্টির সেরা মানব, ভবিষ্যৎ-নবি মুহাম্মাদ তাঁর কোলে এসে গেলেন। এরপর বিশ্রামের জন্য তাঁবুতে এসে যখন শিশু মুহাম্মাদকে দুধ পান করাতে বসেন, তখন থেকেই বিভিন্ন বরকত প্রকাশ পেতে শুরু করে। ইতিপূর্বে তাঁর বুকে যেখানে দুধ-খরা চলছিল, সেখানে আজ শিশু মুহাম্মাদের বরকতে এই পরিমাণ দুধ এল যে, নবিজি ও তাঁর দুধভাই আবদুল্লাহ উভয়ে তৃপ্তির সঙ্গে

উদর পূর্ণ করে ঘুমিয়ে পড়েন। এদিকে উটনীর দিকে তাকিয়ে দেখা গেল, সেটিরও স্তন দুধে টইটম্বুর।

হালিমা বলেন, আমার স্বামী তখন উটের দুধ দোহন করেন এবং আমরা সবাই তৃপ্তির সঙ্গে তা পান করি। ফলে অনেক দিন পর সারা রাত আমরা অত্যন্ত আরামে ঘুমিয়ে কাটাই। এখন আমার স্বামীও আমাকে বলতে থাকেন, 'হালিমা, তুমি তো বড় বরকতময় এক শিশু নিয়ে এসেছ।' আমি বলি, আমারও তা-ই মনে হচ্ছে। এ শিশু বরকতপূর্ণ এক শিশু।

এর পর আমরা মক্কা থেকে রওনা দিই। আমি মুহাম্মাদকে নিয়ে সেই গাধায় চড়ি, যেটি আসার সময় চলতে পারছিল না; কিন্তু এবার আল্লাহর কুদরতের খেলা প্রত্যক্ষ করলাম। সেই দুর্বল গাধাটিই ফেরার পথে এত জোরে চলতে লাগল যে, কাফেলার অন্য কারও বাহন এটির ধারেকাছেও আসতে পারছিল না। ফলে আমার সাথি মহিলারা আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলতে থাকে, 'এটা কি সেই গাধা, যেটিতে চড়ে তোমরা এসেছিলে?'

এভাবে বরকত ও কুদরতের খেলা দেখতে দেখতে একসময় সফর সমাপ্ত হলো। তায়েফ থেকে মক্কা হয়ে আবারও তায়েফে নিজ নিজ বাড়িতে এলাম সবাই। তায়েফে তখনো দুর্ভিক্ষ চলছিল। দুধের পশুগুলো ছিল দুধশূন্য; কিন্তু আমরা বাড়িতে ফিরতেই আমাদের বকরিগুলোর স্তন দুধে ভরে ওঠে। এখন প্রতিদিনই আমাদের বকরিগুলো মাঠ থেকে দুধভরা স্তনে ফেরে; কিন্তু আশেপাশের অন্য কারও পশুর স্তনে একফোঁটা দুধের দেখা নেই। এ দৃশ্য দেখে আমার গোত্রের লোকেরা তাদের রাখালদের বলতে লাগল, তোমরাও পশুগুলো নিয়ে সেখানে চরাও, যেখানে হালিমার বকরিগুলো চরানো হয়। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে, এখানে চারণক্ষেত্র বা মাঠের কোনো বিশেষত্ব ছিল না।

বক্ষ বিদারন

রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মোট কয়বার বক্ষ-বিদারণ হয়েছিল তা নিয়ে মতভেদ আছে। ইদ্রিস কান্দলভী

রা: চারবার বক্ষ-বিদারন এর বর্ণনাকে গ্রহণযোগ্য বলে মত দিয়েছেন।

জন্মের চতুর্থ বা পঞ্চম বছরে প্রথমবারের মতো রসূলের বক্ষ বিদারণের ঘটনা ঘটে। একদিন রসূল খেলছিলেন জিবরীল আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসেন ভিন্ন বর্ণনামতে জিব্রিল ও মিকাইল আ: দুজনেই এসেছিলেন। তাকে একটু দূরে নিয়ে শুইয়ে দেন এবং বক্ষ বিদীর্ণ করে হৃদপিণ্ডটি বের করেন। তারপর তা পরিষ্কার করে যথাস্থানে রেখে দেন এর মাঝে মোহরে নবুয়াত স্থাপন করেন। তার খেলার সাথীরা হালিমাকে খবর দেয়। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন আমি রাসুলের বুকে ওই সেলাই এর দাগ দেখেছি। এই ঘটনার পর হালিমা ভীত হয়ে নবীজিকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেন। দ্বিতীয়বার বয়স যখন ১০ বছর তখন তার বক্ষবিদারন করা হয়। নবুওয়াত লাভের প্রাক্কালে তৃতীয়বারের মতো তার বক্ষবিদারন ধারণ করা হয়।

মিরাজের রাত্রিতে বাইতুল্লাহ থেকে মাসজিদুল আকসা গমনের পূর্ব মুহূর্তে তার চতুর্থ বারের মতো বক্ষ বিদারণ করা হয়।

তবে উপরোক্ত বর্ণনাগুলোর মধ্যে প্রথম ও চতুর্থ বর্ননাই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ, যদিও ইদ্রিস কান্ধলবি (রা)এর মতে সবগুলো বর্ননা সহিহ ও বিশ্বাসযোগ্য ।

নবীজীর মায়ের ইন্তেকাল:

নবিজির চার কিংবা ছয় বছর বয়সকালে তাঁর মা নিজের ভাইদের কাছে মদিনায় গিয়েছিলেন। সেখান ফেরার পথে 'আবওয়া' নামক স্থানে তিনি ইনতিকাল করেন।*

বল্যকাল। বয়স মাত্র ছয় বছর। পিতৃছায়া তো আগেই উঠে গেছে। এবার মাতৃছায়াও উঠে গেল। তবে এই ইয়াতিম শিশুটি যে রহমতের (আল্লাহর) আশ্রয়ে লালিতপালিত হওয়ার প্রতীক্ষায়, তিনি তো এসব উপায়-উপকরণের মুখাপেক্ষী নন।

আব্দুল মুত্তালিবের ইন্তেকাল

মা-বাবার পর নবিজি তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিবের আশ্রয়ে লালিতপালিত হচ্ছিলেন; কিন্তু মহান আল্লাহর এটা দেখানো উদ্দেশ্য ছিল যে, এ বালক তাঁর রহমতের কোলেই প্রতিপালিত হবে। আল্লাহ নিজেই তাঁর লালনপালনের জিম্মাদার হয়েছেন।

নবিজির বয়স যখন ৮ বছর ২ মাস ১০ দিন পূর্ণ হয়, তখন দাদা আবদুল মুত্তালিবও দুনিয়া থেকে বিদায় নেন।

শাম সফরে নবীজী

দাদার ইনতিকালের পর চাচা আবু তালিব নবিজির অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন। এবার তিনি চাচা আবু তালিবের স্নেহ-ছায়ায় বসবাস করতে থাকেন। এভাবে যখন তাঁর বয়স ১২ বছর ২ মাস ১০ দিন পূর্ণ হয়, তখন আবু তালিব ব্যবসার উদ্দেশ্যে শাম সফরের ইচ্ছা করেন। সুতরাং নবিজিকে সঙ্গে নিয়ে তিনি শামের পথে রওনা দেন এবং পথিমধ্যে 'তাইমা' নামক স্থানে তাঁরা যাত্রাবিরতি করেন।

নবিজি সম্পর্কে এক ইয়াহুদি পন্ডিতের ভবিষ্যদ্বাণী করেন।

চাচা আবু তালিবের সঙ্গে নবিজি তাইমায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, ঘটনাক্রমে 'বুহায়রা রাহিব' নামের এক ইয়াহুদি পণ্ডিত সেদিকে যাচ্ছিলেন। তিনি নবিজিকে দেখতে পেয়ে আবু তালিবকে বলেন, 'আপনার সঙ্গের বালকটি কে?' আবু তালিব বলেন, 'আমার ভাতিজা মুহাম্মাদ।' বুহায়রা বলেন, 'আপনি কি তাঁর প্রতি স্নেহপরবশ এবং তাঁর কল্যাণ কামনা করেন?' আবু তালিব বলেন, 'অবশ্যই, আমি তাঁর প্রতি দয়ালু এবং তাঁর হিফাজতকারী।'

তাঁর এমন উত্তরে বুহায়রা তখন আল্লাহর নামে শপথ করে বলেন,'আপনি তাঁকে শামে নিয়ে গেলে সেখানকার ইয়াহুদিরা তাঁকে হত্যা করে ফেলবে। কেননা, এ ছেলে বড় হয়ে নবি হবে। সে ইয়াহুদি ধর্ম রহিত করে দেবে। আমি আমাদের আসমানি কিতাব তাওরাতে তাঁর বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি সম্পর্কে অনেক কিছু জেনেছি!'

এখানে লক্ষণীয় যে, বুহায়রা রাহিব ইয়াহুদিদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাত সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান রাখতেন। আর তাওরাতে শেষ নবি হিসেবে মুহাম্মাদ-এর পূর্ণ অবয়ব-আকৃতির বিস্তারিত বিবরণ ছিল। ফলে বুহায়রা তাঁকে দেখেই চিনতে পারেন যে, তিনিই সেই শেষ নবি, যিনি তাওরাত বা ইয়াহুদিধর্ম রহিত এবং ধর্মযাজকদের রাজত্বও শেষ করে দেবেন।**

পাদরি বুহায়রার কথায় আবু তালিব ভয় পেয়ে যান, তাই সফরের মাঝপথে তাইমা থেকেই নবিজিকে মক্কায় ফেরত পাঠিয়ে দেন।

ব্যবসার কাজে দ্বিতীয়বার শাম সফর

ওই সময় মক্কায় খাদিজা নামের একজন মহিয়সী ছিলেন, যাঁর ছিল প্রচুর ধনসম্পদ। পাশাপাশি তিনি ধীমান আর বুদ্ধিমতি হিসেবেও ছিলেন প্রসিদ্ধ। তখনকার মক্কার দরিদ্র পুরুষদের যারা মেধাবী, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও বিশ্বাসী হিসেবে খাদিজার জানাশোনা ছিল, তাদের হাতে তিনি অর্থ-সম্পদ দিয়ে বলতেন, 'এগুলো অমুক জায়গায় গিয়ে বিক্রি করবে এবং এর লভ্যাংশ থেকে তোমাকে এ পরিমাণ দেওয়া হবে।'

যদিও নবিজি তখনো নবুওয়াত পাননি, তবে তাঁর আমানতদারিতা, বিশ্বস্থতা ও সত্যবাদিতার কথা সর্বমহলে ছড়িয়ে পড়েছিল। সবাই তাঁর উত্তম চরিত্র ও উন্নত গুণাবলির যথেষ্ট মূল্যায়ন করত। মক্কার মানবসমাজে তাঁর সততা ছিল প্রবাদতুল্য। ফলে 'আল আমিন' বা 'বিশ্বাসী' উপাধিতে তিনি ভূষিত হন। তাঁর এই খ্যাতি ও উন্নত মর্যাদার কথা ধীমান খাদিজার অজানা ছিল না। খাদিজা তাঁর প্রতি মুগ্ধ হন। তিনি চাচ্ছিলেন, নবিজির হাতে সম্পদ দিয়ে তাঁর সততা ও বিশ্বস্থতার মাধ্যমে ব্যবসায়

অধিক মুনাফা অর্জন করবেন। এ আশায় তিনি নবিজির কাছে লোক পাঠিয়ে বলেন, 'আপনি যদি আমার ব্যবসাপণ্য নিয়ে শামে যান, তাহলে আমার এক দাসকে আপনার খিদমতের জন্য সঙ্গে দেবো এবং ব্যবসার লভ্যাংশ থেকে অন্যদের যে পরিমাণ দিই, আপনাকে এরচেয়ে বেশি দেবো।'

নবিজি যেহেতু উন্নত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, উচ্চ সাহস আর দৃঢ় মনোবলের অধিকারী ছিলেন, তাই খাদিজার এমন প্রস্তাব পেয়ে সাড়া দিতে দেরি করেননি। তিনি সফরের জন্য তখনই প্রস্তুত হয়ে যান এবং খাদিজার দাস মায়সারাকে সঙ্গে নিয়ে ১৬ জিলহজ শামের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন। শামে পৌঁছে তিনি খাদিজার দেওয়া পণ্যসামগ্রী অধিক লাভে বিক্রি করতে সমর্থ হন। এরপর সেই অর্থ দিয়ে আরও কিছু পণ্য কিনে মক্কায় ফিরে সেগুলো খাদিজার হাতে তুলে দেন। শাম থেকে নিয়ে আসা সেসব পণ্য মক্কায় বিক্রি করে খাদিজাও দ্বিগুণ মুনাফা অর্জন করেন।

শামে যাওয়ার পথে নবিজি একজায়গায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, সেখানে 'নাসতুরা' নামের এক ইয়াহুদি পণ্ডিত ও সন্ন্যাসী তাঁকে দেখতে পান। পূর্ববর্তী আসমানি গ্রন্থগুলোতে শেষ নবি সম্পর্কে যেসব নিদর্শন বিবৃত হয়েছে, তাঁর মধ্যে সেসব দেখে সেই ইয়াহুদি যাজক নবিজিকে চিনে ফেলেন। তা ছাড়া তিনি আগে থেকেই খাদিজার দাস মায়সারাকে চিনতেন। ফলে তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার সঙ্গের লোকটি কে?' মায়সারা জবাবে বলেন, 'তিনি মক্কার কুরাইশের সম্ভ্রান্ত এক যুবক।' ইয়াহুদি পণ্ডিত তখন বলেন, 'এই যুবক ভবিষ্যতে নবী হবে'

নবীজীর বৈবাহিক জীবন

খাদিজা (রা:) সাথে বিয়ে-

যুবক বয়সে নবীজির জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো খাদিজার সাথে বিয়ে। খাদিজা মক্কার বিখ্যাত এক নারী, সম্ভ্রান্ত বংশের মধ্যবয়স্ক ভদ্রমহিলা। তাঁর আগেও বিয়ে হয়েছিল। খাদিজার নিজস্ব ব্যবসা ছিল। সে সময় ব্যবসার কাজে প্রায়ই ইয়েমেন ও সিরিয়া যাতায়াত করা লাগতো। তিনি ব্যবসার কাজ সামলাবার জন্য বিভিন্ন লোক ভাড়া করতেন, নিজে

ঘরের বাইরে গিয়ে ব্যবসা করতেন না। কুরাইশের লোকেরা শীত ও গ্রীষ্মে বছরের দুই সময়ে সফরে বের হতো একবার ইয়েমেনে, আরেকবার শামে। আল্লাহ আযযা ওয়াজাল মক্কার সে সময়ের পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে বলেন,

"কুরাইশদের নিরাপত্তার জন্য, শীত ও গ্রীষ্ম সফরে তাদের নিরাপত্তার জন্য।" (সূরা কুরাইশ, ১০৬: ১-২)

মুহাম্মাদ যখন শামে সফরের উদ্দেশ্যে বের হলেন, খাদিজা তাঁর দাস মায়সারাহকে তাঁর সঙ্গে পাঠালেন। তাঁরা দুজন শামে ব্যবসা শেষ করে ফিরে এলেন।

মায়সারাহ খাদিজার কাছে তাদের সফরের বর্ণনা দিতে এসে মুহাম্মাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তিনি বলেন, 'এই মানুষটার সততা ও বিশ্বস্ততা মুগ্ধ হওয়ার মতো।' খাদিজা নবীজির কথা যত শুনছেন, ততই তাঁর প্রতি আগ্রহ বোধ করছেন। নবীজির চারিত্রিক গুণাবলি এমনই ছিল যে সবাইকে টানতো। খাদিজা ৫, মক্কার একজন বিত্তশালী মহিলা, এক সাধারণ কর্মচারীর অসাধারণ চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ খাদিজার প্রস্তাব মেনে নিয়ে বিয়ের জন্য সম্মতি জানালেন। বিয়ের সময় নবীজির বয়স ছিল পঁচিশ, আর খাদিজার বয়স ছিল চল্লিশ। দুজনের বয়সের পার্থক্য পনেরো বছর, কিন্তু বয়সের এই সুবিশাল ফারাক তাদের বৈবাহিক জীবনে কোনো আঁচ ফেলতে পারে নি।

খাদিজার অনন্যতা:

খাদিজা বেঁচে থাকা অবস্থায় নবীজি আর কোনো বিয়ে করেননি।

রাসূলুল্লাহ খাদিজাকে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন। খাদিজার সাথে তাঁর বন্ধন, বিশ্বাস, প্রতিশ্রুতি মৃত্যুর পরেও ভাঙেনি। তিনি সবসময় তাঁকে মনে করতেন, তাঁর কথা বলতেন। আর এজন্য নবীজির অন্য স্ত্রীরা মৃত খাদিজাকে নিয়েও ঈর্ষা বোধ করতেন। তবুও নবীজিকে খাদিজার স্মরণ থেকে থামানো যেতো না। খাদিজার জন্য রাসুলুল্লাহর ভালোবাসা, আকর্ষণ, মমতা ও সম্মান ছিল সবচাইতে বেশি। কারণ তিনি খাদিজাকে সবসময় নিজের পাশে

পেয়েছেন। যখন সবাই রাসূলুল্লাহর বিরুদ্ধে কথা বলেছে, তখন সান্ত্বনা আর আশার কথা শুনিয়েছেন খাদিজা। তিনি নবীজিকে পরম মমতায় আগলে রেখেছিলেন।

খাদিজার পর নবীজির সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী ছিলেন আ'ইশা । কিন্তু এই আ'ইশাও খাদিজার প্রতি ঈর্ষা বোধ করতেন। বুখারি ও মুসলিমের হাদীসে আছে যে, আ'ইশা বলেন, 'আমি খাদিজা ছাড়া নবীজির আর কোনো স্ত্রীকে নিয়ে এতটা ঈর্ষা অনুভব করিনি! এটা এজন্য নয় যে আমি তাকে কোনোদিন দেখিনি, বরং এটা এজন্য যে নবীজি তাকে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন। '

নবীজি মাঝে মাঝে একটা ভেড়া জবাই করে বলতেন খাদিজার বান্ধবীদের জন্য পাঠিয়ে দাও।'আয়েশা (রা:) বলেন, *খাদিজা(রা:) মারা যাবার পরেও নবীজী তাঁর বান্ধবীদের সাথে সৌহার্দ্য বজায় রেখেছেন। এটা তিনি করতেন খাদিজার প্রতি ভালোবাসা থেকে।*এমনটা করতে দেখে আইশা বেশ ঈর্ষা বোধ করতেন, একদিন বলেই ফেললেন, 'শুধু খাদিজা আর খাদিজা!' তখন নবীজি বললেন, 'মহান আল্লাহ তাআলাই আমার অন্তরে খাদিজার প্রতি ভালোবাসা তৈরি করে দিয়েছেন। এই ভালোবাসার নিয়ন্ত্রণ রাসূলুল্লাহর হাতে ছিল না, এটা সম্পূর্ণ আল্লাহর পক্ষ থেকে। আল্লাহ তাআলাই তাঁর অন্তরে খাদিজার জন্য বিশেষ স্থান তৈরি করে দিয়েছেন।

ইমাম আহমাদ ও তিরমিযী থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদীসে আছে, আ'ইশা বলেন, 'এমন অনেক দিন হয়েছে যে, খাদিজার প্রশংসা না করে নবীজি ঘর থেকে বের হোন নি। একদিন এভাবে তিনি খাদিজার প্রশংসা করছিলেন। আমি আর সহ্য করতে না পেরে বলে উঠলাম, 'তিনি কী এমন ছিলেন? তিনি তো একজন বয়স্ক মহিলা মাত্র। তাঁর চেয়েও উত্তম নারী দিয়ে কি আল্লাহ তাআলা আপনার স্ত্রীর স্থান পূরণ করে দেননি?'

এতে নবীজী রাগান্বিত হয়ে যান,তার চেহারা মুবারক লাল হয়ে যায়। তিনি বলেন এখানে আমার কোন হাত নেই, আল্লহ সুবহানু তায়ালা খাদিজার প্রতি আমার অন্তরে ভালোবাসা তৈরি করে দিয়েছেন।আর কখনো খাদিজাকে নিয়ে এরকম কথা বলবে না।

হযরত খাদীজা (রা)-এর গর্ভজাত সন্তান:

হযরত খাদীজা (রা)-এর গর্ভে নবীজীর দুই পুত্র ও চার কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। যথা- (১) কা'সেম (রা)। তার নাম অনুসারে নবীজীর উপনাম হয় আবুল কাসেম (সা)। (২) তাহের (রা)। তাঁর অপর নাম ছিল আবদুল্লাহ্।

কন্যাগণ হলেন-হযরত ফাতিমা (রা), যয়নব (রা), রোকাইয়া (রা) ও উম্মে কুসুম (রা)। হযরত যয়নব ছিলেন সকলের বড়।

অপর একজন পুত্র, ইব্রাহীম (রা) মারিয়া (রা)-র গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন

আল্লাহর কি মহিমা! পুত্র সন্তান তিনজনই অতি অল্প বয়সে ইন্তিকাল করেন।

তন্মধ্যে শুধু হযরত কাসেম অপেক্ষাকৃত বড় হয়েছিলেন। তিনি ঘোড়ায় চড়তে পারতেন।

চার কন্যা: কন্যাগণের মধ্যে হযরত ফাতিমা (রা) সর্বশ্রেষ্ঠা ছিলেন। জান্নাতবাসিনীদের তিনিই নেত্রী। পনের বৎসর সাড়ে পাঁচ মাস বয়সের সময় হযরত আলী (রা)-র সঙ্গে ৪৮০ দিরহাম মোহর এর বিনিময়ে তাঁর বিবাহ হয়।

হযরত যয়নব (রা)-কে 'আবুল আ'স ইবনুর রবী'র সঙ্গে এবং হযরত রোকাইয়া

(রা)-কে হযরত ওসমান গনী (রা)-এর সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয়। দ্বিতীয় হিজরী সনে বদরের যুদ্ধ হতে

বিজয়ী বেশে যখন হযরত মুহাম্মদ (সা) মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন, তখন রোকাইয়া (রা)-কে সমাহিত করিয়া লোকজন সবেমাত্র ফিরছিল। এরপর তৃতীয় হিজরীতে উম্মে কুলসুমকে হযরত ওসমান (রা)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা হয়। হিজরী নবম সনে ইনিও ইন্তিকাল করেন

কাবা পুনঃ নির্মাণ

রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স যখন ৩৫ বৎসর, তখন কুরাইশগণ বায়তুল্লাহর পুনর্নির্মাণ ও মেরামতের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। এর কিছুদিন আগে ভীষণ এক বন্যার কবলে পড়ে কা'বাঘরের ভিত্তি দুর্বল ও তা ধ্বসে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। তদুপরি কা'বার ভিটির নিম্নস্থ কূপে যুগ-যুগান্তের রক্ষিত ধনভাণ্ডারে কোন এক দুর্বৃত্তের হাত পড়েছিল! বহু তালাশের পর 'বনি মলীহ্'র এক গোলাম 'দুওয়াইকে'র কাছে অপহৃত দ্রব্য পাইয়া লোকজন তার হাত কেটে তাকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করে।

এ সকল কারণে সকলে স্থির করেন যে, কালবিলম্ব না করে কা'বার ভিত্তি সুদৃঢ় করা হবে এবং ছাদ প্রাচীরও নূতনভাবে নির্মিত হবে।

আল্লাহর ঘরের নির্মাণ কাজ। মহা সৌভাগ্যের কথা। প্রতিটি গোত্র পরম উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে কাজে নামল। এক কিবতী মিস্ত্রী অযাচিতভাবে উক্ত নির্মাণকাজে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। বন্যার প্লাবনে একটি বিরাট নৌকা ভেসে আসে মক্কার অদূরে ঠেকেছিল। তার তক্তা ও কাঠগুলি ছাদের শাহতীর ও অন্যান্য কাজের উপযোগী বলে বিবেচিত হয়।

সকলই প্রস্তুত। কিন্তু অন্তরায় হিসাবে দেখা দিল একটি প্রকাণ্ড বিষধর সাপ। ধনকূপ হইতে সাপটি প্রতিদিন বের হয়ে ছাদে রোদ পোহাত। সেদিনও সাপটি রোদ পোহাচ্ছিল। তার কাছে গেলে রক্ষা ছিল না। আল্লাহর মেহেরবানী, যখন লোকজন দূর হতে সাপটিকে দেখতেছিল, সে সময় একটি বাজ পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। এতে সকলেই আনন্দিত হল এবং তাহাদের অন্তরে বিশ্বাস জন্মিল যে, আল্লাহও এই নির্মাণকার্যে রাযী এবং সহায়ক আছেন।

প্রত্যেক গোত্র এক এক কাজের দায়িত্ব নিয়ে ঘর ভাঙতে উদ্যত হয়। কিন্তু আল্লাহর ঘর ভাঙ্গতে প্রথম কোপ দিবে কে? যদিও সদুদ্দেশ্যেই ভাঙ্গা হবে, তবু লোকে দেখবে আল্লাহর ঘর ধ্বংস করতেছে। ইতিপূর্বে এই ঘর ধ্বংস করতে এসে 'আবরাহা'র যে কি শোচনীয় পরিণতি ঘটেছিল সে কথা কখনও কেউ ভুলে নাই। এসব ভেবে সকলেই ইতস্তত করতে লাগল। তখন বৃদ্ধ ওয়ালিদ ইবনে মুগীরা (হযরত খালেদের পিতা) এগিয়ে গিয়ে প্রাচীরের

একটা অংশ ভেঙে দিয়ে দো'আ করিলেন, "আল্লাহ! আমরা কোন অসদুদ্দেশ্যে ইহা ভাঙ্গছি না।

"অতঃপর তিনি সঙ্গীদেরকে ডাকতে লাগলেন, "এখন আস, কাজে লেগে যাও।" কিন্তু তবু কারো সন্দেহ ঘুচল না। তারা বলতে থাকে, "আজ থাকুক। আমাদেরকে দেখতে দাও। যদি তোমার কোন অকল্যাণ না হয় তবে আগামীকাল হতে সবাই এ কাজে লেগে যাব।"

পরদিন ভোরে ওয়ালিদ সুস্থ শরীরে হাযির হলেন। তাই দেখে সকলেই মহাধুমধামের সাথে কাজ শুরু করল। প্রত্যেক গোত্র আপন নির্ধারিত অংশ ভেঙে দিয়ে মেরামতের কাজে মশগুল হয়ে পড়ল।

বেহেস্তী কাল পাথর 'হাজরে আসওয়াদ' প্রাচীরের গায়ের যে অংশে স্থাপিত ছিল, সেই অংশের নির্মাণ ভার ছিল, 'বনী আব্দিদ্দার' গোত্রের হাতে। তারা প্রাচীর নির্মাণ শেষ করে যেই পাথরটিকে যথাস্থানে রাখতে যাবে, তখনই মহা হট্টগোল বেঁধে যায়। এই পাথর রাখা পরম সৌভাগ্যের বিষয় বিবেচিত হত। তাই প্রায় সকল গোত্রই পাথর নিয়ে টানাটানি শুরু করে দেয়।কোন গোত্রই অপর গোত্রকে এই মহাপুণ্য কাজে অংশ নিতে রাযী হচ্ছিল না।

ব্যাপার দেখে''বনী আবদিদ্দার' রীতিমত অগ্নিশর্মা হয়ে উঠে এবং একটি পাত্র ভরিয়া তাজা রক্ত এনে সম্মুখে রেখে হলফ করে বলেন, "হয় রক্ত না হয় পাথর, আমরা আর কিছুই বুঝি না।"

বনী আ'দী দৌড়ে এসে ঐ রক্তের পাত্রে হাত ঢুকে দিল এবং রক্তাক্ত হাত শূন্যে তুলে চেঁচাইয়া বলতে থাকে, "এই রক্তে লুটোপুটি খেয়ে মরব, তবু দেখব, পাথর কে নেয়?" চতুর্দিকে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে প্রত্যেকেই রণ-হুঙ্কার তুলে যেন এক প্রলয় সৃষ্টি করল। কিন্তু কেউ দমবার পাত্র নয় এবং আপন দাবিও ত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়।

এভাবে মৃত্যুর মুখামুখি দাঁড়িয়ে তারা চার দিন কাটিয়ে দেয়। অবশেষে প্রবীণ এবং প্রধানগণ মসজিদে পরামর্শ সভা ডেকে 'আবূ উমাইয়া'র উপদেশ অনুসারে স্থির করিল যে,

বাবুশ-শায়বার (বর্তমানে বাবুস্ সালাম) পথে আজ সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করবেন তাঁর ফায়সালা সকলেই মাথা পেতে নিব।

আল্লাহর অপার মহিমা। কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল যুবক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ দ্বার-পথে কা'বা মসজিদে প্রবেশ করতেছে। ইহা দেখে সকলেই যারপরনাই আনন্দিত হয়ে বলতে লাগল- "এই যে আল্ আমীন- মুহাম্মদ (সা) আসছেন, তাঁর যে কোন সিদ্ধান্তে আমরা পূর্ণ রাজী।"

অতঃপর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ঘিরে ধরে তাহারা আদ্যোপান্ত ঘটনা তাঁর নিকট ব্যক্ত করল। তিনি বললেন, "একটি চাদর আনুন।" চাদর আনা হলে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ হাতে পাথরটিকে মাঝখানে রেখে বলিলেন, "প্রত্যেক গোত্রের একজন করে চাদরের কিনারা ধরুন।"
এরপরে সকলে মিলে চাদর ধরে পাথরটিকে উঠালে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ মোবারক হাতে পাথরটিকে দেয়ালের গায়ে যথাস্থানে স্থাপন করলেন। এভাবে একটা মহা বিপদ হতে সকলে রক্ষা পায়।

নবীজীর প্রজ্ঞাপূর্ণ বিচার দেখে সকলেই ধন্য ধন্য করতে লাগল।

অতঃপর কা'বাঘরের নির্মাণ কার্য সমাপ্ত করে তারা ফিরে যায়। কিন্তু নবীজীর প্রতি যে অগাধ ভক্তি ও সম্মান প্রত্যেকের অন্তরে স্থান লাভ করে উহা তাদের মৃত্যুর পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত কারো হৃদয় হতে মুছে যায় নাই।

নবুয়াত জীবনের পূর্ব মুহূর্ত

হযরত (সা:) পরিবার-পরিজন নিয়ে একজন পূর্ণ সংসারীর জীবন যাপন করছিলেন বটে, কিন্তু ভাবুকের মনের ভাবনা কমে নাই। বিশ্ব মানুষের নানা সমস্যা নিয়ে ভাবনা; সৃষ্টির লীলাখেলা নিয়ে ভাবনা। এই বিরাট সৃষ্টির অন্তরালে কোন মহাশক্তি বিরাজমান, তাঁহাকে

পাবার সহজ পথ কোনটি???, পথহারা মানুষকে কিভাবে সেই পথে আনা যেতে পারে, এ ধরনের নানা ভাবনায় তিনি সদা চিন্তিত থাকতেন।

সময় যখন ঘনিয়ে আসল, তখন অদৃশ্যলোকের নানা তত্ত্ব স্বপ্নাকারে তাঁর চোখে ভেসে উঠতে লাগল। হযরত (সা:) ক্রমশ আরো নির্জন-প্রিয় হয়ে আরো ধ্যানমগ্ন থাকতে লাগলেন। মাঝে মাঝে জনসমাগমের বাইরে সুদূর নির্জন প্রান্তরে হেরা পর্বতের গুহায় গিয়ে সপ্তাহের পর সপ্তাহ, আবার কখনও মাসের পথপ্রান্তরে হেরা পর্বতের গুহায় গিয়ে সপ্তাহের পর সপ্তাহ, আবার কখনও মাসের পর মাস কাটিয়ে দেন। জীবন-সঙ্গিনী খাদীজা (রা:) রাত্রির অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে তাঁর খাবার পৌঁছিয়ে দিয়া আসতেন। অদৃশ্যলোকের সঙ্গে মর্ত্যলোকের এক নিবিড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ লাগতে চলছে অথচ মাত্র এই দুইজন প্রাণবন্ধু লোকচক্ষুর অগোচরে থেকে তারই প্রচেষ্টায় মেতে রয়েছিলেন।

ক্রমে ক্রমে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অন্তরচক্ষুতে আল্লাহতত্ত্ব স্পষ্টরূপে ভেসে উঠতে থাকে। প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোর মত স্পষ্ট হয়ে আল্লাহ যেন তাঁর ধ্যানপটে ধরা দিলেন। তাঁর মনপ্রাণ সাক্ষ্য দিতে লাগল- "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্!' এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে মানুষের গড়া দেব-মূর্তি উপাস্য নয়, বরং একমাত্র আল্লাহ! তিনিই সবকিছুর প্রতিপালক এবং সৃষ্টিকর্তা।

অপরদিকে আল্লাহর মহিমা দেখুন। তিনি গাছে-ডালে পাথরে-কঙ্করে, পাতায়-পাতায় শব্দ তুলে দিলেন- 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্।'

সে কি এক মহান দৃশ্য। হযরত (সা) হেরার পথে যখন একাকী চলেন, তখন নিজ অন্তর হতে শব্দ আসে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। আর পথের পাশের পাথর-কঙ্কর ও লতা-পাতা হতে সজোরে কারা যেন বলতেছে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্! কেউ বলতেছে, "আস্সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্।" অবাক হয়ে ডানে-বামে ফিরে তালাশ করেন- কে বললো? কে ডাকল? কিন্তু কোন জনপ্রাণী সেখানে নেই।

মুহাম্মদ (সা) ৪০ বৎসর বয়সে উপনীত হতে আর মাত্র কয়েকদিন বাকি। বাবা আদমেরও পূর্বেকার নবী তিনি। বাকি শুধু নবুয়তের জাগতিক অভিষেক অনুষ্ঠান। তারই প্রাথমিক

প্রস্তুতি ছিল এইগুলি। 'শেষ নবী' নবীরূপে অভিষেক অনুষ্ঠান। তাহারই প্রাথমিক প্রস্তুতি ছিল এইগুলি। 'শেষ নবী' নবীরূপে আবির্ভূত হবেন এবং পূর্ববর্তী সকল ধর্মের স্থলে ইব্রাহীমী ধর্মবাদ (ইসলাম) নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবেন।

এখনই নবীর আত্মপ্রকাশের সময় এমন এক রব সর্বত্র পড়ে গিয়েছিল। অনেক খৃস্টান ও ইহুদী নূতন নবীর তালাশে বহুদিন যাবত ঘুরিয়া ফিরতেছিল। সালমান ফারসী (রা)-এর জীবনী দেখুন, বহু বৎসরের কায়ক্লেশের পর মদীনা এসে তিনি নবীয়ে করীমের সাক্ষাত পান এবং ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

বনী কুরাইযার জনৈক বৃদ্ধ বলেন, "শ্যাম দেশ হতে ইবনুল হায়বান নামক একজন ইহুদী ইসলামের আবির্ভাবের কয়েক বৎসর পূর্বে আমাদের এখানে এসে বসবাস স্থাপন করেছিলেন। তিনি তখন নামায পড়তেন এবং সদকা দিতেন। তাঁর মৃত্যুকাল নিকটবর্তী হলে তিনি দুঃখ করে বলতে থাকেন, "নবীর আবির্ভাবের সময় হয়েছে- এই দেশে তিনি হিজরত করে আসবেন। সেই শুভ দিনের আশায় আমি এখানে এসেছিলাম। কিন্তু হায়! আয়ু আমার শেষ হয়ে গেল!"

হযরত সালেমা (রা) বলেন, আমাদের 'বনী আবদুল আশহাল' গোত্রে হঠাৎ জনৈক ইহুদী কোন এক স্থান হইতে এসে পড়শী হলেন। তখনও ইসলামের আবির্ভাব হয় নাই। একদিন আমি তাঁহার কাছে গিয়ে বসলাম। তিনি কি'য়ামত, হাশর-নাশর, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ইত্যাদি নানা বিষয়ের উপর আলোচনা জুড়ে দিলেন। আমি স্তম্ভিত হইয়া জিজ্ঞাসা করলাম- "কি বলেন? এই সবও হবে নাকি?"

তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, নিশ্চয়ই।

আমি প্রমাণ চাইলাম। তখন তিনি মক্কার দিকে হাত বাড়িয়ে বলতে লাগলেন, "এই দিকে অতি শীঘ্র একজন নবী আবির্ভূত হয়ে তোমাদের দেশে আসি্বেন। তিনিও উপরোক্ত রূপ কথা বললেন। তাঁর অপেক্ষায়ই আমি আছি।"

অংশীবাদী মুশরিকদের মধ্য হতেও ওয়ারাকা ইবনে নওফল, উবায়দুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ, ওসমান ইবনে হারস, যায়েদ ইবনে আমর প্রমুখ দীনে ইব্রাহীমীর খোঁজে দেশ-দেশান্তর ঘুরিয়া প্রাণান্ত হয়েছিলেন। তাদের অনেকেই মূর্তিপূজা ছেড়ে নিজেদের কল্পনা অনুসারে নিরাকারের ইবাদত করতেন এবং অনেকে নূতন নবীর সন্ধানে অস্থির হইয়া সময় কাটাতেন।আরবের বিখ্যাত গণকদেরও তখন টনক নড়ে গিয়েছিল। কেননা, তাদের ভবিষ্যদ্বাণীর বড় অবলম্বনই ছিল জিন। শয়তানেরা আসমানে উঠে গোপনে কান পেতে বহু কিছু শুনে এসে তা পরে ঐ গণকদেরকে জানিয়ে দিত। কিন্তু নবীর আবির্ভাবের কিছুকাল পূর্ব হতে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা গেল। তখন আসমানে তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তবু কেউ উঠলে 'নাজম' (তারকা) নিক্ষেপ করে তাদেরকে বিতাড়িত করা হয়। তাই দুষ্ট জ্বিনেরাও সংবাদ দিতে পারে না-গণকদের ভবিষ্যদ্বাণীও একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। এভাবে জ্বিন মহলেও হৈ-চৈ পড়ে গেল। তারা চিন্তা করতে লাগল, ব্যাপার কি? আসমানে এত কড়া পাহারা কেন? সারা পৃথিবী ও আকাশে এত সরগরম ভাব কেন?

"শেষ নবী আগমন করবেন”, এই কথা জানতে পেরে জ্বিনেরাও তাঁর খোঁজে সারা দুনিয়ার হাট-ঘাট পাহাড়-বন মন্থন করে ফিরতে লাগল।

নবুয়াহ, দাওয়া এবং প্রতিক্রিয়া

নবুওয়াতপ্রাপ্তি-

রাসূলুল্লাহ হেরা পর্বতের গুহায় দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতেন। নিশ্চুপ, নিমগ্ন, নিবিষ্ট মনে আল্লাহর ইবাদত করতেন। চারপাশের সৃষ্টি নিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে যেতেন। হঠাৎ একদিন জিবরীল আমিন তাঁর কাছে এসে হাজির হলেন। জিবরীল সম্পর্কে উমার ইবন খাত্তাবের বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, 'কুচকুচে কালো কেশ আর ধবধবে শুভ্র পোশাক পরা এক লোক, তাঁর মাঝে ভ্রমণের কোনো ছাপ নেই।' অর্থাৎ তিনি মাঝে মাঝেই মানুষের বেশ ধরে আসতেন। কিন্তু সেদিন, ওয়াহী আনার সেই প্রথম দিনে কোনো মানুষের রূপে নয়, নিজের রূপেই মুহাম্মাদের সামনে নিজেকে প্রকাশ করেন। প্রকাণ্ড সেই সত্তা, আচ্ছন্নকারী

আবির্ভাব। কয়েকশ পাখা দিগন্ত ঢেকে ফেলেছে, তাতে শোভা পাচ্ছে নাম-না-জানা অগণিত মণিমুক্তো আর প্রবাল।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বললেন, 'ইকরা'-তিলাওয়াত করো। ইকরা শব্দটার দুটি অর্থ আছে। তার মধ্যে একটি হলো, পড়া এবং আরেকটি তিলাওয়াত করা। এই প্রেক্ষিতে অর্থটা ছিল 'তিলাওয়াত করো।'

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলে উঠলেন, 'আমি তো পড়তে জানিনা।'

জিবরীল আমিন তখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শক্ত করে বুকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন, এরপর ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'ইকরা।'

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবারও বললেন, 'আমি তো পড়তে জানিনা।'

পুনরায় জিবরীল তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিয়ে বললেন, 'ইকরা।'

এভাবে একবার, দুবার, তিনবার করার পর অবশেষে তিনি কুরআনের নাযিলকৃত প্রথম আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন, এগুলো ছিল সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত।

"পড়ুন আপনার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পড়ুন আপনার প্রতিপালক মহা দয়ালু। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে (এমন জ্ঞানের), যা সে জানতো না।” (সূরা আলাক, ৯৬: ১-৫)

জিবরীলের সাথে রাসূলুল্লাহর প্রথম সাক্ষাৎ এমনই ছিল। পুরো ঘটনার আকস্মিকতায় নবীজি বিহ্বল হয়ে পড়েন। ঘরে ফিরে এসেই সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী খাদিজাকে বলেন, 'জাম্মিলুনি, জাম্মিলুনি'-আমাকে চাদর দিয়ে মুড়ে দাও! আমাকে চাদর দিয়ে মুড়ে দাও! নবীজি তখনও ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছিলেন। তাঁর শীত করছিল। মা খাদিজা তাঁকে চাদরে ঢেকে দিলেন, কিছুক্ষণ পর স্বাভাবিক হলে তিনি খাদিজার কাছে সব কথা খুলে বললেন।

রাসূলুল্লাহর আতঙ্কিত হওয়ার কারণ ছিল। তিনি জ্বিন, আত্মা, জাদু ইত্যাদি বিষয় মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন। তাঁর সাথে যা ঘটেছে, সেগুলোর সাথে জাদুকরদের জাদুর মিল আছে ভেবেই তিনি শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। সব শুনে খাদিজা তাঁকে অভয় দিয়ে বললেন,

'না, আল্লাহ তাআলা আপনাকে কখনও ত্যাগ করবেন না। আপনি ন্যায়পরায়ণ, আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করেন, অসহায়দের সাহায্য করেন, মেহমানদারি করেন। আপনার সাথে যা ঘটেছে তা কখনোই শয়তানের পক্ষ থেকে হতে পারে না।?

রাসূলুল্লাহর উত্তম আচার-আচরণ ও কাজের জন্য খাদিজা নিশ্চিত জানতেন যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁকে অবশ্যই হেফাজত করবেন।

খাদিজা তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকাহ ইবন নাওফালের কাছে নবীজিকে নিয়ে যান। ওয়ারাকাহ আইয়ামে জাহেলিয়াতে খ্রিস্টধর্মের অনুসারী ছিলেন। কিন্তু তিনি শিক্ষিত লোক ছিলেন। তাঁর কাছে বাইবেলের কিছু পাণ্ডুলিপিও ছিল, সেগুলো থেকে তিনি পড়াশোনা করতেন। খাদিজা তাঁর কাছে মুহাম্মাদের পুরো ঘটনা খুলে বললেন। ওয়ারাকাহ বললেন, 'যিনি এসেছিলেন তিনি হলেন শ্রেষ্ঠ ফেরেশতা জিবরীল -মূসা নবীর কাছে তিনিই এসেছিলেন।'

ওয়ারাকাহ তৎক্ষণাৎ বুঝে যান যে নবীজির কাছে আসলে জিবরীল ও এসেছে। যেমনি করে তিনি মূসার কাছে ওয়াহী নিয়ে আসেন, ঠিক সেভাবেই রাসূলুল্লাহর কাছেও ওয়াহীসহ আগমন করেছেন। ওয়ারাকাহ মূসা নবীর সাথে নবীজির ঘটনার সাদৃশ্য খুঁজে পাচ্ছিলেন। তিনি নবীজিকে কিছু কথা বলেন। কথাগুলো বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। তিনি বলেন, 'হায় যদি আমি সে সময় তরুণ থাকতাম যখন তোমার কওম তোমাকে বের করে দেবে।'

রাসূলুল্লাহ অবাক হয়ে বললেন, 'আমার কওম আমাকে আমার দেশ থেকে বের করে দিবে? তা কী করে হয়।' প্রশ্নটা তখনকার পরিস্থিতিতে খুবই স্বাভাবিক-রাসূলুল্লাহ সে সময় একজন সম্মানিত ও প্রশংসিত ব্যক্তি, মক্কার সম্ভ্রান্ত গোত্র বনু হাশিমের সন্তান। না তিনি কখনো কারো সাথে ঝগড়া করেছেন, না কোনো বিবাদে লিপ্ত হয়েছেন। তাঁর মতো মানুষকে মক্কা থেকে বের করে দেওয়া হবে-এটা চিন্তারও বাইরে। উপরন্তু, মক্কার সামাজিক ঐতিহ্যই

ছিল এমন যে, কাউকে তার ক্বওম থেকে বের করে দেওয়াটা চরম ঘৃণিত কাজ হিসেবে ধরা হতো। গোত্রতান্ত্রিক সেই সমাজে গোত্রভিত্তিক একতাই ছিল মরুভূমির চরমভাবাপন্ন আবহাওয়ায় বেঁচে থাকার একমাত্র হাতিয়ার। আর তাই গোত্রের লোকেদের মাঝে বিরাজ করতো বিশ্বাসের এক অটুট বন্ধন।

ওয়ারাকাহ বলেন, 'যারাই তোমার মতো এই ওয়াহী লাভ করেছে, তাদের সবার সাথে লোকেরা শত্রুতা করেছে, তাদেরকে ঘরছাড়া করেছে।' এই একটি মন্তব্য দ্বারাই ওয়ারাকার অগাধ জ্ঞান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তিনি ইতিহাস জানতেন। খুব ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, সত্যের সাথে মিথ্যার সংঘর্ষের পরিণতি কী হতে পারে। তিনি জানতেন যে মুহাম্মাদ যতোই প্রশংসার পাত্র হন না কেন, যখনই তিনি মানুষকের ইসলামের পথে ডাকতে আরম্ভ করবেন, তখন তাঁর সাথে এমনটাই ঘটবে। ওয়ারাকাহ ইবন নাওফালের প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছিল। তাঁর প্রতিটি অনুমান ছিল রাসূলুল্লাহর পরবর্তী জীবনের জন্য সতর্কবার্তা। তিনি নবীজিকে এটাই বুঝিয়ে দিলেন যে এই কাজ কোনো সহজ কাজ নয়।

ইকরা: জ্ঞানভিত্তিক এক উম্মাহ

মুহাম্মাদের ওপর অবতীর্ণ কুরআনের প্রথম শব্দটি ছিল "ইকরা।"-এর তাৎপর্য হলো, আমরা মুসলিমরা সেই উম্মাহ যে উম্মাহ অধ্যয়ন করে, গবেষণা করে এবং সর্বোপরি দ্বীনের ইলম বা জ্ঞানার্জন করে। এই একটি শব্দ একটি নিরক্ষর জাতির মাঝে আমূল পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল, তাদের মধ্যে তৈরি করেছিল বিশ্ববরেণ্য আলেমসমাজ। সে সময় নবীজির অনুসারীরা ছিল নিরক্ষর, কিন্তু এই শব্দগুলো তাদেরকে লিখতে ও পড়তে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যেই মুসলিম উম্মাহ বিশ্বের উচ্চ শিক্ষিত ও জ্ঞানী জাতিতে পরিণত হয়েছে। এই উম্মাহর মাঝে যে পরিমাণ আলেম তৈরি হয়েছে, তা অতুলনীয়! মুসলিম উম্মাহর আলেমদের গুণাগুণ লক্ষ করলে দেখা যাবে, তারা অনন্য-তাদের সাথে অন্য কোনো জাতির বিদ্বানদের তুলনাই হয় না।

উদাহরণস্বরূপ, ইমাম বুখারি-আড়াই লক্ষেরও বেশি হাদীস তাঁর ছিল মুখস্থ। কিংবা ইমাম শাফেঈ-যিনি বলেছিলেন, 'আমি যখন কোনো বই খুলি তখন আমি তার একটা পাতা ঢেকে

রাখি, কারণ আমি একটা পাতার সাথে আরেকটা পাতার তথ্য মিলিয়ে ফেলতে চাই না।' তাদের ছিল অসাধারণ সস্মৃতিশক্তি, ফটোগ্রাফিক মেমোরি, ছবির মতো করে সব তথ্য মনে রাখতে পারার ক্ষমতা। অথবা শাইখ আল ওয়াফা ইবন আকীল, যিনি তিনশ গ্রন্থের একটি বিশ্বকোষ লেখেন। অবশ্য দুর্ভাগ্যক্রমে সেটা এখন আর নেই। ওটার মূল পাণ্ডুলিপি বাগদাদ লাইব্রেরি থেকে লুট করে নেওয়া হয়। এটাই ছিল "ইকরা" শব্দের শক্তি, যা পুরো উম্মাহর এতটা পরিবর্তন এনে দেয়।

রাসূলুল্লাহর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ছিল একটু ভিন্ন। তিনি লিখতে বা পড়তে জানতেন না। তাঁর কাছে এই শব্দটির মানে ছিল 'তিলাওয়াত করুন', অর্থাৎ তিলাওয়াত করুন এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বাণীর পুনরাবৃত্তি করুন।

আল্লাহ আযযা ওয়াজাল তাঁর রাসূলকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নবীজির নিরক্ষরই রাখতে চেয়েছেন, এটি ছিল জন্য হুকুম। সূরা আল আনকাবুতে আছে,

"এবং আপনি তো এর পূর্বে কোনো কিতাব পাঠ করেননি এবং স্বহস্তে কোনো কিতাব লিখেননি। এরূপ হলে মিথ্যাবাদীরা অবশ্যই আপনার উপর সন্দেহ আরোপ করতো।" (সূরা আনকাবুত, ২৯: ৪৮)

আল্লাহ তাআলাই বলছেন যে রাসূলুল্লাহ কুরআনের আগে কোনো কিতাব পাঠ করেননি, তাঁর মাঝে লেখার বা পড়ার যোগ্যতা ছিল না। তিনি ছিলেন নিরক্ষর। সাধারণ মুসলিমদের জন্য পড়তে জানাই হচ্ছে জ্ঞানার্জনের চাবিকাঠি। কিন্তু নবীজির জন্য সত্যি বলতে, লিখতে-পড়তে পারাটা জরুরি ছিল না। রাসূলুল্লাহ স্বয়ং জিবরীল থেকে শিক্ষা নিচ্ছিলেন। সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে যে জন জ্ঞানার্জন করছেন, তাঁর জন্য বই থেকে শেখার মতো আসলেই কিছু নেই। আর তাই, তাঁর জন্য ইকরা শব্দটির অর্থ হলো "তিলাওয়াত করুন", কিন্তু উমম্মাহর জন্য এর অর্থ হলো, 'পড়ুন।' মুসলিমদেরকে লিখতে ও পড়তে শিখতে হবে।

"নুন। কসম কলমের এবং তারা যা লিপিবদ্ধ করে তার।" (সূরা কালাম, ৬৮: ১)

যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোনো কিছু নিয়ে শপথ করেন, তার অর্থ হলো সেই বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ কলমের নামে শপথ করেছেন। বদরের যুদ্ধে যুদ্ধবন্দী মুশরিকদের এই মর্মে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে, তারা দশজন মুসলিমকে লিখতে ও পড়তে শেখাবে। এসব থেকে বোঝা যায় ইসলাম জ্ঞানার্জনের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে।

এই উম্মাহ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে পারদর্শী এক উম্মাহ, যদিও দুর্ভাগ্যবশত আজ এই উম্মাহ তার দায়িত্ব পালনে অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে। ইলম অর্জনের ব্যাপারে উম্মাহর বর্তমান প্রজন্মের এই অনীহা যেন পরবর্তী প্রজন্মেও প্রসারিত না হয় সে ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। একবার বাচ্চাদের মধ্যে একটা জরিপ চালানো হয়। বিষয়বস্তু ছিল-কারা পড়তে ভালোবাসে আর কারা পড়তে ভালোবাসে না। জরিপের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাচ্চাদের লালন-পালনের ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়ে তারতম্যের কারণে কিছু বাচ্চা পড়তে ভালোবাসছে, আর অন্যেরা পড়তে অপছন্দ করছে সেগুলো খুঁজে বের করা।ফলাফলে দেখা গেল যেসব শিশুরা পড়তে পছন্দ করে, তাদের মাঝে কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

এক, তাদের বাবা-মা'রাও পড়তে ভালোবাসে। শিশুর বিকাশের প্রথম বছরগুলোই তার অনুকরণ করার সময়। একটা শিশু যখন তার বাবা-মাকে বই পড়তে দেখে, তখন তারা পড়তে না জানলেও আপনা-আপনি বই বা ম্যাগাজিন নিয়ে খেলতে শুরু করে। শিশুরা অনুকরণপ্রিয়। তাই বাড়িতে শিশুদের সামনে পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা হলে তাদের জন্য বই পড়ার দৃষ্টান্ত তৈরি করা সম্ভব।

দুই, যদি তারা বই-পুস্তক সমৃদ্ধ কোনো জায়গায় বেড়ে ওঠে, অর্থাৎ যেখানে প্রচুর বই কিংবা লাইব্রেরি আছে। অর্থাৎ তাদের জন্য বই খুব সহজলভ্য, এসব ক্ষেত্রে বড় হলেও তারা পড়তে ভালোবাসে।

তিন, তাদের নিজস্ব লাইব্রেরি থাকলে।

চার, তাদের বাবা-মা যদি তাদেরকে প্রায়ই বইয়ের দোকানে নিয়ে গিয়ে থাকেন।

পাঁচ, তারা এমন ধরনের শিশু যারা টেলিভিশন খুব কম দেখে কিংবা একেবারেই দেখে না।

বাবা-মায়েদের জন্য তথ্যগুলো অতীব জরুরি। লক্ষণীয় হচ্ছে, বাচ্চাদের বই পড়ার অভ্যাস বাড়ানোর অর্থ এই নয় যে, আজেবাজে গল্পের বই পড়বে বা যা-খুশি তা-ই পড়বে। কিছু বই আছে যেগুলো মানসিক বিকাশের সময়ে পড়া হলে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। যেমন মদীনার প্রাথমিক যুগে এমন একটি ঘটনা আছে, রাসূল দেখলেন উমার ইবন খাত্তাব তাওরাতের পাতা উল্টাচ্ছেন। রাসূল রেগে গেলেন, উমারকে এই কাজের জন্য কঠিনভাবে তিরস্কার করলেন। তবে তাওরাত পড়ার ওপর এই নিষেধাজ্ঞা ছিল সাময়িক। মুসলিমরা পরবর্তীতে নিজেদের আদর্শে বলীয়ান হলে এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। রাসূল বলেছেন, 'আমি তোমাদেরকে ইতিপূর্বে বনী ইসরাইলের কিতাব পড়তে নিষেধ করেছিলাম, তবে এখন সে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিচ্ছি। তোমরা এসব গল্পে বিশ্বাসও করবে না, অবিশ্বাসও করবে না।' অন্য কথায়, এইসব কিতাবে এমন কিছু কথা আছে, যেগুলোর সত্যতা কুরআন বা হাদীস দিয়ে যাচাই করার কোনো সুযোগ নেই, সেগুলোকে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস কোনোটাই করা ঠিক হবে না।

যেকোনো পাঠ্যসূচি এমনভাবে সাজানো উচিত যেন তা ছাত্রদের জন্য বোঝা হয়ে না দাঁড়ায়। রাসূল জানতেন, প্রাথমিক যুগে মুসলিমদের হাতে তাওরাত চলে গেলে তা তাদের স্বাভাবিক শিক্ষাগ্রহণ প্রক্রিয়ায় সমস্যা সৃষ্টি করবে। ইবন মাসউদ বলেন, 'তুমি যদি মানুষের সাথে এমন কথা বলো যা তাদের বোধশক্তির বাইরে, তাহলে সেটা তাদের জন্য ফিতনা হতে পারে।' কিছু জ্ঞান হচ্ছে কাজের আর কিছু অনর্থক। রাসূল প্রায়ই আল্লাহর কাছে দুআ করতেন, 'হে আল্লাহ। আমি আপনার কাছে উপকারী জ্ঞানের জন্য প্রার্থনা করছি, এবং আমি সেই জ্ঞান থেকে পানাহ চাই যে জ্ঞান কোনো কাজে আসে না।' সূরা আল বাক্বারাহতে আছে, দুজন ফেরেশতা, হারুত এবং মারুত দুনিয়ায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন মানুষকে জাদুর বিষয়ে শিক্ষা দিতে, যা ছিল ঈমানবিনাশী জ্ঞান।

সংক্ষেপে এই ছিল রাসূলের কাছে নাযিলকৃত প্রথম আয়াতের মর্মার্থ।

ওয়াহী: আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত ঐশী বাণীর বিভিন্ন রূপ

ইবনুল কায়্যিম ওয়াহীর বিভিন্ন প্রকার নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি অসাধারণ একজন আলিম, ইবনে তাইমিয়ার ছাত্রদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত। তিনি বলেন, প্রথম প্রকারের ওয়াহী হলো সত্য স্বপ্ন। এই উপায়েই রাসূল প্রথম ওয়াহী লাভ করা শুরু করেন। জিবরীল কর্তৃক ওয়াহী নাযিলের পূর্বে টানা ছয় মাস ধরে রাসূল নিয়মিত স্বপ্ন দেখতেন। রাতের বেলায় যে স্বপ্ন দেখতেন, পরদিন দিনের বেলায় সে স্বপ্ন সত্যি হতো, এইভাবে চলেছিল প্রায় ছয় মাস!

ওয়াহীর প্রথম প্রকার: স্বপ্ন

রাসূল বলেছেন, যেসব স্বপ্ন সত্য, সেগুলো নবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। রাসূল এর নবুওয়াতের জীবন ছিল তেইশ বছর দীর্ঘ, আর তিনি সত্য স্বপ্ন দেখেছেন ছয় মাস ধরে। তেইশ বছর সময়টাকে ছয় মাস দিয়ে ভাগ করলে অনুপাত দাঁড়ায় ১: ৪৬, ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। স্বপ্ন কেবল নবীরা নন, যে কেউই দেখে থাকে। পার্থক্য হলো এই- নবীদের স্বপ্ন এক ধরনের ওয়াহী হিসেবে বিবেচিত, অন্যদেরটা তা নয়। সাধারণ মানুষদের দেখা স্বপ্নের ব্যাপারে রাসূল তিনটি প্রকারভেদ বলেছেন,

১) সত্য স্বপ্ন: এ ধরনের স্বপ্ন সত্যি হয় অথবা যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয় সে ব্যাখ্যা অনুসারে এই স্বপ্ন সত্যি হয়।

২) শয়তানের পক্ষ থেকে স্বপ্ন: রাসূল বলেন, 'এই স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে এবং সে তোমাদের ক্ষতি করতে চায়।' রাসূল বলেন, 'যদি এমন স্বপ্ন দেখ, তাহলে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর এবং এই স্বপ্নের কথা কাউকে বলবে না।' কারণ, শয়তান চায় আমরা খারাপ স্বপ্ন দেখে চিন্তিত হয়ে পড়ি আর মানুষকে বলে বেড়াই। রাসূল বলেছেন এসব স্বপ্নের কথা কাউকে না বলতে, আর সেগুলো ভুলে যেতে। ৩) সাধারণ স্বপ্ন: এমন স্বপ্ন যা নিয়ে মানুষ দিনের বেলা ভাবে এবং রাতের বেলায় তা স্বপ্নে দেখতে পায়, এ স্বপ্নগুলো বস্তুত নিজের ভাবনার প্রতিফলন, যা নফস থেকে আসে।ওয়াহীর দ্বিতীয় প্রকার

এই প্রকার হলো ফেরেশতাদের মাধ্যমে রাসূলের ওপর ওয়াহী নাযিল হয় কিন্তু জিবরীল সরাসরি মুহাম্মাদের সামনে হাজির হন না। যেমন রাসূল বলেন, সেই মহান আত্মা (জিবরীল) আমাকে জানিয়েছেন, 'নির্দিষ্ট করে রাখা সময়ের আগে কারো মৃত্যু ঘটবে না। তাই আল্লাহকে ভয় করো এবং বিনীতভাবে তাঁর কাছে চাও। অধৈর্য হয়ে আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে চলে যেও না। আল্লাহর অনুগত্য করা ছাড়া আল্লাহর নিআমত অর্জন করা সম্ভব নয়।'

ওয়াহীর তৃতীয় প্রকার

এই প্রকারের ওয়াহী নাযিলের সময় ফেরেশতা মুহাম্মাদের সামনে মানুষের আকৃতি নিয়ে হাজির হন। এর উদাহরণ হলো হাদীসে জিবরীল, জিবরীল এসেছিলেন আর তাঁকে মুহাম্মাদ এবং অন্যরা দেখেছিলেন। মানুষের বেশে

ওয়াহীর চতুর্থ প্রকার

ফেরেশতা ঘন্টার মতো শব্দ করে আসতেন। এটাই ছিল সবচেয়ে কঠিন আবির্ভাব। জিবরীল তখন রাসূলকে শক্ত করে চেপে ধরতেন, শীতের দিনেও নবীজির ঘাম ছুটে যেতো। জিবরীল তাঁর ওপরে উঠে বসতেন, তাই রাসূল অস্বাভাবিক ভার অনুভব করতেন। আর সেই সাথে শুনতেন ঘণ্টা বাজার আওয়াজ পেতেন, সম্ভবত সেটি ছিল জিবরীলের পাখার কম্পনের শব্দ। একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, 'যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর আদেশ প্রেরণ করেন, তখন ফেরেশতারা এতটাই বিনয়াবত হয়ে পড়ে যে তাদের পাখাগুলো কাঁপতে থাকে এবং সেই পাখা কাঁপার শব্দ শুনতে পাথরের ওপর চেইন টেনে নিয়ে যাওয়ার আওয়াজের মতো শোনায়।'

জিবরীল ও যখন এই রূপে রাসূলুল্লাহর নিকটে আসতেন, তখন রাসূলুল্লাহর ওজন বেড়ে যেতো। দেখা যেতো, তিনি উটের উপর বসে আছেন, আর জিবরীল এসেছেন, তখন প্রবল চাপের ফলে বাধ্য হয়ে উট পর্যন্ত হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়ত। যাইদ ইবন হারিসা বলেন, "একদিন নবীজি বসে ছিলেন। আমার পায়ের উপর তাঁর হাঁটু রাখা ছিল।

এমতাবস্থায় ওয়াহী নাযিল হওয়া শুরু হয়। আমি তখন নবীজির হাঁটুর তীব্র চাপ অনুভব করি। আমার উরু যেন প্রচণ্ড চাপে দুমড়ে- মুচড়ে যাচ্ছিল।"

ওয়াহীর পঞ্চম প্রকার

এই প্রকারের ওয়াহী নাযিলের সময় ফেরেশতা তার স্বরূপে আগমন করেন। এরকম দু'বার হয়েছিল। সূরা নাজমে এর উল্লেখ আছে।

"নিশ্চয় সে তাঁকে আরেকবার দেখেছিল, দূরদিগন্তের সিদরাহ-গাছেরকাছে..." (সূরা নাজম, ৫৩: ১৩-১৪)

জিবরীলের পাখা এত বড় ছিল যে সেগুলো দিগন্ত ছেয়ে ফেলত, রাসূল বলেছেন, যখন জিবরীল তার স্বরূপে আসতেন, 'তিনি যেদিকেই তাকাতেন, সেদিকেই জিবরীলের পাখা দেখতে পেতেন।'

ওয়াহীর ষষ্ঠ প্রকার

এই প্রকারের ওয়াহীতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিজে সরাসরি রাসূলুল্লাহর সাথে কথা বলেছেন, কোনো মাধ্যম ছাড়াই। এটা হয়েছিল আল-মিরাজের সময়। মূসার সাথেও আল্লাহ এভাবে কথা বলেছিলেন। এই ছয় ভাবেই নবীজির কাছে ওয়াহী নাযিল হয়েছে। এক এক সময় এক এক ভাবে। নবীজির কাছে জিবরীল তাঁর নিজ রূপে কেবল দুবারই এসেছিলেন।

অগ্রগামী মুসলিমগণ

খাদিজা * ছিলেন ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম। তিনি তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত নবীজিকে সাহায্য-সহযোগিতা করে যান। ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম দাস হলেন যাইদ ইবন হারিসা, ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম শিশু হলেন আলী ইবন আবি তালিব এবং ইসলাম গ্রহণকারী সর্বপ্রথম পুরুষ হলেন আবু বকর সিদ্দীক। তবে ইসলাম গ্রহণকারী

প্রথম পুরুষ কে তা নিয়ে আলিমদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। কেউ বলেন আবু বকর ৪, কেউ বলেন আলী ইবন আবি তালিব। ইবন হাজার আল-আসকালানী এ মতবিরোধটি সমাধানের চেষ্টা করেন, তাঁর মতে, ইসলাম গ্রহণকারী সর্বপ্রথম পুরুষ আবু বকর, কেননা, আলী ইবন আবি তালিব বড়ই হয়েছেন নবুওয়াতের ঘরে, তিনি মক্কার কুরাইশদের ধর্ম গ্রহণই করেননি। ছোটবেলা থেকেই তিনি মুসলিম হিসেবে বড় হয়েছেন, তাই তাঁর অমুসলিম অবস্থা থেকে মুসলিম হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

আবু বকর দাসদেরকে মুক্ত করা ছাড়াও নানানভাবে ইসলামের খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন, তিনি ছিলেন অনেক ধনী এবং কুরাইশদের মধ্যে একজন সম্মানিত ব্যক্তি। আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ দান করার জন্য তিনি অনেক নন্দিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সমাজের প্রভাবশালী লোকেদের একজন। সমস্ত সম্পদ ইসলামের উপকারে ব্যয় করে দিয়েছিলেন। তাঁর সব সম্পদ, জ্ঞান ঢেলে দিয়েছিলেন নবী করীমের সেবায়। তিনি ছিলেন ইসলামের একজন মিশনারী। আর এ কারণেই তাঁকে বলা হয় 'সিদ্দীক', তিনি ছিলেন মু'মিন পুরুষদের মধ্যে প্রথম জন। সিদ্দীক মানে যে বিশ্বাস করেছে। লোকেরা রাসূলুল্লাহকে অবিশ্বাস করেছিল, আর আবু বকর তাঁকে বিশ্বাস করেছেন। বলা হয়ে থাকে, ইসলাম গ্রহণের সময়ে প্রত্যেকেই অন্তত মুহূর্তের জন্যে হলেও দ্বিধাদ্বন্ধে ভুগেছে, কিন্তু আবু বকরের ক্ষেত্রে এমনটি হয়নি। যখনই তাঁর সামনে ইসলামকে উপস্থাপন করা হয়, তিনি সেটা সাথে সাথে গ্রহণ করেন, তাঁকে ইসলাম গ্রহণের পূর্বে দ্বিতীয়বার চিন্তা করতে হয়নি। তিনি তাঁর সমস্ত সম্পদ নিয়ে আল্লাহর রাসূলের সামনে হাজির হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সেই স্বাধীন পুরুষ যিনি সর্বাগ্রে মুহাম্মাদকে আল্লাহর রাসূল হিসেবে দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নেন, তিনি হলেন সেই ব্যক্তি যিনি মিরাজের ঘটনায় সর্বপ্রথম বিশ্বাস স্থাপন করেন, তিনি হলেন সেই মুসলিম যিনি রাসূলের হিজরতের বিপদসংকুল সময়ে তাঁকে সঙ্গ দিয়েছিলেন।

রাসূলুল্লাহর সাহাবীদের মধ্যে কে সবচেয়ে বেশি আপন ছিলেন তা নিয়ে একটি হাদীস আছে: আবু দারদা বর্ণনা করেন, একবার আবু বকর এবং উমারের মধ্যে ঝগড়া হয়। এই দুইজন ছিলেন রাসূলুল্লাহর সবচে কাছের মানুষ, তাঁর উপদেষ্টা। আলী ইবন আবি তালিব বলেন, 'আমি দেখেছি, রাসূল যখনই কোথাও যেতেন, আবু বকর ও উমারকে সাথে করে যেতেন, কোথাও থেকে আসলে তাদের সাথে করে আসতেন, যখন তিনি বসতেন তাঁর এক পাশে থাকতো আবু বকর আর আরেক পাশে উমার।'

কিন্তু তারপরেও রাসূলুল্লাহর বিশেষ টান ছিল তাদের প্রতি যারা ইসলামের একেবারে প্রথম যুগে মুসলিম হয়েছিলেন। কাজেই যখন আবু বকরের সাথে উমারের ঝগড়া হলো, রাসূলুল্লাহ বললেন, 'আল্লাহ তোমাদের নিকট আমাকে পাঠিয়েছেন আর তোমরা আমাকে বলেছিলে-আপনি মিথ্যা বলছেন, কিন্তু তোমাদের মধ্যে ব্যতিক্রম ছিল আবু বকর, সে আমাকে বলেছিল-আপনি সত্য বলছেন, সে নিজেকে ও তার ভাগ্যকে আমার হাতে সঁপে দিয়েছিল, এরপরেও কি তোমরা আমার এই বন্ধুকে শান্তিতে থাকতে দেবে না? দেবে না শান্তিতে থাকতে?'

প্রকাশ্য দাওয়াতের শুরু

ইসলামের প্রারম্ভিক দাওয়াহ ছিল গোপন পর্যায়ে, কুরআনে আল্লাহ এই আদেশ করেছেন।

"আপনি নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দিন।" (সূরা আশ-শুআরা, ২৬: ২১৪)

এই আয়াতটি যখন নাযিল হলো তখন মুহামাদ পাহাড়ে উঠে বলে উঠলেন, "ওয়া সুবাহা!" সাইরেন বাজানোর মতো একটি বিষয় ছিল।ওয়া সুবাহা বলাটা সে যুগে ঘন্টা বা খুব গুরুতর কোনো ঘটনা হলে এই কথাটি বলা হয়। কাজেই যারাই তাঁর ডাক শুনতে পেল, তারা তার দিকে চলে গেল এবং যারা যেতে পারছিল না তারা অন্য কাউকে পাঠিয়ে দিল তিনি কী বলেন তা শুনে আসার জন্য।যখন সবাই একত্রিত হলো, রাসূল তাদেকে জিজ্ঞেস করলেন,

আমি যদি তোমাদেরকে বলি, এই পাহাড়ের পেছনে এক সৈন্যবাহিনী অপেক্ষা করছে তোমাদের অতর্কিতে হামলা করার জন্য, তোমরা কি তা বিশ্বাস করবে?

- আমরা তো কখনো আপনাকে মিথ্যা বলতে শুনিনি।
আমি এসেছি তোমাদেরকে এক কঠিন শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করতে, যদি তোমরা বিশ্বাস না করো, তাহলে তা তোমাদের উপর আপতিত হবে।

রাসূলুল্লাহর এই কথাগুলোই ছিল কুরাইশদের প্রতি ইসলামের প্রথম দাওয়াহ। লক্ষণীয়, তাঁর কথাগুলো খুব সোজাসাপ্টা এবং পরিমিত। এভাবে কথা বলার কারণ হলো আল্লাহ নবীদেরকে আদেশ করেছেন স্পষ্ট বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে। তাদের দায়িত্ব হলো 'বালাগুল মুবীন', এর অর্থ হলো, ইসলামকে মানুষের সামনে অস্পষ্টভাবে, ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে, এদিক-ওদিক করে, রাখ-ঢাক রেখে, কিছুটা গোপন করে, কিছুটা প্রকাশ করে, মধু-মাখাভাবে উপস্থাপন করা যাবে না। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, আজকে আমরা যখন মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিচ্ছি, আমাদের দাওয়াতে শ্রোতাদের মনে বিভ্রান্তির জন্ম হয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ তাঁর দাওয়াতে সন্দেহের কোনো অবকাশ রাখেননি। তাঁর কথা শুনে শ্রোতারা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিল যে, যদি তারা তাঁকে বিশ্বাস করে তাহলে তারা জান্নাতে যাবে আর অবিশ্বাস করলে জাহান্নাম।

যাই হোক, রাসূলুল্লাহ সবাইকে ডাকলেন এবং তারা ভাবলো নিশ্চয়ই খুব জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ডাকা হচ্ছে। বিষয়টি আসলেই গুরুত্বপূর্ণ ছিল কিন্তু তা অনুধাবনের ক্ষমতা সকলের ছিল না। তাঁর আপন চাচা আবু লাহাব বলে উঠলো, 'তোমার সারা দিন মাটি হোক, এই কথা বলতে তুমি আমাদের ডেকেছ?' আবু লাহাব খুবই বিরক্ত ও রাগান্বিত হলো। কারণ তাকে তার কাজ ছেড়ে এসে এসব কথা শুনতে হয়েছিল। ব্যবসার ব্যস্ত সময়ে কেনাবেচা ছেড়ে রাসূলের কথা শোনা ছিল তার জন্য নিতান্তই অগুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আবু লাহাবদের মতো লোকদের কাছে কাজ ফেলে জীবন, মৃত্যু, ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতা নিয়ে কথা শোনা সময় নষ্ট ছাড়া আর কিছুই নয়। সে ছিল প্রচণ্ড দুনিয়াবী, ওই সময়টা তার কাছে নিছকই টাকা কামানোর সময়। এমন ভাবনা তার একার নয়, মুসলিমদের মধ্যেও তার মতো অনেকেই আছে। তারা ধর্মীয় বিষয়ে কথা বলাকে স্রেফ সময় নষ্ট জ্ঞান করে, তারা শুধু সেই কাজে ও কথায় মন দেয় যা তাদেরকে দুনিয়াতে উপকার করবে। কিন্তু দুনিয়ার পরের জীবনে কী তাদের উপকারে আসবে সেটা জানার সময় তাদের হয়ে ওঠে না।

সূরা লাহাবের প্রথম দুই আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,"ধ্বংস হোক আবু লাহাবের উভয় হাত, আর সে নিজেও ধ্বংস হোক। তর ধন-সম্পদ ও যা সে অর্জন করেছে তা তার কোনো কাজে আসবে না।" (সূরা লাহাব, ১১১: ১-২)

আল্লাহ তাআলা বলছেন তার এই সম্পদ, অর্থ কোনো কাজেই আসবে না। যারা দুনিয়ার পেছনে ছুটে বেড়ায়, দুনিয়া তাদের কোনো কাজে আসবে না, যদি না তারা ইসলামের আলোকে জীবনযাপন করে। এই সূরাটি কুরআনের অলৌকিকত্বের একটি প্রমাণও বটে। কেননা, এই আয়াতে বলছে, আবু লাহাব ও তার স্ত্রী জাহান্নামে যাবে। এই আয়াত যখন নাযিল হয় তখন তারা বেঁচে ছিল, যদি তারা কুরআনকে ভুল প্রমাণ করতে চাইতো, তারা মুসলিম হয়ে গেলেই তা করে ফেলতে পারতো, কেননা কুরআন বলেছে তারা জাহান্নামী হবে আর তারা মুসলিম হয়ে গেলে এই কথা মিথ্যা হয়ে যায়। কিন্তু না, তারা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কাফের ছিল আর সে অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করে।

ইকরা, কুম, কুম-

মুহাম্মাদের উপর নাযিলকৃত সর্বপ্রথম আয়াতগুলো হলো সূরা আল আলাকের এই ক'টি আয়াত (৯৬: ১-৬)

"পড়ুন আপনার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পড়ুন আপনার প্রতিপালক মহা দয়ালু। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে (এমন জ্ঞানের), যা সে জানতো না।"

এগুলো হলো কুরআনের নাযিল হওয়া প্রথম আয়াতসমূহ। এই একটি ঘটনা রাসূলের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। এর পর কিছুদিন ওয়াহী আসা বন্ধ হয়ে যায়। আল্লাহর রাসূল যেন তাঁর ওপর ওয়াহী নাযিলের এই বিষয়টিকে ভালবাসতে পারেন, যেন এর অভাব বোধ করতে থাকেন-সেজন্য এই কিছুদিনের বিরতির দরকার ছিল। বাস্তবিকও তার এই অভাববোধ এতটা তীব্র আকার ধারণ করে যে, তিনি পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। সূরা আল আলাকের আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার পর নাযিল হয় সূরা মুযযাম্মিল এবং সূরা আল মুদ্দাসসিরের কিছু আয়াত। যদিও এ ব্যাপারে মতভেদ আছে যে, এ সূরা দুটির মধ্যে কোনটি আগে নাযিল হয়েছে, তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারের ওয়াহীতে এ দুটো সূরা থেকেই আয়াত নাযিল হয়েছে।

দাঈ-যারা ইসলামের দিকে আহ্বান করেন, তাদের জন্য এই আয়াতগুলো একটি নির্দেশিকা বা ম্যানুয়াল বুক হিসেবে কাজ করে। এই তিনটি ওয়াহীকে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে ইকরা, কুম, কুম। এই আয়াতগুলোই প্রথম যুগের মুসলিমদেরকে দাওয়াহর ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেয়।

প্রথম আদেশটি হলো "ইকরা"। এর মাধ্যমে তিলাওয়াত ও শেখার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। পরবর্তী আদেশটি এসেছে সূরা আল মুযযাম্মিলের দুই নম্বর আয়াতে, কুমিল লাইলা ইল্লা কুলীল-রাত্রে নামাজ পড়ো। আর সবশেষে সূরা আল মুদ্দাসসিরের দ্বিতীয় আয়াত, কুম ফা আনযির-যা রাসূলুল্লাহকে আদেশ দিচ্ছে, উঠে দাঁড়ান এবং অন্যদেরকে সতর্ক করুন। কাজেই প্রথম শিক্ষা হলো, পড়াশুনা করা, দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা। পরবর্তী ধাপ নিজের জীবনে তা বাস্তবায়িত করা, এবং তার পরের ধাপ হলো অন্যদেরকে জানানো।

ইবনুল কায়্যিম বলেন, 'দ্বীন নিজে শেখা, অন্যকে শেখানো আর আল্লাহ আযযা ওয়াজালের বার্তা প্রচার-এই তিনটি ধাপ পার না করে কেউ পরিপূর্ণ ঈমান অর্জন করতে পারে না।' প্রথম ধাপ হলো "ইকরা", অর্থাৎ জানা, আর নিজে জানার পরেই কেবল অন্যকে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। এর পরের ধাপ "কুম ফা আনযির" উঠুন, সতর্ক করুন। আর নিজে শেখা ও অন্যকে শেখানোর সাথে সাথে যে বিষয়টি অত্যাবশ্যক, তা হলো ইবাদাহ-নফল ইবাদাহ, যেমন কিয়ামুল লাইল। প্রথম যুগের মুসলিমদের জন্য বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত কিয়ামুল লাইল বাধ্যতামূলক ছিল। পরবর্তীতে এই আদেশ মুহাম্মাদ ছাড়া অন্য সকলের জন্যে রদ বা রহিত করে দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহর ওপর আমরণ কিয়ামুল লাইল বাধ্যতামূলক ছিল। নিজে শেখা, অপরকে শেখানো এবং ইবাদত করা, প্রতিটি বিষয় একে অপরের পরিপূরক। একটি পরিপূর্ণ মুসলিম ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই তিনটি বিষয় একত্রে সহায়ক হিসেবে কাজ করে।

ইসলামের বার্তা মানুষের কাছে প্রচার করা, তাদেরকে দ্বীনের শিক্ষা দেওয়া বেশ শ্রমসাধ্য ব্যাপার, এ ধরনের কাজ অন্তরকে নিঃশেষ করে ফেলতে পারে, আর তাই প্রয়োজন হয় অতিরিক্ত ইবাদত-বন্দেগীর, মধ্যরাতে আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়া, তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা। এই ইবাদত-বন্দেগীই একজন দাঈর অন্তরকে নরম করে, আর তাকে পরবর্তী দিনের জন্য প্রস্তুত করে তোলে। যিকরের ব্যাপারেও একই কথা বলা যায়। ইবনুল

কায়্যিম তাঁর শিক্ষক শাইখ ইবন তাইমিয়্যা সম্পর্কে বলেন, 'প্রতিদিন ফজর সালাতের পর তিনি বের হয়ে পড়তেন, চলে যেতেন দামাস্কাসের সীমান্তবর্তী বিস্তৃত মাঠগুলোতে। সেখানে বসে তিনি আল্লাহর নাম নিতেন-সূর্যোদয় হওয়ার আগ পর্যন্ত যিকর করতে থাকতেন। আমরা একদিন কৌতূহল মেটাতে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কেন প্রতিদিন এমন করেন? জবাবে ইবন তাইমিয়্যা বললেন, এটা হলো আমার সকালের নাস্তা, আমার আত্মার খাদ্য, এটা ছাড়া আমার শরীর অবসন্ন হয়ে যাবে। এটাই আমাকে সারাদিনে চলার শক্তি যোগায়-যদি সকালে আমি আমার রসদ না পাই, তাহলে সারাটা দিন আমি দুর্বল হয়ে থাকবো।'

রাসূলুল্লাহ এই কিয়ামুল লাইলের মাধ্যমেই দৃঢ়তা লাভ করেছিলেন। আর আল্লাহ তাআলা প্রথম যুগের মুসলিমদের ওপরেও এটি ফরয করে দিয়েছিলেন, কেননা তাদেরকে এমন কিছু পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয়েছিল, যা আর কাউকে করতে হয়নি। তাদেরকে যে তীব্র বাধা-বিপত্তির মুখোমুখি হতে হয়েছিল তা উম্মাহর পরবর্তী আর কাউকে ভোগ করতে হয়নি। এজন্যই তাদেরকে এই নিবিড় প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। তারা ছিলেন ইসলামের নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রীয় দল-দ্বীন ইসলামের ভিত্তিপ্রস্তর। তাদের ওপর ভিত্তি করে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সুতরাং তাদের দৃঢ় হওয়া জরুরি ছিল। এই প্রশিক্ষণ যারা লাভ করেছেন তারা সংখ্যায় ছিলেন অল্প, একশো'রও কম। কিন্তু এই প্রশিক্ষণ ও তারবিয়াহ তাদেরকে এমন প্রভাবশালী ও শক্তিশালী ব্যক্তিত্বে পরিণত করে যে, তারা যেখানেই যেতেন, সেখানেই প্রভাব বিস্তার করে ফেলতেন। মানুষের মনে তৎক্ষণাৎ তাদের ছাপ পড়তো। আনসারগণ মুসলিম হয়েছিলেন রাসূলুল্লাহর দাওয়াহর শেষার্ধে, কিন্তু যেহেতু মুহাজিররা প্রথম থেকেই তাদের সাথে ছিলেন, আনসাররা তাদের সাহচর্যে এসে অনেক কিছু দ্রুত শিখে ফেলেন। মুহাম্মাদ আনসার ও মুহাজিরের মাঝে ভ্রাতৃত্বের যে বন্ধন তৈরি করে দেন, তার মাধ্যমে দুইপক্ষই লাভবান হয়, আনসাররা মুহাজিরদের কাছ থেকে দ্বীনের আদর্শ ও জ্ঞান লাভ করেন এবং অপরদিকে মুহাজিররা আনসারদের কাছে থেকে তাদের প্রয়োজনীয় আর্থিক এবং সামাজিক সহায়তা পান। মুহাজিরদের ভেতর এমন একটি আলো ছিল, যা দ্বারা চারপাশের সবাই আলোকিত ও প্রভাবিত হতো। সুতরাং দাওয়াতের পাথেয় হিসাবে অবশ্যই এ তিনটি শব্দ মনে রাখতে হবে: ইকরা, কুম, কুম।

প্রকাশ্য দাওয়াতের পর মদিনায় প্রতিক্রিয়া

রাসূলুল্লাহর দাওয়াহর জবাবে কুরাইশদের প্রতিক্রিয়া ছিল বহুমাত্রিক। এক এক পর্যায়ে তারা এক এক রকম প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল। সামগ্রিকভাবে তাদের প্রতিক্রিয়াকে নিম্নোক্তভাবে সাজানো যেতে পারে:

১। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ

২। অপমান

৩। চরিত্রহননের চেষ্টা

৪। ইসলামের বার্তাকে বিকৃত করা এবং কুৎসা রটানো

৫। রাসূলুল্লাহর সাথে আপোস করা বা সমঝোতার চেষ্টা করা

৬। প্রলোভন

৭। চ্যালেঞ্জ

৮। চাপ প্রয়োগ

৯। হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা

১০। নির্যাতন-নিপীড়ন

১১। গুপ্তহত্যার প্রচেষ্টা

ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা আল-ফুরকানে বলেন,

"তারা যখন আপনাকে দেখে, তখন আপনাকে কেবল বিদ্রূপের পাত্ররূপে গ্রহণ করে, বলে, এ-ই কি সে যাকে আল্লাহ 'রাসূল' করে প্রেরণ করেছেন?"

(সূরা ফুরকান, ২৫: ৪১)

তারা বলতো-আল্লাহর কাছে কি রাসূল হিসেবে প্রেরণ করার জন্য এর চেয়ে যোগ্য কেউ ছিল না? তারা আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা, তাঁকে ব্যঙ্গ করা, ছোট করা কোনো কিছুই বাদ দেয়নি। রাসূলুল্লাহ ছিলেন কুরাইশের সবচেয়ে অভিজাত পরিবারের সন্তান, সুঠাম দেহ, উন্নত চরিত্রের অধিকারী। তাঁকে দেখলে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর প্রতি সম্ভ্রম তৈরি হয়। তারপরও কুরাইশরা তাঁকে নিয়ে মজা উড়াতো, কারণ তিনি ধনী ছিলেন না, ক্ষমতাও ছিল না। মানুষ সাধারণত ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখে বেশি প্রভাবিত হয়-যার ধন-সম্পদ বা ক্ষমতা-প্রতিপত্তি আছে, তার ব্যাপারে সবার বেশি আগ্রহ থাকে। বনী ইসরাঈল তাদের নবীর কাছে গিয়ে বলেছিল, 'আমরা চাই আপনি আমাদের উপর একজন রাজা নিয়োগ করেন, যেন আমরা জিহাদ করতে পারি।' তাদের ওপর রাজা হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল তালুতকে। কিন্তু তাকে তাদের পছন্দ হলো না। তালুত বিত্তশালী বা 'পয়সাওয়ালা' ছিলেন না। তাই বনী ইসরাঈলও তাকে মেনে নিল না। তাদের মনে হয়েছিল রাজা হওয়ার উপযুক্ত আরো বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাদের মাঝেই আছে, যারা তালুতের চাইতে বেশি বিত্তবান। মক্কায় রাসূলুল্লাহর সাথে এই আচরণেরই পুনরাবৃত্তি ঘটে। রাসূলুল্লাহ । যে বার তাইফে যান, এক লোক তাঁকে বলেছিল, 'তবে কি আল্লাহ নবী হিসেবে তোমার চাইতে ভালো আর কাউকে খুঁজে পায়নি?' এভাবেই তারা নবীজিকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতো।

অপমান:

কুরাইশের লোকেরা আল্লাহর রাসূলকে অপমান করতো, তাঁর ক্ষতি করার চেষ্টা করতো। একদিন কাবার পাশে কুরাইশদের কিছু নেতা বসে ছিল। আবু জাহেল তাদের কাছে এসে

বললো, 'আজকাল তোমরা নাকি মুহাম্মাদকে মাটির সাথে মুখ ঘষাঘষি করার সুযোগ দিচ্ছ? আমি যদি তাঁকে এমন করতে দেখি (অর্থাৎ সালাত আদায় করতে দেখি), তাহলে তাঁর গলায় পাড়া দিয়ে মুখটা ধুলোর মধ্যে ঘষে দিব।'

রাসূলুল্লাহ ঠিক তখনই সালাত আদায় করতে এলেন। নবীজি সালাত পড়ছেন, আর আবু জাহেল এক পা এক পা করে এগোচ্ছে। মুখে যত বড় হুমকি দিয়েছে, তার বাস্তবায়ন হবে তো?

আবু জাহেল হেঁটে মুহাম্মাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। মুহাম্মাদ তখন সিজদারত। উপস্থিত সবাই বিস্মিত চোখে দেখলো আবু জাহেল উল্টে পড়ে যাচ্ছে। তাঁর দু-হাত মুখের ওপর এনে অদ্ভুত ভঙ্গিতে নাড়াচ্ছে, যেন সে কোনো ভয়াবহ বিপদে পড়েছে আর হাত নাড়িয়ে কিছু একটা থামানোর চেষ্টা করছে। আবু জাহেল ফিরে আসার পর অন্যরা তাকে ঘিরে ধরলো। জিজ্ঞেস করতে লাগলো,

- তোমার হঠাৎ কী হলো?

-কী হলো মানে? তোমরা কী বলতে চাও? তোমরা কি দেখোনি কী হয়েছে?

-না আমরা কিছু দেখিনি। ওখানে তো কিছুই ছিল না। আমরা শুধু দেখলাম যে তুমি উল্টে পড়ে গেলে আর হাত নাড়তে লাগলে।

আমার সামনে একটা গর্ত ছিল, আর ছিল আগুন, বাতাস এবং আতঙ্ক। আবু জাহেল জবাব দিল।

আল্লাহর রাসূল বলেন, 'সেগুলো ছিল ফেরেশতা। সে যদি আমার দিকে আর একটুও এগিয়ে আসতো, তাহলে তারা তাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতো।

অন্য আরেকদিনের ঘটনা, উকবা ইবন আবু মুআইত একদিন কাবার পাশে রাসূলুল্লাহকে দেখতে পেল। নবীজির কাপড়ে হেচকা টান মেরে সেটা তাঁর গলায় পেঁচানো শুরু করলো,

যেন তাঁকে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলা যায়। আবু বকর ছুটে আসলেন। ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন উকবাকে। উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'তোমরা কি একটা মানুষকে শুধু এই জন্য মেরে ফেলবে কারণ সে বলে-আমার রব হলেন আল্লাহ?'

পৃথিবীতে অনেকেই আছে যারা অপমানিত বা অপদস্থ হলেও কিছু মনে করে না, তাদের আত্মসম্মানবোধ নেই, বোধবুদ্ধিও কম। কিন্তু আল্লাহর নবীরা খুব স্পর্শকাতর ছিলেন। তারা সম্মানী, আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মানুষ। আবু জাহেল বা উকবা ইবন আবু মুআইতের আচরণগুলো নবীজিকে খুব কষ্ট দিত, তবু তিনি উপেক্ষা করে যেতেন। তাদের বাজে কথার উত্তর দিতেন না, হাতাহাতিতেও যেতেন না। শুধু তাঁর দাওয়াতের মিশন অব্যাহত রাখার দিকে নিবদ্ধ হয়ে থাকতেন।

এরকম আরেকটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে সহীহ বুখারিতে, রাসূলুল্লাহ কাবার পাশে সালাত আদায় করছিলেন, পাশেই কুরাইশদের কয়েকজন নেতা বসা। এমন সময় তাদের কাছে আসলো আবু জাহেল। বললো, 'অমুক তো একটা উট জবাই করেছে, ওটার নাড়িভুঁড়িগুলো এনে মুহাম্মাদের গায়ে ঢালতে পারবে কে?' তাদের মধ্যকার সবচেয়ে জঘন্য লোকটাই সাড়া দিল, এই জঘন্য লোকটি হলো উকবা ইবন আবি মুআইত। সে উঠে গিয়ে উটের নাড়িভুঁড়ি যোগাড় করে আনলো। এরপর ঘাপটি মেরে বসে থাকলো কখন রাসূলুল্লাহ ও সিজদায় যান সেই আশায়। আল্লাহর রাসূল সিজদায় যাওয়া মাত্র নাড়িভুঁড়ির দলা চাপিয়ে দিল তাঁর পিঠের ওপর।

রাসূলুল্লাহ ও স্থির হয়ে সিজদাতেই পড়ে থাকলেন, যেন তাঁর সাথে কিছুই হয়নি। মেয়ে ফাতিমা। দূর থেকে দেখতে পেয়ে দৌড়ে বাবার কাছে ছুটে আসলেন। বাবার কাঁধে চেপে থাকা ময়লা-আবর্জনাগুলোকে দু হাতে সরিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহর সালাহ শেষ হলো। তিনি কুরাইশদের কিছুই বললেন না। শুধু জোরে জোরে একটি দুআ করলেন-

"হে আল্লাহ, শাস্তি দাও আবু জাহেল, উতবা ইবন রাবিআ, শায়বা ইবন রাবিআ, আল-ওয়ালিদ ইবন উতবা, উমাইয়া ইবন খালাফ, আর উকবা ইবন আবি মুআইত কে।"

এভাবে একে একে সাত জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে নাম ধরে দুআ করলেন রাসূলুল্লাহ, যদিও হাদিসের বর্ণনাকারী সপ্তম জনের নাম মনে করতে না পারায় এখানে শুধু ছয়টি নাম বলা হলো। আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ বলেন, 'আমি নিজের চোখে দেখেছি, এই সাত জনের প্রত্যেককে বদরের যুদ্ধে হত্যা করা হয়েছে।'

আল্লাহ নবীজির দুআ কবুল করেছিলেন।

চরিত্র হননের চেষ্টা

কুরাইশরা আল্লাহর রাসূলকে বিভিন্ন আজেবাজে নামে ডাকতো।

"তারা বলে, ওহে, যার প্রতি কোরআন নাযিল হয়েছে, তুমি তো আলবৎ একজন উন্মাদ।" (সূরা হিজর, ১৫: ৬)

উন্মাদ বা পাগল ডাকার পাশাপাশি জাদুকর, মিথ্যুক এসব বলেও সম্বোধন করতো। কুৎসা রটানোর জন্য যা মুখে আসতো, বলতো। কিছুই বাকি রাখেনি। তারা চাচ্ছিলো রাসূলুল্লাহর নামে কুৎসা রটিয়ে, তাঁর ভাবমূর্তিকে নষ্ট করে দিতে। লোকে যেন তাঁর কথায় পাত্তা না দেয়। তাহলেই ইসলামের প্রচার-প্রসার থেমে যাবে। এভাবে চরিত্রহননের মাধ্যমে তাঁর নিয়ে আসা ইসলামের বার্তাকে ধ্বংস করে দিতে চাইছিল কুরাইশরা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

"আমি অবশ্যই জানি, তারা যা বলে তা আপনাকে কষ্ট দেয়। কিন্তু তারা তো আপনাকে অস্বীকার করে না, বরং জালিমরা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করে।" (সূরা আন'আম, ৬: ৩৩)

তারা বস্তুত ব্যক্তি মুহাম্মাদকে প্রত্যাখ্যান করে নি- মনের গভীরে তারা বিশ্বাস করতো যে মুহাম্মাদ সত্যি কথাই বলছেন কিন্তু তারপরও তারা তাঁর বিরোধিতা করেছে। কারণ তাদের সমস্যা ছিল ইসলাম। নিজেদের ধর্ম বাদ দিয়ে ইসলামকে তারা কোনো ক্রমেই মেনে নিতে

চায়নি। ওয়ারাকা ইবন নওফালের সতর্কবাণীই যেন সত্যি হয়ে উঠছিল। নবুওয়াতের একেবারে প্রথম দিকে, তিনি রাসূলুল্লাহকে বলেছিলেন, 'তোমাকে তোমার দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।' সেদিন এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ চমকে উঠেছিলেন, তিনি জানতেন মক্কার লোকেরা তাঁকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে। কিন্তু ওয়ারাকাহ অমোঘ বাণীর মত বলেন, 'যে ব্যক্তিই দ্বীনের এই বার্তা নিয়ে এসেছে, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়েছে।'

মক্কার বাজারগুলো তখন কেবলমাত্র ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা কেনাকাটার জায়গা নয়, বরং এগুলো তাদের জন্য সাংস্কৃতিক কেন্দ্রও বটে। সেখানে কাব্যচর্চা চলতো, চলতো বক্তৃতার চর্চা। সেরা কবিতাকে সসম্মানে ঝুলানো হতো আল-কাবার দেয়ালে। এগুলোকে বলা হতো আল-মুয়াল্লাকাত বা ঝুলানো কবিতা।

আল্লাহর রাসূল এই বাজারগুলোতে এসেই দাওয়াহ দিতেন, সাধারণ জনতাকে বোঝাতেন ইসলামের কথা। ইমাম আহমেদ বর্ণনা করেছেন যে রাবিআ ইবন হাদ্দাদ বলেন,

"আমি আল্লাহর রাসূলকে জুলমাজায় বাজারে দেখেছি। তিনি লোকদের ডেকে বলছিলেন, তোমরা বলো, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তাহলেই তোমরা সফলকাম হবে। রাসূলুল্লাহর সাথে নতুন নতুন লোকের দেখা হতো আর তিনি একই কথার পুনরাবৃত্তি করতেন।

হঠাৎ এক লোক তাঁর পিছু নিল। রাসূলুল্লাহ যার সাথেই কথা বললেন, সেই লোক পেছন পেছন গিয়ে তাকে বলে আসতো, এই লোককে (অর্থাৎ মুহাম্মাদকে) বিশ্বাস কোরো না, সে একটা মিথ্যুক।

আমি জিজ্ঞেস করলাম এই লোকটি কে, তারা আমাকে বললো, সে তাঁর চাচা আবু লাহাব।

রাবিআ ইবন হাদ্দাদ মক্কার অধিবাসী ছিলেন না। তাই তিনি আবু লাহাবকে চিনতেন না। এই ঘটনা বলে দেয় মুহাম্মাদের জন্য দাওয়াতের কাজ চালিয়ে কী ভয়াবহ দুঃসাধ্য ছিল- তিনি যা কিছুই করতেন, আবু লাহাব সেটা ভেস্তে দিত। সাধারণত নবুওয়াহ, দাওয়াহ এবং প্রতিক্রিয়ার ফলে মানুষের মনে লেগে থাকার উৎসাহ জাগায়। আর্থিক প্রতিদান, সমাজের

কাছে স্বীকৃতি, নেতাকর্মীদের কাছ থেকে পাওয়া সহায়তা ইত্যাদি-অন্তত কিছু একটা বিনিময়ের আশা নিয়েই মানুষ খাটতে থাকে। আশানুরূপ বিনিময় না পেলে মানুষের কাজের ইচ্ছা মরে যায়, প্রেরণা থাকে না, একসময় সে ক্ষান্ত দেয়। প্রতিদানের আশা না করেই কোনো কাজ করে যাওয়া খুব কঠিন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ। আর নবী-রাসূলরা ব্যতিক্রম। তারা নিরবিচ্ছিন্নভাবে লাগাতার কাজ করে গেছেন, যদিও তারা বিনিময়ে কিছুই পাননি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নূহের এর কথা। তিনি দিনরাত তাঁর জাতির কাছে দাওয়াহ দিয়েছেন-গোপনে এবং প্রকাশ্যে, কিন্তু বলার মতো কোনো সাড়া তাদের মাঝে পাননি। চোখের সামনে বিরোধিতাকারী এক জাতিকে নিয়েও তিনি দাওয়াহ করে গেছেন সুদীর্ঘ নয়শ পঞ্চাশ বছর।

এমন আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন বায়হাকী। হাজ্জের মৌসুম সবে শুরু, আল- ওয়ালিদ ইবন মুগীরা সে সময় কুরাইশদের একজন বয়োজ্যেষ্ঠ মুরুব্বি। সে কুরাইশ নেতাদের নিয়ে মিটিং ডাকলো। বললো, হাজ্জের মৌসুম আসছে, আরবের প্রতিনিধিরা কিছুদিন পরেই এখানে জমায়েত হবে। আসো সবাই মিলে (মুহাম্মাদের বিষয়ে) একটি সিদ্ধান্তে আসি। এই বিষয়টা নিয়ে আমাদের মধ্যে যেন কোনো মতভেদ না থাকে। তার বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য ছিল যে, মুহাম্মাদের ব্যাপারে একটা হেনস্থা করা। হাজ্জের সময় মক্কায় অনেক লোকের সমাগম হবে, আর মুহাম্মাদও এই সুযোগ হাতছাড়া করবে না, তাদের কাছে ইসলামের বার্তা নিয়ে যাবে, তাই মুহাম্মাদের ব্যাপারে তারা সবাইকে কী বলবে সে বিষয়ে সর্বসম্মত বক্তব্যে পৌঁছানো জরুরি ছিল। একেকজন একেক রকম কথা বললে কোন লাভ হবে না। কেউ বলবে সে মিথ্যুক, কেউ বলবে গণক, কেউ বলবে জাদুকর-এভাবে না করে বরং সবাই মিলে একই অপবাদ দিলে লোকে বেশি বিশ্বাস করবে।

কুরাইশরা ওয়ালিদ ইবন মুগীরাকে বললো, "আপনিই বলেন কী করা যায়। আপনি যেটা বলবেন, আমরা সেটাই সবাইকে বলবো।"

- আমি তোমাদের মুখে শুনতে চাই, ওয়ালিদ জবাব দিল।

- আমরা বলবো যে, সে একজন জ্যোতিষী।

- না, সে জ্যোতিষী নয়। আমি জ্যোতিষী দেখেছি, তাঁর মধ্যে জ্যোতিষীদের বৈশিষ্ট্য

নেই, সে তাদের মতো অন্তঃসারশূন্য কথা বলে না।

- তাহলে আমরা বলবো যে, সে পাগল, বদ্ধ উন্মাদ।

- আমি পাগলও দেখেছি এবং তাদের প্রকৃতিও দেখেছি, সে তাদের মতো অপ্রকৃতস্থ আচরণ করে না, অসংলগ্ন কথাও বলে বেড়ায় না। সে উন্মাদ নয়, উন্মাদ কাকে বলে আমরা জানি।

- তাহলে আমরা বলবো যে, সে একজন কবি।

- না, না, সে কোনো কবি নয়। আমরা সব রকম ছন্দের কবিতাই চিনি, সে যা বলে তা কোনো কবিতা না।

- তাহলে আমরা বলি যে, সে একজন জাদুকর।

এই প্রস্তাবেও ওয়ালিদ রাজি হলো না, বললো-সে কোনো জাদুকরও নয়, আমা জাদুকর দেখেছি আর তাদের জাদু-কৌশল দেখেছি। সে ঝাঁড়ফুক করে না, জাদুটোনাও করে না।

কুরাইশের নেতারা একে একে সম্ভাব্য সকল অপবাদ পেশ করলো। কিন্তু ওয়ালিদ ইবন মুগীরা বললো, না, এগুলো বলে কোনো লাভ হবে না।

- তাহলে, আপনি বলে দিন আমরা তাঁর ব্যাপারে কী বলবো।

ওয়ালিদ অনেকক্ষণ চিন্তা করে বললো,

'আল্লাহর কসম করে বলছি, তাঁর কথা বড়ো মিষ্টি, কী যেন গভীর তাৎপর্য আছে তাঁর কথায়। তোমরা তাঁকে নিয়ে যেটাই বলো না কেউ তোমাদেরকে বিশ্বাস করবে না। তবে

তাঁর সম্পর্কে এ কথা বলতে পারো, তিনি একজন জাদুকর। তিনি যেসব কথা পেশ করেছেন তা স্রেফ জাদু। তাঁর কথা শুনলে পিতা-পুত্র, ভাই-ভাই, স্বামী-স্ত্রী এবং ্গোত্র ও তার সদস্যের মাঝে বিরোধ লেগে যায়।

কুরআনে আল্লাহ এই ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন,

"সে (সত্য গ্রহণের ব্যাপারে কিছুটা) চিন্তাও করেছিল, তারপর আবার নিজের গোঁড়ামিতে ডুবে থাকার সিদ্ধান্ত নিল। তার উপর অভিশাপ, কেমন করে সে (সত্য জানার পরেও) বিরোধিতার সিদ্ধান্ত নিলা তার উপর আবারও অভিশাপ, সে কীভাবে এমন সিদ্ধান্ত নিল। সে একবার (উপস্থিত লোকদের দিকে) চেয়ে দেখলো, (অহংকার ও দম্ভভরে) সে ভ্রু কুঁচকালো এবং মুখটা বিকৃত করে ফেললো। অতঃপর সে পেছনে ফেরলো এবং অহংকার করলো। এরপর বললো, এটা তো লোক পরস্পরায় প্রাপ্ত জাদুবিদ্যার খেল ছাড়া কিছু নয়। এটা তো মানুষের কথা।" (সূরা মুদদাসসির, ৭৪: ১৮-২৫)

ইসলামকে বিকৃত করে উপস্থাপন করা

আন নযর ইবন হারিস পারস্য গিয়ে গল্প শিখে আসতো। সেখান থেকে মক্কায় ফিরে এসে সে লোকদের ডেকে ডেকে বলতো, 'আমার কাছে আসো, আমার কাছে আসলে আরও ভালো ভালো কাহিনি শুনতে পাবে।' সে লোকজনকে বলতো, মুহাম্মাদের বার্তা আসলে কেচ্ছা-কাহিনি দিয়ে ভরা, ওসব হচ্ছে গল্পকথা-কোনো ভিত্তি নেই। আল্লাহর নবীদের সাথে আসলেই কী হয়েছিল তা কি কেউ জানে? মুহাম্মদ যা বলছে
সেসব বানোয়াট রূপকথার গল্প। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

"আর তারা বলে, এগুলো তো পুরাকালের রূপকথা এসব সে লিখিয়ে নিয়েছে, আর এগুলো তার কাছে পাঠ করা হয় সকালে ও সন্ধ্যায়।" (সূরা ফুরফান, ২৫: ৫)

আপস এবং সমঝোতা:

কুরাইশের লোকেরা আল্লাহর রাসূলের সাথে আপোসের চেষ্টাও করেছিল। নবীজির কাছে এসে বললো-আসুন, আমরা একটি চুক্তি করি। আমরা এই শর্তে রুজি যে, আপনি এক দিন আমাদের দেব-দেবীর ইবাদত করবেন, আর আমরা পর দিন আল্লাহর ইবাদত করবো।

রাসূলুল্লাহ তাদেরকে বললেন যে তিনি কখনোই এমন কিছুতে রাজি হবেন না। তারা কিছুক্ষণ পর আবার তাঁর কাছে ফিরে আসলো। এবার বললো-আপনার জন্য এবার আগের বারের চেয়েও ভালো প্রস্তাব আছে। আপনি এক দিনের জন্য আমাদের দেবদেবীর ইবাদত করেন, তাহলে আমরা এক সপ্তাহ যাবৎ আল্লাহর ইবাদত করবো।

- না, রাসূলুল্লাহ তাদের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন।

এরপর আবার ফিরে এসে তারা আরেকটি প্রস্তাব দিলো। বললো, 'ঠিক আছে, আমরা নাহয় এক মাস ধরে আল্লাহর ইবাদত করবো, আপনি শুধু আমাদেরকে একটি দিন হলেও দিন।'

রাসূলুল্লাহর সেই এক জবাব, 'না', আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করলেন,

"তায়া চায় আপনি নমনীয় হন, তবে তারাও নমনীয় হবে।” (সূরা কালাম ৬৮: ৯)

কুরাইশদের ধর্ম ছিল মানবরচিত, তাদের নিজহাতে তৈরি, তারা চাইলেই আপোস করতে পারতো, যখন খুশি ধর্মকে নিজের মন মত বদলে নিতে পারতো। তাদের জন্য এটা কোনো ব্যাপার না। কিন্তু রাসূলুল্লাহর কাছে কোনো বিকল্প ছিল না। এমনকি তারা যদি বলতো, রাসূলুল্লাহ মাত্র এক দিন দেব দেবীকে পূজার বিনিময়ে, তারা সারা বছর আল্লাহর ইবাদত করবে, তারপরও নবীজির সামনে দ্বীনকে ছাড় দেওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। এই ধরনের আপোস বা সমঝোতা ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেন,

"বলুন, হে কাফিররা, তোমরা যার ইবাদাত করো, আমি তার ইবাদাত করিনা। এবং আমি যার ইবাদাত করি তোমরা তার ইবাদাতকারী নও। আর তোমরা যার ইবাদত করছ আমি

তার ইঝদাতকারী হবো না। আর আমি যার ইবাদাত করি তোমরা তার ইবাদাতকারী নও। তোমাদের জন্য তোমাদের দীন আর আমার জন্য আমার দীন।" (সূরা কাফিরুন, ১০৬: ১-৬)

কুরাইশের লোকেরা আরও নানাভাবে সমঝোতায় আসার চেষ্টা করলো। কিন্তু কোনোটাই কাজে দিলো না। দিনে দিনে তারা আরও ক্ষেপে গেল, কিন্তু রাসূলুল্লাহর এক কথা-তিনি কেবল একজন রাসূল, আল্লাহর পাঠানো একজন দাস মাত্র- আল্লাহর দ্বীনের উপর হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার তিনি রাখেন না।

প্রলোভন এবং চ্যালেঞ্জ:

এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন ইবন আব্বাস। কুরাইশ নেতারা কাবার পাশে মিলিত হলো। বললো-আমরা সবরকম উপায়ে প্রচেষ্টা চালাবো, মুহাম্মাদকে এবার কোনো অজুহাত দেওয়ার সুযোগ দেবো না। তারা রাসূলুল্লাহকে ডেকে পাঠালো।

নবীজির মনে বড়ো আশা কুরাইশরা ইসলাম গ্রহণ করবে। তাদের ডাক পেয়ে খুব খুশি হলেন, ভাবলেন হয়তো তাদের মন বদলেছে, হয়তো তারা ইসলামের প্রতি একটু নরম হয়েছে।

নবীজি ছুটতে ছুটতে হাজির হলেন। তারা বললো-হে মুহাম্মাদ! তোমার সাথে মিটমাট করার উদ্দেশ্যে আমরা তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি। তাদের বক্তব্যের শুরুটা এমনই ছিল, সুন্দর, আশা জাগানিয়া। কিন্তু এরপরই তারা গা-জ্বালা করা কথাবার্তা বলতে শুরু করলো,

'আল্লাহর কসম, তুমি যা করলে, আর কোনো আরব লোক তার কওমের জন্য তোমার মত এত যন্ত্রণা আনে নি। বাপ-দাদার বিরোধিতা, আমাদের ধর্মের সমালোচনা, আমাদের রীতিনীতি নিয়ে উপহাস, দেব-দেবীকে অভিশাপ দেওয়া সবই তুমি করেছো। আমাদের সমাজটাকে বিভক্ত করে ফেলেছো তুমি। তোমার সাথে আমাদের সম্পর্কে ফাটল ধরানোর জন্য আমাদের অপ্রিয় কোনো কাজ করতে বাদ রাখোনি।'

এরপর শুরু হলো নানা রকম প্রলোভন দেখানো। তারা বললো,

'মুহাম্মাদ। অর্থের আশাতেই যদি তুমি এই বাণী প্রচার করে থাকো, তাহলে আমরা তোমার জন্য যত লাগে সম্পদের ব্যবস্থা করবো, তোমাকে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বিত্তশালী বানিয়ে দেব। তুমি যদি ক্ষমতার আশায় এ ধর্ম নিয়ে এসে থাকো, তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের রাজা হিসেবে বেছে নিতে পারি। আর তুমি যদি নারীর লোভে এসব কাজ করে থাকো, তাহলে আমরা তোমার জন্য কুরাইশের সবচেয়ে সেরা দশ নারীকে বাছাই করে আনবো, এরপর তাদের প্রত্যেককে তোমার সাথে বিয়ে দেব। যদি তোমার ওপর শয়তান ভর করে থাকে, তাহলে আমরা তোমার সুস্থতার জন্য যা কিছু লাগে ব্যয় করবো, এমনকি যদি তাতে আমাদের সমস্ত সম্পদও দিয়ে দিতে হয়, তাও দেব। আমাদেরকে শুধু বলো তুমি কী চাও।'

রাসূলুল্লাহ জবাবে শান্তকণ্ঠে বললেন,

'তোমরা যা কিছুই বলেছো, তার কিছুই আমি চাই না। অর্থকড়ি, মানমর্যাদা কিংবা তোমাদের ওপর ক্ষমতা লাভের আশায় তোমাদের কাছে ইসলামের বার্তা নিয়ে আসিনি। আল্লাহ তোমাদের কাছে আমাকে একজন রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তিনি আমার উপর তাঁর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং আমাকে আদেশ দিয়েছেন তোমাদেরকে সুসংবাদ দিতে ও সতর্ক করতে। আমি তোমাদের কাছে আমার রবের পক্ষ থেকে একটি বার্তা নিয়ে এসেছি মাত্র। তোমাদেরকে পরামর্শ দিয়েছি যে, যা আমি তোমাদের কাছে হাজির করলাম, তোমরা তা গ্রহণ করে নিলে তোমাদের জন্যই মঙ্গলজনক-এই দুনিয়া ও আখিরাতে দু জগতেই। আর যদি তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করো, তাহলে আমি আল্লাহর সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করবো, যতক্ষণ না তিনি আমার এবং তোমাদের মাঝে ফয়সালা করে দেন।'

তারা তাঁকে বললো,

"তুমি যদি আমাদের কোনো প্রস্তাবই মানতে না চাও, তাহলে শোনো, আমাদের দেশ অনেক সংকীর্ণ, আমরা খুবই দরিদ্র, আর আমাদের জীবনযাত্রাও দুর্বিষহ। এক কাজ করলে

কেমন হয়, যে রব তোমাকে পাঠিয়েছে, তাঁকে গিয়ে তুমি একটু বলো যেন সে এই পর্বতগুলো সরিয়ে দেয়, এগুলোকে মাটির সাথে মিশিয়ে সমতল করে একটু ফাঁকা স্থান তৈরি করে দিলেই চলবে। আর তুমি এটা কেন তাঁকে বলছো না মক্কার মধ্যে কয়েকটি নদী প্রবাহিত করে দিতে? যেমন করে সিরিয়া আর ইরাকে নদী আছে, সেরকম। আমরাও তো অন্যদের মতো নদী চাই! আর হ্যাঁ, আরেকটা ব্যাপার, আমরা চাই যে, তুমি তোমার রবের কাছে গিয়ে বলো, সে যেন আমাদের কয়েকজন পূর্বপুরুষকে মৃত থেকে জীবিত করে দেয়। কুসাই ইবন কালবের প্রাণও ফিরিয়ে এনো কিন্তু, তিনি তো অনেক জ্ঞানী লোক ছিলেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করবে যে তুমি যা বলছো তা কি সত্য নাকি মিথ্যা। মুহাম্মাদ, তুমি যদি এটুকু করতে পারো আর আমাদের বাপ- দাদারা যদি তোমার কথা মেনে নেয়, তাহলে আমরা তোমাকে অনুসরণ করবো।"

রাসূলুল্লাহ এবারও শান্তকণ্ঠে উত্তর দিলেন,

'এ কারণে আমাকে পাঠানো হয়নি। আমি রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে কেবল সেটাই এনেছি, যা সহকারে তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন। আমার তোমাদেরকে যা জানানোর ছিল তা জানিয়েছি, যদি তোমরা তা গ্রহণ করো, তাহলে তা তোমাদের জন্যই কল্যাণকর, এই দুনিয়া এবং আখিরাতে। আর যদি তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করো, তাহলে আমাকে অবশ্যই ধৈর্য সহকারে আল্লাহর আদেশের অপেক্ষায় থাকতে হবে যেন তিনি আমাদের মধ্যে বিচার করে দেন।'

তারা বিদ্রুপ করতেই থাকলো,

'আচ্ছা, তাহলে এক কাজ করো, তুমি তোমার রবকে বলো একজন ফেরেশতা পাঠাতে, যে তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে যে তুমি সত্য বলছো। আর তোমার রবকে বলো যেন আমাদের জন্য কিছু দুর্গ, বাগান, সোনা ও রুপার খনি দান করে, আর হ্যাঁ, আরেকটা কাজ করলে কেমন হয়-তুমি তাঁকে বলো যেন সে তোমার প্রয়োজনটাও পূরণ করে দেয়, কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি তুমি আমাদের মতো করে জীবিকা মেটানোর চেষ্টা করছো।'

তারা এই বলে উপহাস করছিল যে, মুহাম্মাদ যদি আল্লাহর এত প্রিয় বান্দা হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁকে কেন অন্য সবার মতো অর্থ উপার্জন করতে হচ্ছে! তাই তারা বলছিলো যে, আল্লাহর কাছ থেকে ধনসম্পদ নিয়ে আসতে। যেন তিনি যে আল্লাহর নিকটবর্তী বান্দা-সে কথা প্রমাণিত হয়। এসব কথাতেও রাসূলুল্লাহর হলো না বা তিনি উত্তেজিত হলেন না, তিনি এতটুকুই বললেন, ধৈর্যচ্যুতি

'আমি এসব কিছুই করবো না। আমি আমার রবের কাছে এসব জিনিস চাইতে যাবো না। এসব কারণে আমাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করা হয়নি। আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর দ্বীন প্রচারের জন্য। যদি তোমরা আমার উপস্থাপিত বার্তা স্বীকার করে নাও, তাহলে দুনিয়া ও আখিরাতে তা তোমাদের জন্যই লাভজনক। আর যদি তোমরা তা অস্বীকার করো, তাহলে আমি অবশ্যই ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত। আর আমি এই বিষয়টি আমার রবের হাতে ছেড়ে দিলাম যতক্ষণ না তিনি আমার ও তোমাদের মাঝে ফয়সালা করে দেন।'

তারা বললো, 'আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে তোমার রবকে বলো তুমি আমাদেরকে যে শাস্তির প্রতিজ্ঞা করছো, সেই শাস্তি প্রেরণ করতে।'

আল্লাহর রাসূল বললেন, 'এটা আল্লাহর হাতে, যদি তিনি চান তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন।'

তারা টিটকারি মেরে বললো, 'আরে মুহাম্মাদ, তোমরা রব কি জানে না যে আমরা তোমাকে এসব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছি? সে কেন তোমাকে উত্তর দিতে সাহায্য করছে না? আমরা ভালোই জানি কে তোমাকে এইসব শিক্ষা দিচ্ছে, তোমাকে তোমার এই কুরআন শেখাচ্ছে ইয়ামামার এক লোক, তার নাম আর-রহমান। আর আমরা সেই আর-রহমানের কথায় কখনোই বিশ্বাস স্থাপন করবো না।'

কুরাইশরা হঠাৎ করে 'আর-রহমান' নামক ব্যক্তির গল্প ফেঁদে বসে। তাদের মাঝে একজন বললো, 'যাও, যাও, গিয়ে আল্লাহর কন্যা ফেরেশতাদের ইবাদত করো।' আরেকজন বললো, 'আমরা তোমাকে ততক্ষণ বিশ্বাস করবো না যতক্ষণ না তুমি আল্লাহ এবং তাঁর

ফেরেশতাদেরকে আমাদের সামনে হাজির করছো।' তারা সবাই মিলে রাসূলুল্লাহকে উপহাস, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে তাঁকে অপমান করে সে স্থান থেকে চলে গেল।

সবাই চলে যাওয়ার পর তাদের মাঝে একজন রাসূলুল্লাহর কাছে ফিরে আসলো, তার নাম ছিল আবদুল্লাহ ইবন উমাইয়া। তার ফিরে আসা দেখে মনে হয় যেন তার মুহাম্মাদের জন্য খারাপ লাগছে, হয়তো সে ক্ষমা চাইবে। সে নবীজির কাছে এসে বললো,

'মুহাম্মাদ, তোমার লোকেরা তোমার কাছে সেরা সেরা প্রস্তাব পেশ করেছে, আর তুমি-তুমি তাদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছ। তোমাকে কোনো অলৌকিক ঘটনা (মু'যিজা) দেখাতে বললো, সেটাতেও তোমার আপত্তি। তারপর বলা হলো, তুমি যেন তাদের ওপর আযাব নিয়ে আসো, সেটাও তুমি পারলে না। এবার আমি তোমাকে একটা কথা বলি-আমি তোমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাস করবো না, যতক্ষণ না তুমি একটা মই নিয়ে আসো যেটা সরাসরি ওই আকাশ পর্যন্ত যায়। তুমি মই বেয়ে ওপরে উঠবে আর আমি তোমাকে দেখবো। তারপর তুমি আল্লাহর কাছে পৌঁছে তাঁকে বলবে সে যেন তোমার ব্যাপারে (প্রমাণস্বরূপ) একটি পত্র লিখে দেয়; সেখানে লেখা থাকবে যে, তুমি তার নবী, আর এর ওপর থাকবে তার স্বাক্ষর। এরপর চারজন ফেরেশতা সেই পত্র সঙ্গে করে নিচে নেমে আসবে, আর তারাও সাক্ষ্য দিবে যে তুমি আল্লাহর রাসূল। সত্যি কথা কী জানো, তুমি যদি এতকিছু করেও ফেলো, আমার মনে হয় এরপরও আমি তোমাকে বিশ্বাস করবো না।'

এই ছিল রাসূলের চারপাশের পরিবেশ এবং মানুষগুলোর অবস্থা ও তাদের মানসিকতা। এ ধরনের লোকদের তিনি দাওয়াহ করছিলেন।

চাপ প্রয়োগ -

কুরাইশরা রাসূলুল্লাহর ওপর চাপ সৃষ্টি করছিল। তাঁকে দমিয়ে রাখতে সম্ভাব্য সকল পথেই হেঁটেছে তারা। এক পর্যায়ে নবীজির চাচা আবু তালিবকে কাজে লাগিয়ে তাদের হীন উদ্দেশ্য হাসিলের প্রয়াস চালায়। আবু তালিবের ছেলে আকীলের মুখেই এর একটি বিবরণ পাওয়া যায়।

'একদিন কুরাইশের লোকেরা বাবার কাছে এসে খুব হৈ চৈ লাগিয়ে দিলো। বললো, তোমার ভাতিজা মুহাম্মাদ, আমাদের সভা-সমাবেশে বাধা দিচ্ছে, দশ পদের ঝামেলা বাঁধাচ্ছে। তাঁকে বলে দিও-আমাদের থেকে সাবধান, তাঁকে যেন ধারেকাছেও আর না দেখি। বাবা আমাকে ডেকে বললেন, মুহাম্মাদকে ডেকে আনো। আমি ভাইকে খুঁজতে

বেরোলাম। একটা কেনাসের মধ্যে তাঁকে খুঁজে পেলাম।"

"রাসুলুল্লাহ বাবার সাথে দেখা করতে এলেন। বাবা বললেন, লোকেরা তোমার নামে অভিযোগ এনেছে। তুমি নাকি তাদের সভায় বাধা দিচ্ছো, কী সব ঝামেলা পাকাচ্ছো, তুমি কেন এসব করছো?"

আবু তালিব মুহাম্মাদের সাথে ধমকের সুরে কথা বলছিলেন না। হুকুম দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি ভাতিজাকে ডাকেননি, বরং ভাতিজার জন্য যা ভালো হবে বলে মনে হয়েছে, তেমনটাই পরামর্শ দেওয়ার জন্য ডেকেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন-চাচা, আপনি কি সূর্য দেখতে পাচ্ছেন?

- হ্যাঁ।

- এই সূর্যের তাপ থেকে আমাকে রক্ষা করতে আপনি যতোটা অপারগ, আমার এ দাওয়াতী কাজ থামিয়ে দিতেও আমি ততোটাই অপারগ।

ইসলাম ছিল রাসূলুল্লাহর জীবন, জীবনের মিশন। এই মিশন থেকে সরে আসার কথা তিনি ভাবতেও পারতেন না। অপেক্ষাকৃত দুর্বল একটি বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, 'যদি তারা আমার ডান হাতে সূর্য আর বাম হাতে চাঁদ এনে দেয়, তবুও আমি এ কাজ থেকে বিরত থাকবো না, যতক্ষণ না স্বয়ং আল্লাহ তাআলা এই বিষয়ের ফয়সালা করে দেন, অথবা আমার মৃত্যু হয়।' তাঁর চাচা ভাতিজার কথার উত্তরে বলেন, আমার ভাতিজা, তুমি সত্য বলেছো। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। এগিয়ে যাও এবং নিজের মিশন পূর্ণ

করো। আবু তালিব বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর ভাতিজাকে এই কাজ থেকে বিরত রাখা যাবে না। তাই তিনি নবীজিকে সবরকম ভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করতে সম্মত হন।

কুরাইশরা রাসূলুল্লাহকে আটকানোর জন্য সর্বোতভাবে চেষ্টা চালাতে থাকে। কুরাইশদের অত্যাচার ও নিপীড়ন থেকে বাঁচার জন্য মুহাম্মাদ .তাঁর কিছু সাহাবীকে আবিসিনিয়াতে হিজরত করার নির্দেশ দেন। সঙ্গে সঙ্গে কুরাইশরা আবিসিনিয়ার শাসক নাজ্জাশির সাথে যোগাযোগ করার জন্য উঠেপড়ে লাগে। তারা তড়িঘড়ি করে তাঁর কাছে রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করে তাঁকে বলে তিনি যেন তার দেশে হিজরত করা মুসলিমদেরকে মক্কায় ফেরত পাঠান।

সে সময় মুসলিমদের অবস্থা করুণ। রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বা অর্থনৈতিক ক্ষমতা- কোনো বিচারেই তৎকালীন মুসলিমরা কুরাইশদের সমকক্ষ বা হুমকিস্বরূপ ছিল না।

শিবে আবু তালিবে নির্বাসন:

আবু তালিব রাসূল-এর ওপর শত্রুদের ষড়যন্ত্রের কথায় উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছিল। বাস্তবেই তারা তা করেছিল। উৎপীড়নমূলক চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল। সেই চুক্তিনামা কাবার ঘরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। চুক্তিপত্রের বিষয় ছিল-বনু হাশিম ও তাদের অধীনস্থ সকলের সাথে সব ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করা। তাদের সাথে কোনো প্রকার বিকিকিনি চলবে না; এমনকী বিয়ে পর্যন্ত করা যাবে না।

এই উৎপীড়নমূলক চুক্তিপত্র ছিল অন্যায় ও জুলুমের সূচনা। এই কৌশলই ইসলামের শত্রুরা যুগে যুগে ব্যবহার করেছে। রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং বনু হাসিমকে শিবে আবু তালিব এ নির্বাসিত করা হলো।

কুরাইশ বংশ এই ন্যক্কারজনক কাজ করেই ক্ষান্ত হননি; বরং তা কাবার দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখে। এর ফলাফল ছিল খুবই ভয়াবহ। বনু হাশিম দারিদ্র্য ও ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়ে। ক্ষুধা নিবারণের জন্য তাঁদের কিছুই ছিল না। বাধ্য হয়ে শুকনো চামড়া খেতে শুরু করে। কিন্তু কিছুতেই খাওয়া যেত না, পেট মোচড় দিয়ে উঠত। মাথা গুলিয়ে যেত। বমি আসত। তারপরও চোখ-মুখ বন্ধ করে গিলে ফেলত। বনু হাশিমের এই নিদারুণ দুঃখ-

কষ্ট দেখে কিছু হৃদয়বান মানুষের অন্তর কেঁপে ওঠে। তাদের মনুষ্যত্বে আঘাত লাগে। তাঁরা এই অবিবেচক চুক্তিপত্রের শর্ত ভঙ্গ করে, চুক্তিপত্র ছিঁড়ে ফেলতে চায়। কিন্তু তা হাতে নিয়ে তাঁরা অবাক হয়ে পড়ে। উইপোকা চুক্তিনামা গিলে খেয়ে ফেলেছে! এই ঘটনা প্রচ্ছন্ন আভাস দেয়-নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা অন্যায়-অবিচার প্রশ্রয় দেন না।

মৃত্যু শয্যায় আবু তালিব:

রাসূল-কে সাহায্য করার জন্য আবু তালিব বারবার এগিয়ে এসেছেন। আবু তালিব ও বনু হাশিমের কিছু সুবিবেচক মানুষ নবিজিকে রক্ষায় নির্দ্বিধায় এগিয়ে এসেছেন। অকুণ্ঠচিত্তে রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছেন, চারপাশ থেকে ছায়া দিয়েছেন। এসবের অনেক অর্থ আছে, তাৎপর্য আছে, রহস্য আছে।

যে তাৎপর্যটা আপাতদৃষ্টিতে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠে, তা হলো-এই মানুষগুলো যদিও ঈমান আনেনি, কিন্তু তাঁদের নির্দিষ্ট একটা অবস্থান ও স্তর আছে। প্রত্যেকেরই রয়েছে আপন আপন স্থান ও অবস্থান। যেমন: আবু তালিবের কথাই ধরি। তাঁর নির্দিষ্ট অবস্থান আছে। রাসূল তাঁর হিদায়াতের ব্যাপার বেশ আগ্রহী ছিলেন; এমনকী শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। একেবারে 'মরণকালে' এসেও বলেছেন, 'হে চাচা! আপনি বলুন-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', আমি তার ওপর ভর করেই কিয়ামতের দিন আপনার হয়ে সুপারিশ করব।' জবাবে আবু তালিব বললেন- 'যদি কুরাইশরা আমাকে এই বলে লজ্জা না দিত-একমাত্র ভীতিই তাঁকে ইসলাম গ্রহণে প্রণোদনা জুগিয়েছে, তবে আমি তা বলে তোমার চোখ জুড়াতাম!'

আবু তালিব মৃত্যুশয্যাতেও ইসলাম গ্রহণ করেনি। শেষ পর্যন্ত ঈমানের সাথে তাঁর মৃত্যু হয়নি। তিনি মরতে মরতে বলছিলেন- 'আমি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মকে আঁকড়ে ধরে মারা গেলাম।'

আবু তালিবের মৃত্যু ইসলামের ওপর হয়নি। তারপরও সমস্ত মুসলিম তাঁর এই মহান কীর্তির কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে। যারাই সিরাত লিখেছেন, নবিজীবনের এই অধ্যায় বেশ গুরুত্ব দিয়েই তুলে ধরেছেন। আবু তালিবের অভাবনীয় মহানুভবতা ও

উদারতার কথা বর্ণনা করেছেন;বরং কুরআনই তাঁর প্রতি রাসূল -এর ব্যক্তিগত ভালোবাসার কথা বলেছে। কিন্তু সেই ভালোবাসা দ্বীনের স্বার্থে ছিল না। এই জন্যই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

'নিশ্চয় তুমি যাকে ভালোবাসো, তাঁকে হিদায়াত দিতে পারো না।' সূরা ক্বাসাস: ৫৬

হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে রাসূল আবু তালিবকে ভালোবাসতেন। তাঁর ভালোবাসার নিদর্শন ছিল, তিনি তাঁকে হিদায়াতের পথে আনতে চেয়েছিলেন।

এ থেকে একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়, তা হলো-অনেক অমুসলিমের ইসলামের প্রতি অনুরাগ জন্মে, ইসলাম গ্রহণ করতে মন চায়, কিন্তু তাদের নিজেদের কিছু দায় থাকে। আপন কাজ ও দায়িত্বের প্রতি বিশ্বস্ত ও নিষ্ঠাবান থাকতে হয়। ফলে আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও ইসলাম গ্রহণ করা সম্ভব হয়ে উঠে না-এই ব্যাপারটাও আমাদের মাথায় রাখা উচিত। অথচ কাফিরদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যাদের ব্যাপারে কুরআনের ভাষ্য হলো-

'যারা কুফুরি করেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে, তিনি তাদের আমল নষ্ট করে দেন।' সূরা মুহাম্মাদ: ১

এরা কুফুরি করার পাশাপাশি আল্লাহর রাস্তায় প্রতিবন্ধকতাও সৃষ্টি করেছে। এতে তাদের কুফুরি দ্বিগুণ হয়েছে। কুরআনে এমনও ইরশাদ হয়েছে-

'যারা কুফুরি করে এবং আল্লাহর রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, আমি তাদের শাস্তির ওপর শাস্তি দেবো।' সূরা নাহল: ৮৮

কারণ, এই প্রকারের কাফিররাই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় এবং অহেতুক যুদ্ধ করে।

উপরিউক্ত আয়াতগুলো থেকে একটা ব্যাপার বেশ পরিষ্কার হয়ে ওঠে, সব কাফির এক নয়। কাফিরদের মাঝে বিভিন্ন শ্রেণি আছে। এজন্যই এই মানুষগুলোর সাথে আচরণে ও

চলাফেরায় আমাদের সতর্ক থাকা উচিত। তাদের সাথে সততা ও ন্যায়নিষ্ঠার সাথে লেনদেন করা উচিত। কারণ, একমাত্র আমাদের উত্তম আচরণ ও অনুপম গুণাবলিই তাদের ইসলামের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে পারে। হয়তো আজ যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে, গতকাল সে এই ব্যাপারে চিন্তা করছিল। এক মাস আগে পড়েছে। বছরখানেক আগে শুনেছে আর ইসলামকে জানতে চেষ্টা চালিয়েছে। সে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছে। তারপর আলোর এই দিগন্তে এসে শামিল হয়েছে। আলোর কাফেলায় সমবেত হয়েছে। হতে পারে আপনি যে অমুসলিমের মুখোমুখি হচ্ছেন, সে এই দ্বীনের পথে অনেক দূর হেঁটেছে। এই জন্য আমাদের উচিত হলো-আল্লাহর পথে অন্তরায় না হওয়া; বরং আমরা এমন মানুষ হব, যাদের উত্তম আচরণ ও উন্নত আদর্শে মানুষ এই দ্বীনের প্রতি আগ্রহী হবে। আর এ কথাও মনে রাখা উচিত, কাফিররাই দাওয়াতের ক্ষেত্র, উর্বর ভূমি।

দু:খের বছর

নবুয়তের দশম বছর। চাচা আবু তালিব হঠাৎ করেই মারা যান। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে রাসূল ভেঙে পড়েন, মর্মাহত হন। তাঁর প্রিয় চাচা ঈমান নিয়ে মরতে পারেননি, ব্যাপারটা তাঁর চিন্তাকে আরও দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয়। এমনকী একপর্যায়ে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়-

'আপনি যাকে ভালোবাসেন, তাঁকে আপনি হিদায়াত দিতে পারেন না। কিন্তু আল্লাহ যাকে চান, তাঁকে হিদায়াত দিতে পারেন।' সূরা ক্বাসাস: ৫৬

রাসূল আবু তালিবকে ভালোবাসতেন। তাই তাঁর হিদায়াতের ব্যাপারে রাসূল-এর ব্যাকুলতা ছিল অনেক বেশি। তাঁকে ঘিরে তাঁর উৎকণ্ঠা ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা চাননি। খোদায়ি প্রজ্ঞা বোঝার সাধ্য কার? তাই আল্লাহ তায়ালা রাসূল-কে সান্ত্বনা দিলেন। কুরআনে আয়াত অবতীর্ণ করলেন।

রাসূল তাঁর চাচার মৃত্যুতে খুবই ব্যথিত হন। অথচ তাঁর চাচা ঈমান আনেননি। নবুয়ত স্বীকার করেননি, তারপরও চাচার মৃত্যুতে তাঁর ভেঙে পড়ার কিছু কারণ আছে।

প্রথম: রাসূল-কে তাঁর চাচা সুরক্ষা ও নিরাপত্তা দিয়েছেন। মাথার ওপর ছায়া হয়ে ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে কুরাইশের দুঃসাহস বেড়ে যায়। অথচ তাঁর জীবদ্দশায় কেউ তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকানোরও সাহস করেনি।

দ্বিতীয়: চাচা কুফুরি নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন, ঈমান নিয়ে নয়। কুফুরি এই দ্বীনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মানবতাবোধকে অস্বীকার করে। আর ইসলাম মানুষের মানবিক গুণাবলিকে অস্বীকার তো করেই না; বরং তার ভিত আরও শক্ত করে এবং মার্জিত করে। এই বোধের পরিচয় পাওয়া যায় একটা ঘটনায়। নবি বলেছেন-

'একজন মহিলা একটা কুকুরকে পানি পান করিয়ে জান্নাতে গেলেন। আবার অন্যদিকে অন্য একজন মহিলা একটা বিড়ালকে বন্দি রাখার কারণে জাহান্নামে যায়।' সহিহ বুখারি: ৭৪৫

একই বছরে চাচা আবু তালিবের মৃত্যুর পর, ইতিহাসবিদের মতে তিন দিন পর প্রানাধিক প্রথম স্ত্রী খাদিজা (রা:) মারা যান।

বর্তমান সময়ে দাওয়াতের রীতি ও কৌশল কিছুটা পরিবর্তন করা দরকার। দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে ইসলামের সুউচ্চ মূল্যবোধের কথা তুলে ধরতে হবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রতিটি মানুষ জানবে, ইসলামের মূল ভিত্তিই মানুষের সম্মান ও মর্যাদার ওপর প্রতিষ্ঠিত। কুরআনে বলা হয়েছে-

'আমি বনি আদমকে সম্মানিত করেছি, জলে ও স্থলে তাদের চলার বাহন দিয়েছি, উত্তম রিজিক দিয়েছি এবং যাদের সৃষ্টি করেছি, তাদের অনেকের মধ্যে তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।' সূরা বনি ইসরাইল: ৭০

মাক্কি জীবনে কুরআনের সম্বোধন ছিল-'ওহে মানুষ'। তারপর মাদানি জীবনে সম্বোধনে পরিবর্তন আসে। তখন হয়ে যায়- 'হে ঈমানদারগণ'।

কুরআনের এই শিক্ষা যেন আমরা কিছুতেই ভুলে না যাই।

খুবাইব ইবনে আদির কথা নিশ্চয় মনে আছে। মৃত্যুর মুখে দৃঢ় ও অবিচল খুবাইব। মক্কার এক সংকীর্ণ কক্ষে তাঁকে বন্দি করে রাখা হয়। তাঁকে তাঁর আত্মীয়স্বজন ও গোত্রের সামনে হত্যা করা হবে। এ নিয়ে তাঁর মধ্যে কোনো বিকার নেই; নেই কোনো উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা। একটু আগে ক্ষৌরকর্ম সেরেছেন, যেন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার আগে নিজেকে প্রস্তুত করে নিচ্ছেন। তাঁর হাতে এখনও সেই ক্ষুর। এমন সময় তাঁর কক্ষে একটি বাচ্চা আসে। যারা তাঁর হত্যার আয়োজন করছে, তাদের বাচ্চা। তিনি শিশুটিকে আদর করলেন। প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে শিশুটিকে হত্যা করতে যাননি। এই ছিল শত্রুদের সাথে মুসলমানদের আচরণ। তাই আমরা যেন কিছুতেই শত্রুতার বশে অন্ধ হয়ে না যাই। প্রতিশোধপরায়ণতা যেন আমাদের আত্মপরিচয় ভুলিয়ে না দেয়।নবুয়তের এই বছরটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামের ইতিহাসে এই বছরটা 'আমুল হুজন' তথা দুঃখের বছর, দহনকাল নামে পরিচিত। এই বছরের নানা ঘটনা মুসলমাদের মানবিক হতে শেখায়। শত্রুদের সাথে আচরণের উত্তম রীতি ও পন্থা শেখায়। অন্যের জন্য-এমনকী সে ঘোর শত্রু হলেও-চিন্তিত হতে শেখায়। কেউ যদি ঈমানের সাথে মরতে না পারে, তার জন্য ব্যথাতুর হতে শেখায়। ইসলামের এই মহান শিক্ষা থেকে মুসলিমরা যেন কিছুতেই বিস্মৃত না হয়।

তায়েফের দিন

একদিন রাসূল আয়িশা-এর ঘরে গেলেন। তাঁর সাথে বসে খানিকক্ষণ গল্প করলেন। স্বামী-স্ত্রীর মধুর গল্প। ফেলে আসা পুরোনো দিনের স্মৃতিচারণ করলেন। আয়িশা রাসূল-কে বদর, উহুদ ও আরও নানা যুদ্ধের কথা জিজ্ঞেস করে বললেন-'হে আল্লাহর রাসূল! উহুদের দিন তো বেশ বিভীষিকাময় ছিল। অনেক মানুষ নিহত হয়েছে, আবার অনেকে ঘোরতর আহত হয়েছে। এমনকী যুদ্ধের একপর্যায়ে আপনার চেহারা ফেটে যায়, রক্ত বের হয়, আপনার সামনের পাটির দাঁত ভেঙে গিয়েছিল। আচ্ছা, এর চেয়েও ভয়াবহ কোনো দিন কি আপনার জীবনে এসেছিল?' জবাবে নবিজি বললেন- 'হ্যাঁ, এসেছিল। আয়িশা! তোমার জাতির অকথ্য নির্যাতন তো আমি সহ্য করেছি, কিন্তু সবচেয়ে নিদারুণ কষ্ট আমাকে সহ্য করতে

হয়েছিল "আকাবা"র দিন। আমি বনু সাকিফের তিনজন ব্যক্তির কাছে আমার বক্তব্য পেশ করছিলাম। এরা ছিল আবদে ইয়ালিল ইবনে আবদে কুলাল, আমর ইবনে উমরের ছেলে মাসউদ ও হাবিব।'

এই তিন ব্যক্তি ছিল বনু সাকিফের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। রাসূল তাদের সাথে বসে আলাপ করেন। তাদের ইসলামের প্রতি আহ্বান এবং ইসলামের সাহায্যে এগিয়ে আসার আবেদন করেন। জবাবে তাদের একজন বলল-'খোদা কি অন্য কাউকে পাননি, যে তোমাকে পাঠিয়েছে?' অন্য একজন বলল-'তোমাকে যদি আল্লাহ পাঠিয়ে থাকে, আমি কাবা ঘরে আস্ত একটা গিলাফ দেবো।' তৃতীয়জন বলল-'আমি কখনোই তোমার সাথে কথা বলব না। যদি তুমি রাসূল হয়ে থাকো, তাহলে তোমার সঙ্গে কথা বলা আরও বিপজ্জনক।' রাসূল তাদের কথা শুনে মর্মাহত হন। বিষণ্ণ মন নিয়ে সেখান থেকে চলে আসেন।

রাসূল আয়িশা -কে বলেন-'আমি বিষণ্ণ মন নিয়ে চলে এলাম।' রাসূল-এর এই বিষণ্ণতা কিংবা দুশ্চিন্তা বৈষয়িক উন্নতি-অগ্রগতির জন্য, প্রভাব-প্রতিপত্তির জন্য ছিল না। তাঁর একমাত্র উৎকণ্ঠা ছিল দাওয়াত ও তাবলিগের কাজ নিয়ে, মানুষের দ্বীনি দাওয়াত গ্রহণ করা নিয়ে। এটাই প্রকৃত নিষ্ঠাবান দায়ির বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ যেমনটা বলেছেন-'তারা যদি এই কথার প্রতি ঈমান না আনে, তাহলে হয়তো আপনি তাদের জন্য অতিরিক্ত আফসোস করে করে নিজেকে শেষ করে দেবেন।' (সূরা কাহাফ)

সেখানকার দুষ্ট ছেলেদের নবীজীর পেছনে লেলিয়ে দেয় এই তিন ভাই,তারা পাথর ছুঁড়ে নবীজীকে রক্তাক্ত করে ফেলে।

নবি উৎকণ্ঠা নিয়ে পথ চলছেন। তাঁর মধ্যে একধরনের ঘোর কাজ করছে। দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠা তাঁকে কুরে কুরে খাচ্ছে: এমনকী তাঁর রক্ত-মাংসের সাথে মিশে গিয়েছে। 'কুরনুল সাআলিব'-এ গিয়ে তাঁর চিন্তা শেষ হয়, ঘোর কাটে। তাঁর ঘোর কাটার উপলক্ষ্য ছিল জিবরাইলের আগমন। জিবরাইলের আগমনের সময় আকাশে একখণ্ড মেঘের দেখা মিলত। জিবরাইল সালাম দিয়ে বলেন-'নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা আপনার সাথে হওয়া আপনার জাতির আলাপ শুনেছে। তাদের প্রতিউত্তরও শুনেছে। আপনার কাছে পাহাড়ের ফেরেশতাকে পাঠিয়েছেন; তাদেন ব্যাপারে যা মন চায় আদেশ করুন।' তিনি বললেন-'আমাকে পাহাড়ের

ফেরেশতা ডাকলেন এবং সালাম করে বললেন-"হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ আপনার ও আপনার স্বজাতির মাঝে হওয়া আলাপ শুনেছেন। আমি পাহাড়ের কর্তৃত্বের অধিকারী ফেরেশতা। আল্লাহ আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন; যা আপনার মন চায় আদেশ করুন। আপনি যদি চান, আমি তাদের এই দুই পাহাড়ের সঙ্গে মিশিয়ে দেবো।

রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাহাড়ের ফেরেসতাকে বলেন,না,আপনি তাদের পিষে মারবেন না।হতে পারে একদিন এখানকার মানুষ দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করবে।

কতটা উদার মানসিকতার হলে এমনটা বলা সম্ভব।এটা শুধু নবী , রসুলে পারেন আলহামদুলিল্লাহ।

ইসরা ও মিরাজ

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন চড়াই-উতরাই ভরা শ্বাপদসংকুল এ পথে বার বার হোঁচট খাচ্ছিলেন। এক বার আকাশ ভরা স্বপ্ন নিয়ে সামনে দৌড়ে যাচ্ছিলেন আরেক বার জীবন যুদ্ধে বাস্তবতার প্রচণ্ড ঝড়ের মুখোমুখি হয়ে থমকে দাঁড়াচ্ছিলেন। ইসলামের সাফিনা আরব সাগরের তরঙ্গোদ্বেল বুকে কখনো পাল তুলে হেলে দুলে চলছিল আবার পরক্ষণেই মাতাল সমুদ্রের তুফানের কোলে পড়ে গন্তব্য ছেড়ে কাত হয়ে যাওয়ার উপক্রম করছিল। কিন্তু আশার পাল্লা-ই যখন ভারী ছিল; অসফলতার বদলে সফলতার গতি ও মাত্রা বেশি ছিল; আশার তারাগুলি সুদূর দিগন্তে ঝিকিমিকি করতে শুরু করেছিল; ঠিক তখনই রিসালতের জীবনে ইসরা ও মি'রাজের ঘটনা ঘটেছিল।

ঐতিহাসিকগণ ইসরা ও মি'রাজের তারিখ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে চরম মতানৈক্যের জন্ম দিয়েছে।

এক. কারও কারও মতে, ইসরার ঘটনা সে বছরই ঘটেছিল যে বছর আল্লাহ তাআলা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে নবুওতের ধনে ধন্য করেছিলেন। তাবারী র. এ মত গ্রহণ করেছেন।

দুই. কারও কারও মতে এটি ছিল তাঁর নবুয়াত লাভের পাঁচ বছর পরের ঘটনা। নববী র. ও কুরতুবী এ বক্তব্যকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

তিন. কেউ কেউ বলেন, ইসরা ও মি'রাজ হয়েছিল নবুওতের দশম বছরের ২৭ শে রজব দিবাগত রাতে।

চার, কারও মতে, হিজরতের ছয় মাস আগে তথা নবুয়াতের দ্বাদশ বছরের রমযান মাসে।

পাঁচ. কেউ বলেন, হিজরতের এক বছর দুই মাস আগে তথা নবুয়াতের ত্রয়োদশ বছরের মুহাররম মাসে।

ছয়. কারও বক্তব্য হলো, হিজরতের এক বছর আগে তথা নবুয়াতের ত্রয়োদশ বছরের রবীউল আউয়াল মাসে।

কিন্তু উল্লিখিত ছয়টি বক্তব্যের মধ্য থেকে প্রথম তিনটি কখনোই বিশুদ্ধ হতে পারে না। কেননা, হযরত খাদীজা রা. এর ইন্তেকাল হয়েছিল নবুওতের দশম বছরের রমযান মাসে। আর এটা সর্বসম্মত যে, হযরত খাদীজা রা. এর ওফাত হয়েছিল পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার আগে। এ ব্যাপারেও কোনো মতানৈক্য নেই যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হয়েছিল ইসরার রাতে। পরবর্তী তথা শেষতিনটির কোনো একটিকে প্রাধান্য দেওয়ার যথাযথ কোনো কারণ আমরা খুঁজে পাইনি। তবে এটা তো সুনিশ্চিত যে, সূরা বনী ইসরাঈলের আগপরের আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দাঁড়িয়ে ছিলেন মক্কী জীবনের বেলাভূমিতে ঠিক তখনই সংঘটিত হয়েছিল ইসরার ঘটনা।

হাদীসের ইমামগণ তাদের গ্রন্থসমূহে সবিস্তারে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। নিম্নে আমরা অতি সংক্ষিপ্ত আকারে এ ব্যাপারে আলোচনা করছি:

ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেন, বিশুদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইসরা স্বশরীরের হয়েছিল। তিনি একটি বোরাকে আরোহণ করে জিবরাঈল

আ. এর সঙ্গে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আক্বসায় (বাইতুল মুকাদ্দাস) চলে আসেন। অতঃপর সেখানে অবতরণ করে।

বোরাকটি বাইতুল মুকাদ্দাসের দরজার কপাটের সঙ্গে বেঁধে সকল নবী ও রাসূলের ইমাম হয়ে নামাজ আদায় করেন।

এরপর সে রাতেই বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে হযরত জিবরাঈল আ. এর সঙ্গে তাকে দুনিয়ার আকাশে ওঠানো হয়। জিবরাঈল আ. দরজা খুলতে বললে আকাশের দরজা খুলে গেল। তারা সেখানে গোটা মানব জাতির পিতা হযরত আদম আ. কে দেখতে পেলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সালাম দিলেন। তিনিও সালামের উত্তর দিয়ে তাকে স্বাগত জানালেন এবং তাঁর নবুওতের স্বীকৃতি দিলেন। এরপর আল্লাহ তাআলা তাকে হযরত আদম আ. এর ডান পাশে দুনিয়ার সকল ভাগ্যবান আর বাম পাশে সকল হতভাগাকে দেখিয়ে দিলেন।

এরপর তাকে দ্বিতীয় আকাশে উঠিয়ে নেওয়া হয়। দ্বিতীয় আকাশের দরজা খুলে দেওয়া হলে তারা সেখানে ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়্যা এবং ঈসা ইবনে মারইয়াম আ. কে দেখতে পান। তিনি তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদেরকে সালাম করেন। তারাও সালামের উত্তর দিয়ে তাকে স্বাগত জানালেন এবং তাঁর নবুয়াতের স্বীকৃতি দিলেন।

এরপর তাকে তৃতীয় আকাশে ওঠানো হয় এবং সেখানে তিনি ইউসুফ আ. কে দেখতে পান। তিনি তাকে সালাম দিলেন। তিনিও সালামের উত্তর দিয়ে তাকে স্বাগত জানালেন এবং তাঁর নবুওতের স্বীকৃতি দিলেন।

অতঃপর তাকে চতুর্থ আকাশে ওঠানো হয় এবং সেখানে তিনি ইদরীস আ. কে দেখতে পান। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সালাম দেন। তিনিও সালামের উত্তর দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানান এবং তাঁর নবুয়াতের স্বীকৃতি দেন।এরপর তাকে পঞ্চম আকাশে ওঠানো হয় এবং সেখানে তিনি হারূন বিন ইমরান আ. কে দেখতে পান। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সালাম দেন। তিনিও সালামের উত্তর দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানান এবং তাঁর নবুয়াতের স্বীকৃতি দেন।

এরপর তাকে ষষ্ঠ আকাশে ওঠানো হয় এবং সেখানে তিনি মূসা বিন ইমরান আ. এর সাক্ষাৎ লাভ করেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সালাম দেন। তিনিও সালামের উত্তর দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানান এবং তার নবুওতের স্বীকৃতি দেন। কিন্তু যখন তাকে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন তখন মূসা আ. কাঁদতে শুরু করলেন। তাকে কাঁদার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তর দিলেন, আমি কাঁদছি এ কারণে যে, আমার কত পরে এক যুবককে নবী করে পাঠানো হলো অথচ আমার উম্মতের চেয়ে তাঁর উম্মত অধিকসংখ্যায় জান্নাতে প্রবেশ করবে।

অতঃপর তাকে সপ্তম আকাশে ওঠানো হয়। তিনি সেখানে ইবরাহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সালাম দেন। তিনিও সালামের উত্তর দিয়ে তাকে স্বাগত জানান এবং তাঁর নবুওতের স্বীকৃতি দেন।

এরপরে তাকে সিদরাতুল মুনতাহায় ওঠানো হয়। সেখানে তিনি তার ফলগুলো আরবের হিজর এলাকার মটকার মত এবং তার পত্র-পল্লবগুলো হাতির কানের মতো দেখতে পান। তাকে স্বর্ণের পঙ্গপাল, বর্ণাঢ্য নূর ও বিচিত্র রঙ একযোগে ঘিরে ফেলে। তখন তার রূপ-রেখা পরিবর্তন হয়ে যায়। আল্লাহর কোনো মাখলুকই তার সেই অপরূপ লাবণ্য আর সৌন্দর্যের খানিকটা বিবরণ দিতেও সক্ষম নয়। এরপর তার সামনে বাইতুল মা'মূর তুলে ধরা হল। সেখানে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা ইবাদতের জন্য প্রবেশ করে; আর একবার যে প্রবেশ করে কেয়ামতের আগ পর্যন্ত সে দ্বিতীয় বার প্রবেশের অনুমতি ও সুযোগ পায় না। এরপর তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়। তিনি তাতে অমূল্য মণি-মাণিক্যের বিভিন্ন জাল ছড়ানো ছিটানো দেখতে পান। তার মাটিতে মেশকের পুরু আস্তরণ দেখতে পান। এরপরে তাকে আরও ওপরে এমন এক স্তরে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে ভাগ্য লিপিকর কলমের ঠকঠক আওয়ায শোনা যাচ্ছিল।

এরপর তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমতাধর, গোটা জগৎ সংসারের একচ্ছত্র অধিপতি আল্লাহ তাআলার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি ধীরে ধীরে তাঁর দিকে অগ্রসর হন। একসময় তাঁর একেবারে কাছে থেকে কাছে চলে যান; যখন রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর তাঁর মাঝে ব্যবধান ছিল মাত্র দুই ধনুকের ।আল্লহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম এর ওপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করেন। এরপর তিনি ফিরতি পথ ধরেন। পথিমধ্যে হযরত মূসা আ. এর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন, আল্লাহ তাআলা আপনাকে কীসের আদেশ দিয়েছেন? তিনি বললেন পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের। তিনি বললেন, আপনার উম্মত এত ওয়াক্ত নামায আদায় করতে পারবে না। আপনি আপনার প্রভুর নিকট ফিরে যান এবং স্বীয় উম্মতের ওপর তাঁর হুকুম হালকা করার জন্য আবেদন করুন। এরপর তিনি জিবরাঈল আ. এর দিকে চোখ তুলে তাকালেন। যেন তিনি তার কাছে পরামর্শ চাইলেন। জিবরাঈল আ. তাঁকে এটাই বুঝালেন যে হাঁ, যদি চান করতে পারেন। এরপর তিনি আবার তাকে নিয়ে ঊর্ধ্বাকাশে আল্লাহর কাছে ছুটে চলেন। তিনি তখন তাঁর স্থানে অবস্থান করছিলেন (বুখারীর সূত্রে বর্ণিত)। অতঃপর আল্লাহ তাআলা দশ ওয়াক্ত নামায কমিয়ে দেন। এরপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নীচের দিকে অবতরণ করে আবার হযরত মূসা আ. এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। যাওয়ার সময় তাকে সংবাদ দিলেন। তিনি বললেন: আপনি আবার আপনার রবের নিকট ফিরে গিয়ে আরও হালকা করে দেওয়ার অনুরোধ করেন! এভাবে একদিকে তিনি একবার আল্লাহর কাছে আরেকবার মূসা আ. কাছে আসা যাওয়া করতে থাকেন। আর অপরদিকে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযও কমতে কমতে পাঁচ ওয়াক্তে এসে পৌঁছে। এরপরও যখন মূসা আ. তাকে আল্লাহর কাছে গিয়ে হালকা করার অনুরোধ করার পরামর্শ দিলেন তখন তিনি মূসা আ. কে বললেন, এ বিষয়টি নিয়ে আমার রবের কাছে যেতে এখন আমার লজ্জা করে। আমি বরং এতেই তুষ্ট রয়েছি এবং মাথা পেতে মেনে নিয়েছি। পরক্ষণেই মহাশূন্যের বিশালতায় এক গুরুগম্ভীর ঘোষণা শোনা গেল: আমি আমার ফরয নির্ধারণ করে দিলাম এবং আমার বান্দাদের থেকে হালকা করে দিলাম'।

এরপর ইবনুল কাইয়্যিম র. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আল্লাহকে দেখার ব্যাপারে যে মতানৈক্য রয়েছে তা বর্ণনা করেছেন। অতঃপর এ ব্যাপারে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া র. এর মতামত উল্লেখ করেছেন। যার সার নির্যাস হলো: রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মানবচক্ষু দিয়ে আল্লাহ তাআলাকে দেখা কোনো ভাবেই প্রমাণিত নয়। রাসূলের একজন সাহাবী থেকেও এমন বর্ণনা পাওয়া যায় না। আর ইবনে আব্বাস রা. থেকে সাধারণভাবে দেখা আর অন্তরচক্ষু দিয়ে দেখা সম্পর্কে যে দুটি বর্ণনা পাওয়া যায় তার প্রথমটি দ্বিতীয়টির বিপরীত ও বিরোধী নয়।

এরপর ইবনুল কাইয়্যিম র. লেখেন, কুরআনে কারীমের সূরা নাজম-এ উল্লিখিত আয়াত ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى)এরপরে আরও কাছে এলেন এবং ঝুঁকে গেলেন(আর ইসরার ঘটনা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসে 'নিকটবর্তী' হওয়ার কথা এক ও অভিন্ন নয়। কারণ, সূরা নাজমে উল্লিখিত আয়াতটি হযরত জিবরাঈল আ. সম্পর্কে; সেখানকার কাজের কর্তাও হলেন তিনি। হযরত আয়েশা আর ইবনে মাসউদ রা. এর বক্তব্য এটাই; ঘটনার আগ-পরের বিশ্লেষণ দ্বারা প্রমাণিত সত্যও তাই। আর ইসরা সম্পর্কিত হাদীসে যে নিকটবর্তী হওয়া ও ঝুঁকে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে নিঃসন্দেহে তা আল্লাহ তাআলা সম্পর্কেই। আর সূরা নাজমে এ সম্পর্কে কোনো আলোচনাই নেই। বরং সেখানে যে বলা হয়েছে

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (١٣) عِنْدَ

Is a meet final o

(سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (١٤)

সন্নিকটে) স্পষ্টই তিনি হযরত জিবরাঈল আ.। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তার নিজস্ব আকৃতিতে মোট দুই বার দেখেছেন: একবার পৃথিবীতে; আরেকবার সিদরাতুল মুনতাহার সন্নিকটে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায় এ সময় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বক্ষ বিদারণের ঘটনাও ঘটেছিল। যাই হোক এই গুরুত্বপূর্ণ আসমানী সফরে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেক দুর্লভ ও সৃষ্টিতত্ত্বের বিস্ময়কর নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেছেন; আজ পর্যন্ত পৃথিবীর অন্য কোনো মানুষের পক্ষে যা কোনো দিনও সম্ভব হয়ে উঠেনি।

• রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে দুধ ও শরাবের পেয়ালা পেশ করা হয়। তিনি দুটির মধ্য থেকে দুধের পেয়ালা বেছে নেন। তখন তাকে বলা হয় আপনাকে ফিতরাতের রাস্তা বলে দেওয়া হয়েছে কিংবা আপনি ফিতরাত পেয়ে গেছেন। মনে রাখবেন! আজ যদি আপনি শরাবের পেয়ালা বেছে নিতেন তবে আপনার উম্মত পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ত।

• তিনি সিদরাতুল মুনতাহার গোড়া থেকে চারটি নহর উৎসারিত হতে দেখেন। তন্মধ্যে দুটি যাহেরী (বর্হিগমনকারী) নহর আর বাকি দুটি বাতেনী (অভ্যন্তরীন)। যাহেরী নহরদুটি

হলো নীল ও ফোরাত (ইউফ্রেটিস) নদী। আর বাতেনী নহরদুটি হলো জান্নাতের দুটি নহর। নীল ও ফোরাত নদী দেখানোর মধ্যে সম্ভবত ইঙ্গিত ছিল, ভবিষ্যতে ইসলাম এদুয়ের অববাহিকায় বিস্তৃতি লাভ করবে এবং এখানে দৃঢ় আসন পেতে বসবে।

• তিনি জাহান্নামের দারোয়ান ফেরেশতা মালিক আ. কে দেখতে পান। তিনি তখন সুস্মিত ছিলেন না। আর তাঁর চেহারায়ও এক ফোঁটা হাসি কিংবা আনন্দের লক্ষণ শোভা পাচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল তিনি কখনো হাসেন না। এভাবে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাত ও জাহান্নাম দুটিকেই পরিদর্শন করলেন।

• জাহান্নামে তিনি যারা ইয়াতীমের অর্থ-সম্পদ যুলুম ও অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে তাদেরকে দেখতে পান। তাদের ঠোঁট ছিল উটের ঠোঁটের ন্যায়। আর তাদের মুখ দিয়ে প্রস্তর খণ্ডের ন্যায় জ্বলন্ত অঙ্গার ঢুকাচ্ছিল আর এগুলি তাদের পেছনের রাস্তা দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছিল।

• তিনি সেখানে সুদখোরদেরকেও দেখলেন। তাদের উদর ছিল সুবিশাল; যার কারণে তারা তাদের জায়গা থেকে নড়াচড়া করতে সক্ষম ছিল না। আর ফেরাউনের দলবলকে যখনই জাহান্নামের আগুনে ফেলার জন্য নিয়ে যাওয়া হতো তখন তারা তাদের পাশ দিয়ে যেত এবং যাওয়ার সময় তাদেরকে পায়ের নীচে ফেলে পিষে যেত।

• তিনি সেখানে ব্যভিচারীদেরকেও দেখলেন। তাদের সামনে ছিল মোটা ও সুস্বাদু গোশত আর তাদের পাশে রাখা ছিল পচা ও দুর্গন্ধময় গোশত। কিন্তু তারা সামনে রাখা সুস্বাদু ও তরতাজা গোশত ছেড়ে পাশের পচা ও গান্ধা গোশত খেয়ে যাচ্ছিল।

• তিনি সেখানে ঐ সকল নারীকে দেখলেন যারা নিজেদের স্বামীর ওপর অন্য কারও সন্তান যোগ করত। (অর্থাৎ যারা গোপনে পরপুরুষের সঙ্গে মেলা-মেশা করে গর্ভধারণ করে বাচ্চা প্রসব করত কিন্তু তার স্বামীও জানত না যে, এ বাচ্চা তার নয়)। তাদেরকে দেখলেন তাদের স্তনে বাঁকা কাঁটা ঢুকিয়ে আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থানে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

• তিনি আসা যাওয়ার মধ্যে মক্কাবাসীদের একটি বাণিজ্যিক কাফেলা দেখতে পেলেন। তাদের একটি উট হারিয়ে গিয়েছিল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সে হারানো উটের ঠিকানা বলে দিয়েছিলেন। কাফেলার সবাই তখন ঘুমিয়ে ছিল। রাসূলে

কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ঢেকে রাখা একটি পাত্র থেকে পানি পান করেছিলেন। এরপর পুনরায় পানির পাত্রটিকে ঢেকেই রেখেছিলেন। পরবর্তী সময়ে যখন ইসরা ও মি'রাজের রাত ভোর হলো তখন তাঁর দাবির সত্যায়নের ক্ষেত্রে এগুলি দলীল ও প্রমাণ স্বরূপ কাজ করেছিল।

*** ইবনে হিশাম ১/৩৯৭, ৪০২-৪০৬।

তেমনিভাবে মূসা আ. সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الكبرى

এটা এ জন্য যে, আমি আমার বিরাট নিদর্শনাবলীর কিছু তোমাকে দেখাই

[সূরা তোয়াহা: ২৩]

পাশাপাশি এই বিশেষ সফরের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যও কুরআনে কারীমে বলে দেওয়া হয়েছে ঠিক এভাবে: وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ যাতে সে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে যায় । এভাবে আল্লাহর কুদরতের অপার নিদর্শনাবলির পরিদর্শন যখন আম্বিয়ায়ে কেরামের ইলমের সঙ্গে যোগ হয় তখন আল্লাহর ওপর তাদের এমন নিশ্চিত বিশ্বাস অর্জিত হয়ে যায়, যা পৃথিবীর অন্য কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না। আর এটা তো স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার যে, কানে শোনা চোখে দেখার মতো নয়। এ কারণে আম্বিয়ায়ে কেরাম আল্লাহর রাস্তায় যতটা কুরবানী করতে পারেন; যতটা কষ্ট ও মুসিবত ভোগ করতে পারেন পৃথিবীর অন্য কোনো বনী আদম তা পারে না। আর তখন পুরো দুনিয়ার সকল শক্তি ও ক্ষমতা তাদের কাছে একটি মশার ডানার মতো দুর্বল ও তুচ্ছ মনে হয়। যে কারণে তাদের পক্ষ থেকে আসা সম্ভাব্য যুলুম ও নির্যাতন আর কষ্ট ও তাকলীফের প্রতি তারা কোনো দিনও ভ্রুক্ষেপ করেন না।

এই সফরের পরতে পরতে যে সকল হিকমত ও সুপ্ত রহস্যের ভাণ্ডার লুক্কায়িত আছে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ সেগুলো আলোচনার স্থান নয়; বরং সেগুলোর জন্য রয়েছে শরীয়তের গোপন তত্ত্বের বিভিন্ন গ্রন্থ। তবে আমাদের চোখের সামনে অনেক সাধারণ ও সরল বাস্তবতাও এমন রয়েছে, যা এই মুবারক সফরের ঝরনাধারা থেকে উৎসারিত হয়; এরপর তা বহমান প্রচণ্ড স্রোতধারায় পরিণত হয়; সমান তালে আর প্রবল বেগ ও আবেগ নিয়ে ছুটে চলে সীরাতে নববীর পুষ্পোদ্যানের দিকে। এখানে আমি সংক্ষেপে কয়েকটি বিষয় তুলে ধরছি:

বিচক্ষণ পাঠক মাত্রই লক্ষ্য করবেন আল্লাহ তাআলা কুরআনের কারীমে সূরা বনী ইসরাঈলের কেবল একটি আয়াতেই ইসরার ঘটনা উল্লেখ করেছেন। এরপর তিনি ইহুদি জাতির অন্যায় ও অপরাধ আর লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার ইতিহাস তুলে ধরেছেন। এরপর তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, নিশ্চয়ই এই কুরআন কেবল ঐ পথেরই দিশা দেয়, যা সত্য ও সঠিক। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখলে কখনো কখনো পাঠক এ আয়াতদুটির মাঝে বৈসাদৃশ্য দেখতে পাবেন। হয়তো তার মনে হবে এদুটির মাঝে কোনো মেলবন্ধন নেই। অথচ বাস্তবতা কিন্তু মোটেও এমন নয়। বরং আল্লাহ তাআলা তাঁর বর্ণনার এ নতুন ঢঙ আর রঙের মাধ্যমে ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইসরা হয়েছে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে। আর ইহুদি জাতি নিকট ভবিষ্যতে খুব তাড়াতাড়িই বিশ্ব মানবতার নেতৃত্বের আসন হারিয়ে ফেলবে। ছিটকে পড়বে সভ্যতার প্রশস্ত রাজপথ থেকে। কেননা, তারা এমন সব জঘন্য অন্যায় আর অপরাধে লিপ্ত হয়েছে, যার ফলে তারা এ আসনে অধিষ্ঠিত থাকার সব রকমের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। আর এখন সক্রিয়ভাবে আল্লাহ তাআলার নির্দেশে এ আসনে অভিষেক হবে তাঁর প্রিয় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর। দীনে ইবরাহীমের প্রধান উভয় কেন্দ্রের চাবিই আল্লাহ তাআলা এখন তাঁর হাতে তুলে দিবেন। সুতরাং এখন এক নতুন শতাব্দীর উদ্বোধন হবে। এক নতুন পৃথিবীর জন্ম হবে। যে পৃথিবীতে আধ্যাত্মিক ও আত্মিক নেতৃত্বেরও পট পরিবর্তন হবে। হাত বদল হয়ে এক জাতি থেকে তা অন্য জাতির কাছে চলে যাবে। কারণ, এর নেতৃত্ব ও কর্তত্ব ছিল এমন একটি জাতির হাতে; বিশ্বাসঘাতকতা আর খেয়ানতের দ্বারা যে জাতি তার ইতিহাস ভরে রেখেছিল। যে জাতির প্রতিটি কদমে কদমে গাদ্দারি আর ধোঁকাবাজির ছাপ ছিল। সুতরাং, এ বিশাল গুরুত্বপূর্ণ আমানত আর তাদের হাতে থাকতে পারে না; বরং তা চলে যাবে এমন এক জাতির কাছে ভালো আর কল্যাণে উথলে ওঠা সমুদ্রে যে জাতি সর্বদা সাঁতরে বেড়াচ্ছিল। যে জাতির প্রতিটি অঙ্গ থেকে খায়র আর বরকতের সুমিষ্ট রসধারা চুইয়ে পড়ছিল। যে জাতির নবীর কাছে আজও সেই কুরআনে কারীমের ওহী অবতীর্ণ হচ্ছিল যেই কুরআনে কারীম সরল ও সত্য পথের দিশারী।

কিন্তু নেতৃত্বের সিংহাসনে এখন যে জাতির অভিষেক হওয়ার কথা ছিল তাঁর রাসূল তো আজও মক্কার পাহাড়ে পাহাড়ে আর গিরি-কন্দরে পথহারা পথিকের ন্যায় মানুষের দ্বারে

দ্বারে গলা ধাক্কা খেয়ে ফিরছিলেন। সুতরাং, কীভাবে আসবে নেতৃত্বের সেই পরিবর্তন? কী হবে তার রূপরেখা? আর এটা সম্ভবও বা কীরূপে? এই প্রশ্নটি আমাদের সামনে আরেকটি বাস্তবতা মেলে ও তুলে ধরে। আর তা হলো, এতদিন ধরে এ জাতির যে যুগ চলে আসছিল এখন সে যুগের পতন ঘটতে যাচ্ছে। এ জাতির এখন খোলস বদল ঘটবে। দাওয়াতে ইসলামীর প্রথম যুগের যবনিকাপাত ঘটেছে। এখন বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে এসে হাযির হবে আরেকটি নতুন যুগ। পৃথিবীর আকাশে বাতাসে শোনা যাবে এক নয়া অধ্যায়ের আগমনী বার্তা। এটা হবে এমন এক নতুন যুগ; এমন এক নয়া অধ্যায়, যা তার আকার ও আদলে, আকৃতি ও প্রকৃতিতে পুরনো যুগ আর প্রাচীন অধ্যায়ের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে। যার স্রোতধারা ভিন্ন এক নতুন খাতে প্রবাহিত হবে। এ কারণেই তো এ সময়কার কিছু আয়াতে وَإِذَاআমরা দেখতে পাই মুশরিকদের প্রতি দ্ব্যর্থহীন ও স্পষ্ট কণ্ঠের ধমক। ইরশাদ হয়েছে:

أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا (١٦) وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ

وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (١٧)

করার ইচ্ছা করি তখন তার অবস্থাপন্ন লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করি অতঃপর তারা পাপাচারে মেতে ওঠে। তখন সে জনগোষ্ঠীর উপর আদেশ অবধারিত হয়ে যায়। অতঃপর আমি তাকে সমূলে ধ্বংস করে দিই। নূহের পর আমি অনেক উম্মতকে ধ্বংস করেছি। আপনার পালনকর্তাই বান্দাদের পাপাচারের সংবাদ জানা ও দেখার জন্যে যথেষ্ট। [সূরা বনী ইসরাঈল: ১৬-১৭]

এর পাশাপাশি এ সময়কার বহু আয়াতে মুসলমানদের জন্য তাদের সভ্যতার মৌলিক রূপ-রেখা আর মূলনীতিগুলি বাতলে দেওয়া হয়; যার ওপর গড়ে উঠতে যাচ্ছে নতুন ইসলামী সভ্যতার গগণচুম্বী ইমারত। যেন তারা আল্লাহর দুনিয়ার এমন কোনো ভূখণ্ডে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল যেখানে জীবনের সব দিক তাদের আয়ত্তাধীন রয়েছে। যেখানে তাদের সকলের মিলনে এমন একটি মেলবন্ধন কায়েম হয়েছে, যা তাকে এক নতুন সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দুর মর্যাদা দান করেছে। সুতরাং এর মধ্যেই ইঙ্গিত ছিল যে, অতি শীঘ্রই তিনি এমন একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল আর মজবুত শরণশিবির পেয়ে যাচ্ছেন, যেখানে বসে তাঁর সকল কাজ সুস্থির ও সুসম্পন্ন হবে। যা পরিণত হবে বিস্তীর্ণ দুনিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাঁর দাওয়াত ছড়িয়ে দেওয়ার প্রধান মারকায। এটাই ছিল এ মুবারক সফরের পেছনে লুক্কায়িত সুপ্ত

রহস্য! আমাদের আলোচনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলেই আমরা এখানে এ সম্পর্কে আলোচনা করাকে অগ্রাধিকার দিয়েছি।

আর এমন কিছু হিকমত আর সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের কারণেই মনে হয় ইসরা ও মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল আক্বাবার প্রথম বাইআতের সামান্য আগে কিংবা আক্বাবার দুই বাইআতের মধ্যবর্তী সময়ে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

প্রথম হিজরত: আবিসিনিয়া

হাবাশা অর্থাৎ আবিসিনিয়াতে দু'বার হিজরত হয়েছিল। প্রথমবার বারো জন পুরুষ ও চার জন মহিলার একটি ছোট দল সেখানে হিজরত করে। এটি নবুওয়াতের পঞ্চম বছরের ঘটনা। আর দ্বিতীয়বার বেশ বড়সড় একটি দল হিজরত করে। সে দলে ছিল তিরাশি জন পুরুষ এবং আঠারো-উনিশ জন মহিলা।

প্রথম দলটি আল-হাবাশাতে পৌঁছে গুজব শুনতে পায় যে, মক্কার কুরাইশরা মুসলিম হয়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা ছিল ভিন্ন। রাসূলুল্লাহ সূরা আন-নাজমের আয়াতগুলো কুরাইশদের লোকদের পড়ে শোনালে সেই আয়াতগুলো তাদেরকে ব্যাপকভাবে নাড়া দেয়। তিনি শেষ আয়াতে পৌঁছানো মাত্রই সবাই সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। এই শেষের আয়াতটি ছিল সিজদাহ'র আয়াত। সে সময় নবীজি আর মুসলিমদের সাথে সাথে কাফেররাও সিজদা দেয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, কুরাইশের লোকেরা মুসলিম হয়ে গেছে। ফলে হাবাশা থেকে মুসলিমরা মক্কায় ফিরে আসেন। এসে বুঝতে পারেন যে, এ খবর মিথ্যা।

সাহাবীদের কষ্ট আর যন্ত্রণা দেখে রাসূলুল্লাহ তাদেরকে বললেন, 'তোমরা হাবাশাতে চলে গেলেই পারো, কেননা সেখানে একজন ন্যায়পরায়ণ রাজা আছেন। তিনি কারো সাথে জুলুম করেন না।' এই রাজা হলেন আন-নাজ্জাশী, খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী। নবীজির পরামর্শ অনুযায়ী সাহাবারা দ্বিতীয়বারের মতো হাবাশায় হিজরত করেন। সবার আগে উসমান ইবন আফফান, তাঁর স্ত্রী নবীকন্যা উম্ম কুলসুমকে নিয়ে মক্কা ত্যাগ করেন। তাঁরা চলে গেলে দ্বিতীয় দলটিও মক্কা ত্যাগ করে। কিন্তু মক্কার লোকেরা তাদেরকে এত সহজে

ছেড়ে দেয়নি।আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী মুসলিমরা রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কোনোদিক দিয়েই মক্কার জন্য হুমকিস্বরূপ ছিল না। তারপরও কুরাইশরা মুসলিমদের পিছু নিলো। আন- নাজ্জাশীর কাছে দূত পাঠালো যেন সে আবিসিনিয়ার মুসলিমদেরকে তাদের হাতে হস্তান্তর করে দেয়। এই মিশনের জন্য মনোনীত করা হয় আমর ইবন আস এবং আবদুল্লাহ ইবন রাবিআ অথবা আমর ইবন রাবিয়াকে। ঘটনার কেন্দ্রীয় চরিত্র আমর ইবন আস একজন দক্ষ কূটনীতিবিদ, কুরাইশদের খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। দেশ- বিদেশের বহু লোকের সাথে তার পরিচয়, রাজাবাদশা এবং বড় বড় লোকদের সাথে তার ওঠাবসা। কূটকৌশল আর কথার লড়াইয়ে তুখোড়। তাই এ কাজের জন্য কুরাইশরা তাকেই বেছে নেয়।

আমর ইবন আস নাজ্জাশীর দরবারে গেলো। কথা ছিল, সে প্রথমে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করবে। তাদের প্রত্যেককে কিছু 'উপহার' দিয়ে-সোজা বাংলায় ঘুষ দিয়ে, তারপর নিজের প্রস্তাবনা তুলবে। তার কথার সারমর্ম হবে এরকম: মক্কার কিছু মূর্খ লোক পালিয়ে তোমাদের দেশে ঢুকেছে, আমরা চাই তোমরা তাদেরকে আমাদের হাতে তুলে দাও। অর্থাৎ তাঁর পরিকল্পনা ছিল উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে কথাবার্তা বলে আগেভাগেই সব ঠিক করে রাখবে। এরপর নাজ্জাশীর সাথে সাক্ষাতের আনুষ্ঠানিকতা সেরে নেবে। তাহলে নাজ্জাশীর সাথে যখনই সে মুসলিমদের বিষয়ে কথা তুলবে, তখন এই ঘুষখোর কর্মকর্তারা আমরের পক্ষে সায় দেবে। আমর ঠিক এই কাজটাই করলো। কয়েকজন নাজ্জাশীর সাথে দেখা করেছে। এখন নাজ্জাশী তোমাদের সাথে দেখা করতে চান। এ কথা শুনে মুসলিমরা শুরা (পরামর্শ) করে। সিদ্ধান্ত হয় যে, জাফর ইবন আবি তালিব মুসলিমদের মুখপাত্র হবেন। যা সত্যি তিনি সেটাই বলবেন। তারা নাজ্জাশীর দরবারে এলে নাজ্জাশী তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কোন ধর্মে বিশ্বাসী? তোমরা তোমাদের দেশের লোকেদের ধর্ম ত্যাগ করেছো, আবার আমাদের ধর্মও গ্রহণ করোনি। তোমরা পৃথিবীর কোনো ধর্মই মানছো না। তোমরা কারা?'

জাফর উত্তরে যা বলেন, তাঁর পুরো বক্তব্য উম্মে সালামা হাদীসে উল্লেখ আছে। আল্লাহর রাসূলের চাচাতো ভাই জাফর থেকে বর্ণিত একটি বলেন,

'হে রাজা! আমরা ছিলাম মুশরিক। মূর্তিপূজা করতাম, মৃত পশুর মাংস খেতাম, আতিথেয়তার ঘোড়াই-কেয়ার করতাম, অবৈধ কাজকে বৈধ করে নিতাম, একে- অপরের

রক্ত ঝরাতাম। আমরা ভালো-মন্দের তোয়াক্কা করতাম না। আর তাই আল্লাহ তাআলা আমাদের কাছে আমাদেরই মধ্য থেকে এমন একজন নবী প্রেরণ করেছেন, যাঁর সততা ও বিশ্বস্ততা নিয়ে কোনোকালেই আমাদের কোনো সন্দেহ ছিল না।

তিনি আমাদেরকে আদেশ করেছেন শুধুমাত্র এক আল্লাহর ইবাদত করতে, তাঁর ইবাদতে আর কাউকে শরীক না করতে। তিনি আমাদেরকে আত্মীয়ের হক আদায় করতে আদেশ করেছেন, অতিথিদের সম্মান করতে বলেছেন আর শিখিয়েছেন মহান রবের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করা ও রোজা রাখার কথা-তাঁর ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক না করার কথা। তিনি আমাদের আল্লাহর দিকে আহ্বান করেছেন। যেন আমরা আমাদের রবের একত্ববাদের ঘোষণা দিই, একমাত্র তাঁরই ইবাদত করি আর তিনি ছাড়া আর যত মূর্তি, পাথর আছে, যেগুলোকে আমাদের বাপদাদারা পূজা করেছে, সেগুলো ভেঙে ফেলি। তিনি আমাদেরকে সত্য কথা বলার আদেশ দেন, লোকের আমানত রক্ষা করতে বলেন, আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা ও আতিথেয়তার নিয়ম মেনে চলতে নির্দেশ দেন। হারাম কাজ, অবৈধ কাজ, একে-অপরের রক্তপাত করা থেকে বিরত থাকতে বলেন। তিনি আমাদেরকে সকল প্রকার খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকার শিক্ষা দেন। মিথ্যা বলা, এতিমের সম্পদে ভাগ বসানো, সতী-সাধ্বী নারীর নামে কুৎসা রটাতে নিষেধ করেন। তিনি আমাদের বলেন আল্লাহর ইবাদত করতে, ইবাদতে কাউকে অংশীদার না করতে।'

এভাবে জাফর আন-নাজ্জাশীর কাছে একেবারে অল্প কথায় ইসলামের সারসংক্ষেপ তুলে ধরেন। জাফর ইসলামের এমন সব সুন্দর শিক্ষার কথা উল্লেখ করেছেন, যা সৎ গুণসম্পন্ন যেকোনো লোক ভালো বলে মানতে বাধ্য। তিনি নাজ্জাশীর কাছে এটা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন যে, ইসলাম কোনো খারাপ কাজের নির্দেশ দেয় না, কোনো অনৈতিক কাজকে প্রশ্রয় দেয় না। বরং এর প্রতিটি হুকুম-আহকাম, প্রতিটি শিক্ষাই কল্যাণকর। এর মাঝেই তিনি ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের কথাও উল্লেখ করেন 'আর তাই আমরা তাঁর ওপর ঈমান এনেছি, তাঁকে বিশ্বাস করেছি, তিনি আল্লাহর থেকে যা কিছু দিকনির্দেশনা এনেছেন, সেগুলোকে মেনে চলেছি। আমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করি, কাউকে তাঁর সাথে শরীক করি না। আল্লাহ তাআলা যেগুলো হারাম করেছেন, আমরাও সেগুলোকে হারাম হিসেবে মানি আর তিনি যেগুলোর অনুমতি দিয়েছেন, আমরাও সেগুলোকে হালাল হিসেবে গ্রহণ করে মিই। কিন্তু আমাদের দেশের লোকেরা আমাদের সাথে সীমালঙ্ঘন করে। আমাদের ওপর

অত্যাচার করে। তারা চায় আমাদেরকে ঈমান থেকে বিচ্যুত করতে, আমাদেরকে জাহেলি যুগের মূর্তিপূজায় ফিরিয়ে নিতে। তারা চায় আমাদের দিয়ে সেই সব হীন কাজ করাতে যেগুলোকে আমরা আগে সঠিক মনে করতাম। যখন তারা আমাদের ওপর জোর-জুলুম করতে লাগলো, দ্বীন পালনে একের পর এক বাধার সৃষ্টি করতে শুরু করলো, তখন আমরা আমাদের দেশ ত্যাগ করলাম, অন্য সবার ওপর আপনাকে পছন্দ করলাম। আমাদের আশা ছিল যে আমরা আপনার আতিথেয়তা পাবো, আর আমরা আশা রাখি আপনার এ রাজ্যে কেউ আমাদের ক্ষতি করতে আসবে না।

জুলুম-নির্যাতনের কথায় নাজ্জাশীর মন নরম হয়ে পড়ে। তাঁর মনে পড়ে যায় ঈসা ও তাঁর অনুসারীদের সাথেও কী পরিমাণ অন্যায়-অত্যাচার করা হয়েছিল। তিনি নিজেও খুব ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। জাফরের বক্তব্যের সমাপ্তিটা ছিল সবচেয়ে চমৎকার এবং উপযুক্ত। তাঁর সব কথা শেষে নাজ্জাশী প্রশ্ন করলেন, 'মুহাম্মাদ তোমাদের কাছে যা এনেছেন, তাঁর কিছু কি তোমরা এনেছো?' তিনি কুরআনের আয়াত শুনতে চাচ্ছিলেন। জাফর ইবন আবি তালিব কুরআনের কয়েকটি আয়াত তাঁকে পড়ে শোনালেন। তিনি কুরআন থেকে যেকোনো অংশই তিলাওয়াত করতে পারতেন, কিন্তু বিচক্ষণ জাফর সূরা মারইয়ামের থেকে পড়তে শুরু করলেন, তিলাওয়াত করলেন প্রথম আটাশটি আয়াত।

"কাফ-হা-ইয়া-আইন-সাদ। এটা আপনার রবের অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর বান্দা যাকারিয়্যার প্রতি। যখন সে তাঁর রবকে আহ্বান করেছিল নিভৃতে, সে বলেছিল, হে আমার রব। আমার হাড় দুর্বল হয়ে পড়েছে, বার্ধক্যে মাথার চুলগুলো সাদা হয়ে গেছে। হে আমার রব। আমি তো কখনো তোমাকে ডেকে ব্যর্থ হই নি। আমি আমার স্বগোত্রের দ্বীনের ব্যাপারে আশঙ্কা করছি, (অপরদিকে) আমার স্ত্রী বন্ধ্যা; কাজেই আপনি আপনার পক্ষ থেকে আমাকে এক জন উত্তরাধিকারি দান করুন।" (সূরা মারইয়াম, ১৯: ১-৬)

নাজ্জাশী জাফরের তিলাওয়াত শুনে কাঁদতে লাগলেন, কাঁদতে কাঁদতে তাঁর দাঁড়ি কান্নায় ভিজে গেল। আর তাঁর সব সভাসদরাও এতো করে কাঁদলো যে তাদের বাইবেলগুলো ভিজে গেলো। সেটি ছিল এক আবেগঘন, হৃদয়গ্রাহী কিরাত।আন-নাজ্জাশী কুরাইশদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন, মুসলিমদের হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানালেন। কুরাইশ প্রতিনিধিরা চলে গেলো। যাওয়ার সময় আমর ইবন আস হুমকি দিয়ে গেলো যে করেই

হোক মুসলিমদের সে মক্কায় ফিরিয়ে আনবে, তাদেরকে শেষ করে ছাড়বে। আমর ইবন আসের সঙ্গী তাকে বললো, 'এমন করে বোলো না, এরা তো তোমাদেরই আত্মীয়। নাজ্জাশী যদি এদেরকে ফিরিয়ে দিতে রাজি না-ই হয়, তাহলে বাড়াবাড়ি না করে দেশে ফিরে যাও।' কিন্তু আমর ইবন আস বললো, 'না, আমি কালই আবার আসবো, রাজাকে শুনিয়ে যাবো যে, মুসলিমরা ঈসাকে দাস বলে।'

আমর ইবন আস পরদিন আবার এসে নাজ্জাশীকে বললো, মুসলিমরা ঈসাকে আল্লাহর পুত্র বলে স্বীকার করে না, তাঁকে নিছক দাস বলে বিশ্বাস করে। আমর ইবন আস ছিল সে সময় একজন মুশরিক, নবী ঈসাকে নিয়ে আদতে তার এত মাথাব্যথার কিছু নেই। তিনি খোদা হন বা নবী হন বা নিছক একজন দাসই হন-তাতে তার কিছুই আসে যায় না। কিন্তু সে এই বিষয়টাকে পুঁজি করে নিজের ফায়দা হাসিল করতে চাচ্ছিল। তাই সে ফিতনা তৈরি করছিল। আন-নাজ্জাশী এ কথা শুনে কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি ছিলেন ধার্মিক। তাঁর রাজ্যে এসব নিয়ে কোনো ফিতনা হোক সেটা তাঁর কাম্য ছিল না। তাই তিনি মুসলিমদের আবার ডাকলেন।

মুসলিমরা আগের সিদ্ধান্তেই অটল। তারা পূর্বের সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন, যা-ই হোক না কেন, তারা সত্য কথাই বলবেন। এবারও আগের দিনের মত জাফর ইবন আবি তালিবই তাদের মুখপাত্র। দরবারে উপস্থিত হলে আন-নাজ্জাশী জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, ঈসা সম্পর্কে তোমাদের বক্তব্য কী?'

তিনি আল্লাহর দাস, আল্লাহর নবী, আল্লাহর কালাম, জন্ম নিয়েছিলেন পবিত্র ও কুমারী নারী মারইয়ামের গর্ভে।'

- তাঁর সম্পর্কে তোমাদের বক্তব্য আর আমার বক্তব্যের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

এই কথা শোনার সাথে সাথে বিশপেরা উত্তেজিত হয়ে পড়লো। কীভাবে আন-নাজ্জাশী এই ধরনের কথা বলতে পারলেন। আবিসিনিয়ার খ্রিস্টানরা ছিল অর্থোডক্স খ্রিস্টান। তারা ঈসাকে ঈশ্বর মনে করতো, তাই তারা ঈসার গুঞ্জ ব্যাপারে মুসলিমদের বিশ্বাস শুনে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট, মুসলিমরা যে তাঁকে আল্লাহর দাস মনে করে এটা তারা মানতে পারলো না।

আন-নাজ্জাশী উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, 'তোমরা যা খুশি বলতে পারো। আমি এই মানুষগুলোকে আমার রাজ্যে স্বাধীন ঘোষণা করলাম। '

মক্কার প্রতিনিধিরা আবিসিনিয়ায় এলে আন-নাজ্জাশী প্রথমেই তাদের জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তোমরা আমার জন্য তোমাদের দেশ থেকে কী এনেছো?' আমর ইবনআস বলেছিলেন, 'আমি আপনার জন্য চামড়ার তৈরি কিছু জিনিস এনেছি।' চামড়ার জিনিস ছিল আন-নাজ্জাশীর খুব পছন্দের। কিন্তু সেদিন, উম্মে সালামার ভাষায়, 'সেদিন আমর ইবন আস ও তার সঙ্গীরা অপমানিত হলো, কেননা আন-নাজ্জাশী তাদের বের করে দেন, এমনকি তাদের দেওয়া উপহারগুলিও ফেরত দেন।' আমর ইবন আসের সাথে আন-নাজ্জাশীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল, কিন্তু আদর্শের প্রশ্নে তিনি বন্ধুত্বকেও প্রশ্রয় দেননি, বরং সত্যের পক্ষেই দাঁড়িয়েছিল।

আকাবার বাইয়াত

বাইয়াতের প্রথম শপথ

সেই ছয়জন পুণ্যবান লোক ইসলাম গ্রহণ করলো এবং তারা রাসূলুল্লাহকে বললো, 'আমরা দেশে ফিরে গিয়ে আমাদের লোকদের ইসলামের পথে আসার জন্য আহ্বান করবো।' মদীনায় ফিরে যাওয়ার আগে তারা রাসূলুল্লাহর সাথে পরের বছর হাজ্জের মৌসুমে দেখা করার কথা দিল। বছর ঘুরে আবার ফিরে এল হাজ্জের মৌসুম। এবার ছয়জনের পরিবর্তে এল বারোজন, ছয়জন ছিল আগের বছরের আর বাকি ছয়জন নতুন। প্রথম বছরে ইসলাম গ্রহণকারী ছয়জন ছিলেন আল খাযরাজ গোত্রের; অন্য আরেকটি বর্ণনায় বলা হয়েছে যে পাঁচজন ছিলেন আল খাযরাজ গোত্রের আর বাকি একজন এসেছিলেন আল আওস থেকে। দ্বিতীয় বছরে আল খাযরাজ থেকে ছিলেন দশজন এবং আল আওস থেকে দুইজন। তাঁরা রাসূলুল্লাহর কাছে এসে বাইয়াত দিলেন। বাইয়াতের ভাষ্য ছিল এমন:

'আকাবার প্রথম বৈঠকের রাতে রাসূলুল্লাহর কাছে এই মর্মে বাইয়াত দেওয়া হয় যে, আমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবো না। আমরা ব্যভিচারের ধারে কাছে যাবো

না, সন্তান হত্যা করবো না, কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেব না এবং ভালো কাজে তাঁর বিরোধিতা করবো না। তিনি আমাদেরকে বলেছেন, যদি তোমরা এগুলো মেনে চলতে পার তাহলে জান্নাতে যেতে পারবে। আর যদি কোনো পাপ করে ফেল এবং সেই পাপের শাস্তি যদি এই দুনিয়াতেই দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সেই পাপ মাফ করে দেওয়া হবে। কিন্তু যদি দুনিয়াতে পাপের শাস্তি না দেওয়া হয় তাহলে আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে ওই পাপের জন্য শেষ বিচারের দিন শাস্তি দিতেও পারেন আবার ক্ষমাও করে দিতে পারেন।'

সাধারণত, মহিলারা এই মর্মে রাসূলুল্লাহর কাছে বাইয়াত করতেন। এই বাইয়াতে জিহাদের ব্যাপারে অঙ্গীকার ছিল না বলেই একে বাইয়াতুন নিসা বা মহিলাদের বাইয়াত বলা হয়।

এখানে একটি ফিকহী বিষয় লক্ষণীয়: এই বাইয়াতে যেসব গুনাহ থেকে বিরত থাকার কথা বলা হয়েছে সেগুলো সবই হলো কবীরা গুনাহ ব্যভিচার, সন্তানদের মেরে ফেলা, কারো নামে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া, ভালো কাজে আল্লাহর অবাধ্য হওয়া। এরপর রাসূলুল্লাহ বলেছেন যে এই দুনিয়াতে থাকতেই যদি গুনাহের শাস্তি দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে গুনাহকারীকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে আর যদি বেঁচে থাকতে শাস্তি দেওয়া না হয় তাহলে গুনাহকারীকে শেষ বিচারের দিন ক্ষমা করে দেওয়া হবে নাকি শাস্তি দেওয়া হবে তা আল্লাহ তাআলা নির্ধারণ করবেন।

রাসূলুল্লাহ মদীনার মুসলিমদেরকে ইসলাম শিক্ষা দেওয়ার জন্য মুসআব ইবন উমাইরকে মনোনীত করেন। তিনি ছিলেন একজন প্রতিনিধি, শিক্ষক ও আলিম। মুসআব ছিলেন কুরাইশের এক ধনী পরিবারের সন্তান। মুসলিম হওয়ার পূর্বে তিনি ছিলেন মক্কার সবচেয়ে উচ্ছন্নে যাওয়া যুবক, তাঁর পরনে থাকতো সবচেয়ে দামি সব জামাকাপড়, শরীরে থাকতো নিত্যনতুন সুগন্ধির ঘ্রাণ। তাঁর মা ছিলেন অনেক ধনী। মুসআব ছাড়া তার আর কোনো সন্তান ছিল না, তাই একমাত্র ছেলেকে অনেক আদর করতেন। কিন্তু যখন মুসআব ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন তাঁর মা তাঁকে ত্যাগ করলেন, তাঁর বিরুদ্ধে চলে গেলেন। যে মুসআব শৈশব-কৈশোর-যৌবন কাটিয়েছিলেন প্রাচুর্যের মধ্যে, তিনিই হঠাৎ সহায়সম্বলহীন এক যুবকে পরিণত হলেন, জীবন হয়ে যায় রুক্ষ, কঠিন। মুসআব যখন উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন, তাঁকে দাফন করার জন্য পর্যাপ্ত টাকাপয়সাও তখন ছিল না। তাঁর গায়ে যে জামাটি

ছিল তা দিয়ে তাঁকে ঠিকমত ঢেকে রাখা যাচ্ছিল না। উপস্থিত সাহাবীরা সেই দিনের কথা বর্ণনা দিয়েছেন, 'আমরা যখন তাঁর মুখ ঢাকার চেষ্টা করছিলাম তখন তাঁর পা বের হয়ে যাচ্ছিল, আবার পা ঢাকতে গেলে মুখ দেখা যেতো। আমরা রাসূলুল্লাহর কাছে গিয়ে বললাম, এখন আমরা কী করবো?' রাসূলুল্লাহ তখন তাদেরকে কাপড় দিয়ে মুসআবের মুখ আর কিছু ঘাস দিয়ে পা ঢেকে দিতে বললেন।

মুসআব ইবন উমাইর ছিলেন রাসূলুল্লাহর মদীনার প্রতিনিধি, তাঁর উপর অর্পিত এই দায়িত্ব ছিল বেশ কঠিন। তিনি মদীনায় থাকার জন্য মক্কা ত্যাগ করলেন। আল আওস ও খাযরাজের মধ্যে শত্রুতা থাকায় তিনি সালাতের ইমামতি করতেন, কারণ দুই গোত্রের কেউই অন্য গোত্রের ইমামের পেছনে সালাত আদায় করতে চাইত না। মুসআব মদীনায় আসআদ ইবন যুরারার সাথে থাকতেন। তাঁরা সেখানকার এক বাগানে অন্যান্য মুসলিমদের সাথে দেখা করতেন। তাঁরা সেখানে মুসলিমদের ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা দিতেন। মুসআব তাদের সাথে নিয়মিত হালাকা করতেন। তাঁরা বসতেন মদীনার আওস-অধীনস্থ একটি এলাকায়। তখন পর্যন্ত মুসলিমদের অধিকাংশই ছিল খাযরাজ গোত্রের, আওসের অল্পসংখ্যক লোকই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। মুসআব আওস গোত্রকে ইসলামের দিকে আগ্রহী করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এ কারণে তিনি আল আওসের এলাকায় গেলেন।

আওসের নেতাদের বিষয়টি পছন্দ হলো না। আওসের নেতা ছিলেন সাদ ইবন মুয়ায ও উসাইদ ইবন খুযাইর। মুসআব ও আসআদ ইবন যুরারাকে আওসের এলাকায় একসাথে দেখতে পেয়ে সাদ ইবন মুয়ায খুব বিরক্ত হয়ে তার বন্ধু উসাইদকে বললেন, 'তুমি ওই দুই লোকের কাছে গিয়ে বলো যে, আমরা চাইনা তাঁরা এখানে থেকে দুর্বল ও বোকা লোকদের বিভ্রান্ত করুক। আসআদ যদি আমার আত্মীয় না হতো তবে আমি নিজে গিয়েই এই কথা বলতাম।' আসআদের সম্মানে, নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরে সাদ চুপ করে ছিলেন, নিজে না গিয়ে উসাইদকে পাঠালেন।

অন্যদিকে, আসআদ খাযরাজ গোত্রের হলেও তিনি ছিলেন আওসের নেতার মামাতো ভাই, সে সুবাদে তিনিই ছিলেন মুসআবকে মেহমানদারি করার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি। সাদের বিরক্তি দেখে উসাইদ ইবন খুযাইর বর্শা হাতে নিয়ে মুসআব ও আসআদের সাথে কথা বলার জন্য তাদের দিকে অগ্রসর হলেন। আসআদ মুসআবকে জানিয়ে দিলেন, 'যে লোকটা

আসছে সে হলো উসাইদ, সে তার লোকদের নেতা। তাঁকে যতসম্ভব ইসলামের দিকে টানার চেষ্টা করো, সে যদি মুসলিম হয় তাহলে অনেকেই তার দেখাদেখি মুসলিম হবে।' মুসআব ইবন উমাইর বললেন, 'সে শুনতে চাইলে আমি অবশ্যই তাঁকে বুঝানোর চেষ্টা করবো।'

ইবন খুযাইর তাদের সামনে দাঁড়িয়ে খুব রুক্ষভাবে কথা বলতে শুরু করলেন, 'দেখ, আমরা তোমাদের এই এলাকার আশেপাশে দেখতে চাই না। আমরা চাই না তোমরা এখানকার দুর্বল ও অজ্ঞ লোকদের বিভ্রান্ত কর। নিজেদের জীবনের মায়া থাকে তো এখান থেকে চলে যাও, না হলে এই হলো আমার বর্শা।' যখন তিনি তাদেরকে এভাবে হুমকি দিচ্ছিলেন, তখন হালাকায় অংশগ্রহণকারী নও মুসলিমদের একজন বলে উঠল, 'ওরা নয়, বরং তুমিই আমাদেরকে বিভ্রান্ত করছ...' এই বলে সে উসাইদের সাথে তর্ক শুরু করে দিল।

পরিস্থিতি সামাল দিতে মুসআব শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'আমরা যা নিয়ে কথা বলছিলাম তা কি আপনি একটু শুনে দেখবেন? যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে আপনি তা গ্রহণ করবেন আর ভালো না লাগলে অগ্রাহ্য করবেন।' উসাইদ বললেন, 'ঠিক আছে শুনবো।' তিনি সেখানে বসলেন। মুসআব তাঁকে কুরআনের কিছু আয়াত পাঠ করে শোনালেন, ইসলামের দাওয়াত দিলেন, ইসলামের ব্যাপারে কথা বললেন। মুসআবের কথায় উসাইদের কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা বর্ণনা করেছেন আসআদ, 'উসাইদ মুখে কিছুই বললো না, তাঁর চেহারাই বলে দিচ্ছিল ইসলাম তাঁর হৃদয় দখল করে নিয়েছে, তাঁর মুখে ছিল প্রছন্ন এক আভা শান্ত, প্রসন্ন একটা ছাপ।'

মুসআবের বক্তব্য হলে উসাইদ তাঁকে বললেন, 'এ দ্বীনে প্রবেশ করতে হলে কী করতে হবে?' মুসআব তাঁকে বললেন, 'আপনি পবিত্র হয়ে আসুন, তারপর সালাত আদায় করুন।' পবিত্র হয়ে উসাইদ সালাত আদায় করলেন, এরপর মুসআবকে বললেন, 'আমি আপনার কাছে এমন এক ব্যক্তিকে পাঠাচ্ছি যিনি মুসলিম হলে তাঁর দলের সব লোকেরাও ইসলাম গ্রহণ করে ফেলবে।' এই বলে উসাইদ গেলেন সাদ ইবন মুয়াযের কাছে। উসাইদকে ফিরে আসতে দেখে সাদ বললেন, 'আল্লাহর কসম! যে চেহারা নিয়ে সে গিয়েছিল, ভিন্ন

চেহারা নিয়ে ফিরে এসেছে।' এটিকে বলে ফিরাসা, ফিরাসা হলো কারো চেহারা দেখে তাঁর সম্পর্কে বলে দেওয়া, আরবদের মধ্যে এই রীতি ছিল।

সাদ ইবন মুয়ায জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে?' উসাইদ বললেন, 'সব ঠিকঠাক আছে, তুমি চিন্তা কোরো না। আসলে একটু সমস্যা হয়েছিল, বনু হারিস (আল খাযরাজের একটি শাখা) যখন জানতে পারল যে আসআদ তোমার ভাই, তখন তারা শত্রুতাবশত তাকে খুন করতে চেয়েছিল।' পুরো ঘটনাটি উসাইদ বানিয়ে বললেন সাদ ইবন মুয়াযকে মুসআব ইবন উমাইরের কাছে পাঠানোর জন্য। উসাইদের মুখে এই কাহিনি কথা শুনে সাদ খুব রেগে গেলেন। তিনি বললেন, 'কী। তারা আমার ভাইকে খুন করতে চায়!' তিনি বর্শা নিয়ে ভাই আসআদকে রক্ষা করার জন্য চলে গেলেন এবং যাওয়ার সময় উসাইদকে বলে গেলেন, 'ধুর! তুমি আমার কোনো কাজেই আসলে না।' সাদকে আসতে দেখে আসআদ বললেন, 'মুসআব, যাকে আসতে দেখছ সে আওসের নেতা। তাকেও যতোটা পারো ইসলামের দিকে টানার চেষ্টা করো।' এদিকে সাদ ইবন মুয়ায তাদের দেখেই বুঝতে পারলেন যে উসাইদ ইচ্ছে করে গল্প ফেঁদেছেন, কারণ আসআদ বা মুসআব কাউকেই ভীতসন্ত্রস্ত দেখাচ্ছিল না।

আসআদকে উদ্দেশ্য করে সাদ ইবন মুয়ায বললেন, 'আসআদা তুমি কেন আমার সাথে এরকম করছ? এই লোককে কেন আমার এলাকায় নিয়ে এসেছ? তুমি আমার সাথে তোমার সম্পর্কের সুযোগ নিয়ে এসব করছো, তুমি কি এই অশিক্ষিত, সহজসরল, অসহায় লোকগুলোকে বিপথে নিয়ে যেতে চাও?'

মুসআব তখন বললেন, 'কিছু মনে না করলে আমি কিছু কথা বলতে চাই, আপনি কি তা শুনবেন? যদি আপনার ভাল লাগে তাহলে তা গ্রহণ করবেন আর ভাল না লাগলে মানবেন না।' সাদ ইবন মুয়ায এ কথায় রাজি হলেন এবং তাঁর কথা শোনার জন্য বসলেন। এখানে একটি ব্যাপার লক্ষ্যণীয় যে, মদীনাবাসীরা বেশ খোলা মনের ছিল, মক্কার লোকরা যেমন শত্রুভাবাপন্ন ছিল, মদীনাবাসীরা তেমন ছিল না। তারা অন্যের কথা শোনার ব্যাপারে আগ্রহী ছিল। তাই মুসআবের কথা শোনার ব্যাপারে সাদ ইবন মুয়ায রাজি হলেন। মুসআব তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন, সাদ ইবন মুয়ায ইসলাম গ্রহণ করলেন, ইসলাম লাভ করলো দূর্গের চাবি।

মুসলিম হওয়ার পর সাদ ইবন মুয়ায প্রথমে তাঁর লোকদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার ব্যাপারে তোমাদের ধারণা কী?' তারা বললো, 'আপনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী এবং আমাদের নেতা।' তারপর সাদ ইবন মুয়ায বললেন, 'তাহলে তোমরা মুসলিম না হওয়া পর্যন্ত কেউ আমার সাথে কথা বলবে না আর আমিও তোমাদের সাথে কথা বলবো না।'

এই কথার পর সন্ধ্যার মধ্যেই বনু আসআদ গোত্রের প্রতিটি ঘরের মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে, আল আওসের এক বড় অংশের মাঝে ইসলামের আলো প্রবেশ করে।

আকাবার দ্বিতীয় শফথ

ইসলামের প্রথম বায়াত অনুষ্ঠিত হয়েছিল আল-আকাবায়, এই ঘটনা বায়াত আল উলা নামে পরিচিত। মদীনায় ইসলাম প্রচারে মুসআব ইবন উমায়ের অসামান্য অবদান রেখেছিলেন। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে মানুষ সেখানে ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে এবং পরবর্তী হাজ্জ মৌসুম চলে আসার আগে এমন অবস্থা হয় যে মদীনার প্রতিটি বাড়িতে একজন হলেও ইসলাম গ্রহণ করে। হাজ্জের সময় রাসূলুল্লাহর সাথে মদীনার নও-মুসলিমদের সাক্ষাতের নির্ধারিত সময় ঘনিয়ে আসলো। সত্তরের অধিক মুসলিম নিজ গোত্রের লোকেদের সাথে হাজ্জের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। মদীনা থেকে আসা প্রতিনিধি দলটির সাথে মুসলিম ও অমুসলিম উভয়েই ছিল। যদিও গোপন বৈঠকটি ছিল শুধুমাত্র মুহাম্মাদ ও মুসলিমদের মধ্যে, কিন্তু তাঁরা মদীনা থেকে যাত্রা করার সময় তাঁরা তাদের গোত্রের অমুসলিম সদস্যদের সাথে একসাথে এসেছেন। রাসূলুল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতে আসে সত্তরের অধিক মুসলিম পুরুষ ও দুইজন মুসলিম নারী।কা'ব ইবন মালিক ও বারা ইবন মা'রুরের ঘটনা

সত্তর জন মুসলিমদের মধ্যে একজন ছিলেন কা'ব ইবন মালিক, তিনি তাদের হাজ্জ যাত্রার একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। 50

'আমরা সেবার হাজ্জ করতে মক্কায় যাই, আমাদের মধ্যে কিছু লোক ছিল মুসলিম আর কিছু লোক অমুসলিম। আমাদের মুসলিম দলের নেতা ছিলেন বারা ইবন মা'রুর, তিনি ছিলেন একজন নেতৃস্থানীয়, প্রবীণ ব্যক্তিত্ব। তিনি আমাদের কাছে, অর্থাৎ মুসলিমদের কাছে এসে বললেন, আমি একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এ ব্যাপারে তোমাদের মতামত জানতে চাই, তোমরা আমার সাথে একমত হবে কিনা আমি জানি না। আমার মতামত হলো, সালাতের সময় কাবাঘরকে পেছনে রাখতে আমি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি না।

বারা ইবন মা'রুর কাবাকে পেছনে রেখে সালাত আদায় করতে অস্বস্তিবোধ করছিলেন। সে সময় কা'বা মুসলিমদের কিবলা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়নি। মদীনায় বসে জেরুসালেমের আল-আকসা মসজিদের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতে গেলে কাবাঘর মুসলিমদের পেছনে পড়ে যেতো। এ কারণে বারা ইবন মা'রুরের মধ্যে অস্বস্তি কাজ করছিল।

কা'ব তাঁকে বললেন, 'আল্লাহর রাসূল জেরুসালেমের দিকে মুখ করেই সালাত আদায় করেন, সুতরাং আমরা তাঁর বিপরীত কাজ করবো না।' বারা বললেন, "আমি কাবাঘরের দিকে মুখ করেই সালাত আদায় করবো।' এরপর থেকে তিনি কাবাঘরের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতে শুরু করেন। এরপর তাঁরা মক্কায় এসে পৌঁছালেন। বারা তাঁর ভাতিজা কা'ব ইবন মালিককে বললেন, 'ভাতিজা, আমাকে রাসূলুল্লাহর কাছে নিয়ে চলো। সফরে কিবলা পরিবর্তন করা ঠিক হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহকে জিজ্ঞেস করবো। তোমরা তো আমার কাজকে অনুমোদন দিলে না, তাই আমার খটকা হচ্ছে। চলো, রাসূলুল্লাহকে জিজ্ঞেস করে দেখি আমার কাজটা ঠিক হয়েছে কিনা।' কা'ব মক্কার এক লোকের কাছে রাসূলুল্লাহ কোথায় আছেন জানতে চাইলেন, সে বললো,

- আপনারা কি রাসূলুল্লাহকে চেনেন? কখনো তাঁকে দেখেছেন?

- না, তাঁকে আমরা চিনি না।

- আচ্ছা, তাঁর চাচা আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিবকে চেনেন?

- হ্যাঁ তাঁকে আমরা চিনি।

তাহলে আপনারা মসজিদুল হারামে প্রবেশ করলে দেখতে পাবেন যে, আব্বাসের সাথে একজন লোক বসে আছেন। তিনিই রাসূলুল্লাহ।'আমরা মসজিদে প্রবেশ করে দেখলাম আব্বাস বসে আছেন, তাঁর সাথে রাসূলুল্লাহও * বসে আছেন। আমরা সালাম দিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে বসলাম। আল্লাহর রাসূল আমাদেরকে দেখে আব্বাসকে তাঁর কুনিয়া নামে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন,

- আবুল ফাদল, আপনি কি এ দু'জন মানুষকে চেনেন?

- হ্যাঁ চিনি, ইনি হলেন বারা ইবন মা'রুর, তাঁর গোত্রের নেতা আর ইনি হচ্ছেন কা'ব ইবন মালিক।

- কবি কা'ব নাকি?'

কা'ব ইবন মালিক ছিলেন একজন কবি। এজন্য আব্বাস যখন কা'বকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন ইনিই কি কবি কা'ব কিনা।

এই ঘটনায় কা'ব তাঁর অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন এই বলে, 'রাসূলুল্লাহর এই কথাটি আমি কখনো ভুলবো না।'

কা'ব ইবন মালিকের কাছে এটা বিশাল ব্যাপার ছিল যে রাসূলুল্লাহ তাঁকে আগে থেকে চিনতেন। রাসূলুল্লাহর সাথে এটি ছিল তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ, যে সাক্ষাতের এই মুহূর্তের জন্য এতদিন অপেক্ষা করে আসছিলেন, আর সেই সাক্ষাতেই আবিষ্কার করলেন তাঁর নেতা, তাঁর এত প্রিয় এই মানুষটি তাঁকে আগে থেকেই চেনেন। এ কথা ভেবেই কা'ব ইবন মালিক গর্ববোধ করছিলেন এবং খুব খুশি হয়েছিলেন। তিনি আরো আনন্দিত হয়েছিলেন এই ভেবে যে রাসূলুল্লাহ হয়তো তাঁর কিছু কীর্তির কথাও শুনে থাকবেন।

এরপর বারা ইবন মা'রুর তাঁর প্রশ্ন উত্থাপন করলেন, 'হে আল্লাহর নবী! আল্লাহ তাআলা আমাকে ইসলামের পথে হিদায়াত করেছেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমি যখন এই সফরে বের হই, তখন আমার মনে হলো, কাবাঘরকে পেছনে রাখা সমীচীন হবে না। তাই আমি কাবার দিকে মুখ করেই সালাত আদায় করেছি। কিন্তু আমার সাথীরা আমার বিরোধিতা করায় আমার মনে খটকা সৃষ্টি হয়েছে, যা করছি ঠিক করছি তো? এ বিষয়ে আপনার মতামত কী?' মুহাম্মাদ বললেন, "ভোমার আগে যে কিবলা ছিল তা বরারবই আদায় করা উচিত।" এরপর থেকে বারা তাঁর কিবলা পরিবর্তন করেন। যেহেতু রাসূলুল্লাহ তখন মক্কায় ছিলেন তাঁকে সালাত আদায়ের সময় কাবাকে পেছনে রাখতে হতো না। কাবাঘরকে সামনে রেখে তিনি জেরুসালেমের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতে পারতেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো হিজরতের পর রাসূলুল্লাহরও ঠিক একই অনুভূতি হয়েছিল, যা হয়েছিল বারা ইবন মা'রুরের, তিনিও কাবাকে পেছনে রেখে সালাত আদায় করতে তখন অস্বস্তিবোধ করেছিলেন, এটা ঘটেছিল মদীনায়।

কা'ব বর্ণনা করেন, 'এরপর আমরা রাসূলুল্লাহর সাথে ওয়াদাবদ্ধ হলাম যে, আমরা আকাবায় আইয়ামে তাশরিফের মাঝামাঝি সময়ে তাঁর সাথে সাক্ষাত করবো। এরপর আমরা হাজ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। বিষয়টি আমরা গোপন রাখলাম, রাসূলুল্লাহর * সাথে আমাদের গোপন বৈঠক সম্পর্কে আমাদের গোত্রের মুশরিক সাথীরা কিছুই জানতো না। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন হারাম আবু জাবির, তিনি ছিলেন আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ ও গোত্রনেতাদের একজন। আমরা তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, আবু জাবির! আপনি আমাদের অন্যতম নেতা এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। আপনি যে ধর্ম অনুসরণ করছেন তার কারণে আপনি আখিরাতে জাহান্নামের জ্বালানি হবেন এটা আমরা চাই না।' আবু জাবির তখন ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁকে আসন্ন গোপন বৈঠক সম্পর্কে জানানো হয়। তিনি সেই শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ তাঁকে প্রতিনিধি হিসেবেও মনোনীত করেছিলেন। ইসলামে তাঁর বয়স ছিল অল্প, কিন্তু তাঁর বয়স নেতৃত্বের যোগ্যতার কারণে তিনি বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব পেয়ে যান।

অবশেষে সেই নির্ধারিত রাত এল। মুসলিমরা একজন-দুইজনের ছোট ছোট দলে আকাবায় যেতে শুরু করেন। তাঁরা চাচ্ছিলেন না কেউ তাদের দেখে ফেলুক। একসাথে সত্তর জন

লোকের একটি দল রাসূলুল্লাহর সাথে দেখা করতে গেলে বিষয়টি জানাজানি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এভাবে তাঁরা সবাই আকাবায় মিলিত হলেন।

বাইয়াতের রাত

রাসূলুল্লাহ ছিলেন মক্কা থেকে আসা একমাত্র মুসলিম, তাঁর সাথে ছিলেন তাঁর চাচা আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব। আব্বাস তখনো মুশরিক ছিলেন, এই বৈঠকে তিনিই ছিলেন একমাত্র অমুসলিম। তিনিই প্রথমে কথা শুরু করেন। তিনি বললেন,

'মুহাম্মাদ আমাদের মাঝে কেমন সম্মানের অধিকারী তা আপনাদের নিশ্চয়ই জানা আছে। আমাদের গোত্রের লোকদের হাত থেকে তাঁকে আমরা নিরাপত্তা দিয়েছি। তিনি তাঁর গোত্রের কাছে সম্মানিত এবং নিজ শহরে নিরাপদে অবস্থান করছেন। কিন্তু তিনি এখন আপনাদের সাথে এক হতে চান। আপনারা যদি মনে করেন, যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আপনারা মুহাম্মাদকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন, সে প্রতিশ্রুতি আপনারা পূরণ করতে পারবেন, তাঁর শত্রুদের হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করতে পারবেন, তাহলে সিদ্ধান্ত নিন আপনারা তাঁর দায়িত্ব নেবেন কি না। আর যদি মনে করেন, শেষ পর্যন্ত আপনারা তাঁকে রক্ষা করতে পারবেন না এবং তাঁকে তাঁর শত্রুদের হাতে তুলে দেবেন তবে এখনই তাঁকে রেখে যান। কারণ তিনি নিজ গোত্রের মধ্যে নিজের শহরে সম্মান ও নিরাপত্তার মাঝে আছেন।

আব্বাস ইবন মুত্তালিব আনসারদের দৃঢ়তা যাচাই করছিলেন। আনসাররা তাদের এই প্রতিশ্রুতির প্রতিটা কতো অনড় সে ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত হতে চাইছিলেন। কারণ তাঁরা এমন এক ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, যে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় তাদেরকে চড়া মূল্য দিতে হতে পারে। চারদিক থেকে তাদের উপর চাপ আসতে পারে, তাদের উপর দুর্যোগ নেমে আসতে পারে এবং এ চাপ সামলানোর ক্ষমতা পরবর্তীতে নাও থাকতে পারে। এই ধরনের একটি প্রতিরক্ষা চুক্তির সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া যে সহজ হবে না সে ব্যাপারটি তিনি আনসারদের জানিয়ে রাখছিলেন। রাসূলুল্লাহকে আশ্রয় দেওয়া নিঃসন্দেহে একটা বিরাট ঝুঁকি, আর সেই ঝুঁকি নিতে রাজি কিনা, তাঁরা তাঁকে আশ্রয় ও নিরাপত্তা দেওয়ার সামর্থ্য রাখে কিনা সে বিষয়টি যাচাই করা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাই আব্বাস তাদের বলছিলেন, যদি তাদের এ সামর্থ্য

না থাকে তাহলে তাঁরা যেন এই অঙ্গীকারে অংশ না নিয়ে আল্লাহর রাসূলকে মক্কাতেই রেখে যায়।

প্রশ্ন আসতে পারে অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও কেন আব্বাস সেখানে উপস্থিত ছিলেন? কারণ আব্বাস ইবন মুত্তালিব ছিলেন রাসূলুল্লাহর চাচা এবং বনু হাশিম গোত্রের একজন মুরুব্বি। মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও তিনি রাসূলুল্লাহর সাথে থাকতে পছন্দ করতেন এবং তার সকল কার্যকলাপের দিকে লক্ষ্য রাখতেন। আবু তালিবের মৃত্যুর পর মক্কায় রাসূলুল্লাহকে যারা নিরাপত্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, আব্বাস ছিলেন তাদের একজন। তাই তিনি নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলেন যে, তাঁর ভাতিজা যখন মক্কা ত্যাগ করে যাবে তখন যেন সে নিরাপদে থাকে। আর এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ঐ তাঁকে বৈঠকে অংশগ্রহণের অনুমতি দিয়েছিলেন। বনু হাশিম গোত্রের একজন প্রতিনিধি হিসেবে আব্বাস বৈঠকে উপস্থিত থেকে গোত্রের সন্তানদের নিরাপত্তার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন।

আরো প্রশ্ন আসতে পারে চাচা আব্বাসের নিরাপত্তা কি যথেষ্ট ছিল না, যেখানে আবু তালিবও তাঁর চাচা হিসেবে তাঁকে এতদিন নিরাপত্তা দিয়ে আসছিলেন? অনেকের মতে, নিজ গোত্রের লোকেদের কাছে আবু তালিব যেরূপ সম্মানিত ছিলেন, তাদের ওপর তাঁর যেমন প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল, তাঁর অন্য ভাইদের তেমনটা ছিল না। তাই বয়োজ্যেষ্ঠতার জন্য আবু তালিব যেভাবে মুহাম্মাদকে রক্ষা করতে পেরেছেন, নিশ্চিতভাবেই আব্বাস সেভাবে পারতেন না। তিনি ছিলেন যুবক। তবুও তিনি তাঁর সাধ্যমত চেষ্টা করে হিজরতের আগ পর্যন্ত নবীজিকে নিরাপত্তা দিয়েছিলেন।

আব্বাসের বক্তব্য শেষ হওয়ার পর আনসাররা বললেন, 'আপনার কথা আমরা শুনেছি। হে আল্লাহর রাসূল , এবার আপনি কথা বলুন। বলুন আমাদের থেকে আপনি কী চান। আপনি নিজের এবং আপনার রবের জন্য আমাদের কাছ থেকে যা যা অঙ্গীকার নিতে চান, তা আমাদেরকে বলুন।' রাসূলুল্লাহ উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন,

'তোমরা অঙ্গীকার করো, ভালো-মন্দ সকল অবস্থায় আমার কথা শুনবে এবং মানবে। সচ্ছলতা, অসচ্ছলতা সর্বাবস্থায় আল্লাহর পথে ব্যয় করবে। সৎ কাজের আদেশ আর অসৎ কাজে নিষেধ করবে। আল্লাহর পথে হক কথা বলে যাবে এবং এ ব্যাপারে কোনো নিন্দুকের

নিন্দাকে পরোয়া করবে না। আমি যদি তোমাদের কাছে আসি তাহলে আমাকে সাহায্য করবে। আমাকে হেফাযত করবে সেভাবে, যেভাবে তোমরা নিজেদেরকে, নিজেদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে হেফাযত করো।'

এই অঙ্গীকার ছিল আকাবার প্রথম বাইয়াতের অঙ্গীকারের চেয়ে একধাপ বেশি। তখন তারা কেবল মুসলিম হওয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন। কিন্তু এবার আরো একটি বিষয় যুক্ত হয়েছে, আল্লাহর রাসূলকে নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া। এটি ছিল আত্মরক্ষামূলক প্রতিরোধ।

রাসূলুল্লাহ ছিলেন অত্যন্ত স্পষ্টবাদী। তিনি যা চান তিনি তা পরিষ্কার ভাষায় আনসারদেরকে জানিয়ে দিলেন, কোনো অস্পষ্টতা তিনি রাখলেন না। তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিলেন তিনি শুধু নিরাপত্তার খাতিরে মদীনায় আসছেন না, বরং সবাই তাঁকে মেনে চলবে এবং একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করা চলবে না। তাঁরা যদি আল্লাহ ছাড়া আর অন্য কোনো কিছুকে ভয় করেন তাহলে তিনি তাঁর মিশন নিয়ে এগোতে পারবেন না। রাসূলুল্লাহ এমন একটি মিশনে নেমেছেন যে মিশন সফল করতে হলে নিজের জীবন বিলিয়ে দেওয়ার মানসিকতা থাকা চাই আনসারদেরকে রাসূলুল্লাহ এই কথাটিই বুঝাতে চাচ্ছিলেন।

রাসূলুল্লাহর কথা শুনে বারা ইবন মা'রুর সবার প্রথমে উঠে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহকে বাইয়াত দিতে চাইলেন। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর শপথ, আমরা তো প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে যোদ্ধা জাতি।' বারার কথা শেষ হতে না হতেই আবুল হাইসাম ইবন তাইহান উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল। আমাদের সাথে অন্যদের (অর্থাৎ ইহুদিদের) সন্ধি রয়েছে। আমরা যদি এই চুক্তি ভঙ্গ করি আর আল্লাহ আপনাকে বিজয় দান করেন, তাহলে কি আপনি আমাদের ত্যাগ করে নিজ গোত্রে ফিরে যাবেন?'

আবু হাইসাম বলতে চাচ্ছিলেন, আপনার হাতে বাইয়াত করার অর্থ হচ্ছে, আমরা এমন লোকদের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হতে পারি যাদের সাথে আমাদের সন্ধিচুক্তি রয়েছে। এ অবস্থায়, আপনি যদি বিজয় লাভ করেন, তখন কি আপনি আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন নাকি আমাদের সাথেই থাকবেন? দেখুন, আমরা কিন্তু সারাজীবনের জন্য স্বেচ্ছায়

অঙ্গীকারাবদ্ধ হচ্ছি কিন্তু আপনি কি আমাদের সাথে থাকবেন? নাকি আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন?

রাসূলুল্লাহ মুচকি হেসে উত্তর দিলেন,

'তোমাদের রক্তই আমার রক্ত। আর তোমাদের ধ্বংসই আমার ধ্বংস। আমি তোমাদের আর তোমরা আমার। তোমরা যাদের সাথে যুদ্ধ করবে আমিও তাদের সাথে যুদ্ধ করবো। তোমরা যাদের সাথে সন্ধি করবে, আমিও তাদের সাথে সন্ধি করবো।

রাসূলুল্লাহ তাঁর এই ওয়াদা রেখেছিলেন। তাঁর আপন মাতৃভূমি মক্কা বিজয়ের পর তিনি সেখানে থেকে যাননি, বরং তিনি আনসারদের সাথে মদীনায় চলে যান এবং আমৃত্যু সেখানেই বসবাস করেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি আনসারদের সাথে অবস্থান করেন।

রাসূলুল্লাহর হাতে বাইয়াত করার জন্য আনসাররা যখন তাদের হাত এগিয়ে দিতে শুরু করেন, তখন আব্বাস ইবন উবাদা দাঁড়িয়ে তাদের বাধা প্রদান করেন। তিনি ছিলেন মদীনার প্রথম দিকের ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন। তিনি বলেন, 'একটু থামো।' তিনি তাঁর গোত্রের লোকদেরকে ব্যাপারটি সহজভাবে নিতে এবং ধীরেসুস্থে করার জন্য বললেন। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন,

'আমরা আজ তাঁর কাছে এ কারণেই সমবেত হয়েছি যে তিনি আল্লাহর রাসূল। তাঁকে আশ্রয় দেওয়ার অর্থ হলো সমগ্র আরবের সাথে শত্রুতা সৃষ্টি হওয়া। এর ফলে তোমাদের নেতাদের জীবন হুমকির সম্মুখীন হতে পারে। তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দামামা বাজবে। যদি তোমরা মনে করো, তোমরা এই ঝুঁকির ভার সইতে পারবে, তবেই তাঁকে নিজেদের কাছে নাও। তোমাদের এ কাজের বিনিময় আল্লাহর কাছে রয়েছে। আর যদি নিজেদের জান তোমাদের কাছে প্রিয় হয়ে থাকে, তবে এখনই তাঁকে ছেড়ে দাও, এটা হবে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য অজুহাত।'

তিনি তাদেরকে মনে করিয়ে দিলেন এই অঙ্গীকার কোনো সহজ অঙ্গীকার নয় তোমরা কি বুঝতে পারছো, আমরা কীসের ব্যাপারে অঙ্গীকার করছি? যদি আমরা তাঁকে আশ্রয় দিই, তাহলে পুরো বিশ্বের সাথে আমাদের শত্রুতা তৈরি হবে। আমাদের দিকে তরবারি তাক করা হবে সবদিক থেকে। আমাদের নেতৃস্থানীয় লোকেরা মারা পড়তে পারে। আমাদের জান-মাল হুমকির মুখে পড়তে পারে, বিনষ্ট হতে পারে। কাজেই যদি তোমরা অঙ্গীকার করো, তবে বুঝেশুনে অঙ্গীকার করো। আর যদি তোমাদের অন্তরে কোনোরূপ ভয়-ভীতি থেকে থাকে তাহলে দেরি হওয়ার আগেই এ প্রতিশ্রুতি থেকে সরে পড়ো। তাঁরা আব্বাস ইবন উবাদাকে সরিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমরা বাইয়াত করবো, এবং আমরা কখনও বাইয়াত ভঙ্গ করবো না।'

আনসাররা ছিলেন অসম্ভব দৃঢ়প্রত্যয়ী, তাঁরা প্রচণ্ড দৃঢ়তার সাথে অঙ্গীকার করেছিলেন। তাঁরা জানতে চাইলেন, 'আপনাকে রক্ষার বিনিময়ে আমরা কী পাবো?' তাঁরা বলতে চাচ্ছিলেন, নিজেদের জীবন ধনসম্পদ কুরবানি করে হলেও আমরা আপনাকে রক্ষা করে যাবো কিন্তু এর বিনিময়ে আপনি আমাদের কী দেবেন? এর বিনিময় কী? কোনো চুক্তিই একতরফা নয়। যেহেতু আমরা আপনাকে সাহায্য করতে যাচ্ছি সেহেতু নিশ্চয়ই এর বিনিময়ে আমরা কিছু পাবো, সেটা কী?

রাসূলুল্লাহ ও তাদের প্রশ্নের উত্তরে শুধু একটি শব্দই বললেন, ব্যস, 'আল জান্নাহ', এতটুকুই ছিল তাঁর ওয়াদা, আর কিচ্ছু না। তিনি তাদেরকে না মন্ত্রীত্বের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, না দিয়েছেন বাড়িগাড়ি কিংবা টাকাপয়সার প্রতিশ্রুতি, তিনি শুধু তাদেরকে একটি জিনিসের ওয়াদা করেছেন, তা হলো জান্নাত।

আনসাররা খুশিমনে বলে উঠলেন, 'এ তো এক লাভজনক ব্যবসা! আমরা কখনই এই সুযোগ হাতছাড়া করবো না।' তাঁরা দুনিয়ার সম্পদ কিংবা ক্ষমতা চাননি, তাঁরা শুধু জান্নাতের অঙ্গীকারে সন্তুষ্ট ছিলেন।

বাইয়াতের এই সংবাদটি কোনোভাবে কুরাইশদের কাছে পৌঁছে যায়। হাজ্জের মৌসুমে সত্তরের অধিক লোকের একটি বৈঠক গোপন রাখা খুব সহজ ব্যাপার না। এক বর্ণনায়

এসেছে যে, শয়তান কুরাইশদের কাছে এই সংবাদ পৌঁছে দেয়। তারা এ ব্যাপারে অনুসন্ধান চালায় এবং আনসারদেরকে খুঁজে বের করে।

পরদিন ভোরে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের একটি দল আওস ও খাযরাজ গোত্রের তাঁবুতে প্রবেশ করে। তারা জিজ্ঞেস করলো, 'আমরা খবর পেয়েছি যে তোমরা নাকি মুহাম্মাদের সাথে সাক্ষাত করেছো আর তাঁকে তোমাদের সাথে নিয়ে যাওয়ার ও নিরাপত্তা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছো? ইয়াসরিববাসী, তোমরা জেনে রাখো তোমাদের সাথে যুদ্ধ করা অন্য সব আরব গোত্রের সাথে যুদ্ধ করার চেয়ে আমাদের কাছে বেশি অপছন্দনীয়।' কুরাইশরা জানতো যে, আওস ও খাযরাজ গোত্র সহজ কোনো প্রতিপক্ষ নয়, তাঁরা ছিলেন লড়াকু যোদ্ধা।

আওস ও খাযরাজ গোত্রের মুসলিমরা চুপ করে থাকলেন, তাঁরা কোনো উত্তর দিলেন না। উত্তর দিল মুশরিকরা, তারা বললো, 'কই? এরকম কিছু তো হয়নি। আমরা তো কখনো মুহাম্মাদের সাথে দেখা করিনি।' গোত্রের মুশরিক সদস্যরা জানতোই না যে গোত্রের মুসলিম সদস্যরা আল্লাহর রাসূলের ﷺ দেখা করেছে। গোপন বৈঠকের ব্যাপারে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না। তাই তারা বারবার বলছিল যে, তারা মুহাম্মাদের সাথে সাক্ষাত করেনি। কা'ব ইবন মালিক বলেন, 'আমরা মুসলিমরা চুপচাপ একে অন্যের মুখের দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছিলাম। আমরা কোনো কথাই বলিনি।'

কিন্তু কুরাইশদের মন থেকে কোনোভাবেই সন্দেহ দূর হচ্ছিল না। কা'ব বলেন, 'আমি চাইলাম কথার প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দিতে, যেন কুরাইশরা আসল বিষয়টি ভুলে যায়।'সেখানে ছিলেন হারিস ইবন হিশাম, কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় এক ব্যক্তি, তার পায়ে একজোড়া নতুন জুতো। কা'ব সেটা দেখে আবু জাবিরকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন, 'আবু জাবির। আপনি একজন বড় মাপের নেতা। আপনি কি পারেন না কুরাইশদের ওই যুবকের মতো একজোড়া নতুন জুতা ব্যবহার করতে? নেতা হয়ে আপনি পুরনো জুতা পরে আছেন, আর ওই যুবক কত সুন্দর জুতা পরে আছে।'

এ কথা শুনে হারিস মন খারাপ করে বলে, 'তুমি আমার জুতা নিয়ে কথা বলছো? এতোই মূল্যবান আমার জুতা? লাগবে না এই জুতা!' এই বলে সে পা থেকে জুতাজোড়া খুলে কা'ব ইবন মালিকের দিকে ছুঁড়ে মারে। আবু জাবির বলেন, 'আহ থামো তো কা'ব তুমি

তো এই যুবককে ক্ষেপিয়ে তুলেছো। তার জুতা তাকে ফিরিয়ে দাও।' কা'ব বললেন, 'না, আমি এগুলো ফেরত দেবো না। এটি আমার জন্য ভালো লক্ষণ। আমি যুদ্ধক্ষেত্রে এই জুতা নিয়ে যাবো।'

এতটুকুই ছিল রাসূলুল্লাহ এবং আনসারদের মধ্যকার বৈঠক। নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, এটি ছিল এযাবৎকাল পর্যন্ত রাসূলুল্লাহর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। এটি ছিল ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো একটি ঘটনা। ইসলাম যেন এই ঘটনার মাধ্যমে উঠে দাঁড়িয়েছিল। রাসূলুল্লাহ এমন একটি ভূমির সন্ধান পেলেন যেখান থেকে সুরক্ষিত ও স্বাধীনভাবে ইসলামকে ছড়িয়ে দিতে পারবেন। এটি সম্ভব হয়েছিল আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াত, বাইয়াতুল আকাবা আস-সানিয়ার মাধ্যমে।

হিজরতের পটভূমি -গুপ্ত হত্যার চেষ্টা

মুশরিকরা যখন দেখলো মুসলিমরা একে একে পরিবার-পরিজন নিয়ে ধন-সম্পদ ফেলে মদীনায় জমা হচ্ছে তারা অস্থির হয়ে গেল। মুসলিমদের মদীনায় হিজরতের ফলাফল কী হতে পারে তা তাদের অজানা ছিল না। তারা টের পেয়েছিল আওস এবং খাযরাজ গোত্র রাসূলুল্লাহর নেতৃত্বে এক হচ্ছে এবং তাদের মিলিত শক্তির সাথে পেরে ওঠা সহজ কথা নয়। মদীনায় মুসলিমদের ঘাঁটি গড়ার অর্থ হলো, তাদের দীর্ঘদিনের বাণিজ্যিক পথ অনিরাপদ হয়ে যাওয়া, কেননা কুরাইশদের ব্যবসা ছিল ইয়েমেন থেকে সিরিয়া পর্যন্ত যে দীর্ঘ উপকূলীয় পথ রয়েছে সে পথেই কুরাইশদের কাফেলা চলাচলা করতো আর মদীনা থেকে সে পথ খুব দূরে নয়। কুরাইশরা দীর্ঘদিন ধরে আরবের একচ্ছত্র ক্ষমতার যে স্বপ্ন দেখে আসছিল, মদীনায় মুসলিমদের উত্থান হলে সে স্বপ্নে মুসলিমরা ব্যাঘাত ঘটাবে। অত্যাচার-নির্যাতন, প্রলোভন, সমঝোতা, মিডিয়া ক্যাম্পেইন, হত্যার হুমকি, বয়কট-কিছুই যখন কাজ হলো না তখন কুরাইশরা ক্ষুব্ধ ষাঁড়ের মত ফুঁসলে উঠলো। ব্যর্থ, পরাজিত মানুষের মত বেপরোয়া, মরিয়া, অস্থির-উন্মাদপ্রায় কুরাইশরা গুপ্তহত্যার পরিকল্পনা করলো: মুহাম্মাদকে তারা মারবেই-যে করেই হোক।

দারুন নাদওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন বসলো, শিরোনাম: মুহাম্মাদকে কীভাবে থামানো যায়। কুরাইশদের বড় বড় নেতারা এ অধিবেশনে অংশ নিল। বেশ কিছু প্রস্তাব এলো।

কেউ প্রস্তাব করলো তাঁকে কারাগারে আটকে রাখা হোক। কিন্তু এ প্রস্তাব খুব একটা গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। কারণ তারা খুব ভালো করে জানতো যে, রাসূলুল্লাহকে কারাগারে প্রেরণ করলে সাহাবীগণ তাঁকে ছাড়িয়ে নিতে পারবেন, এমনকি তাঁরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও করে বসতে পারেন। প্রস্তাব হলো, রাসূলুল্লাহকে মক্কা থেকে বের করে দেওয়া। কিন্তু এ প্রস্তাবও খুব একটা হালে পানি পেল না, কারণ রাসূলুল্লাহর কথাবার্তা ছিল খুবই চমৎকার, তাঁর সুন্দর কথা শুনে মক্কার বাইরের লোকেরা তাঁকে বিশ্বাস করে তাঁর দলে যোগ দিয়ে মক্কায় আক্রমণ চালাতে পারে।

সর্বশেষ এবং সবচেয়ে জঘন্য প্রস্তাব ছিল নবীজিকে হত্যা করা। এই প্রস্তাব আর কারো নয়, এই প্রস্তাব কুখ্যাত আবু জাহেলের। সে প্রস্তাব করলো, প্রত্যেক শক্তিশালী অভিজাত বংশের একজন করে শক্তসমর্থ কাউকে পাঠানো হবে। তাদের সবার হাতে থাকবে একটি করে ধারালো তলোয়ার। তারা সবাই একযোগে রাসূলুল্লাহকে হত্যা করবে। ফলে হত্যার দায় নির্দিষ্ট কাউকে বহন করতে হবে না, মক্কার সমস্ত গোত্র এই হত্যার দায়ভার নেবে। সেক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহর পরিবার মক্কার সব গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়াতে পারবে না, তারা রক্তপণ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হবে। মুশরিকরাও খুশি মনে রক্তপণ দিয়ে দিবে। প্রস্তাবটি জঘন্য হলেও বেশ কার্যকরী ছিল, মক্কার সংসদে হত্যার বিল পাস হলো।

"আর কাফেরেরা যখন প্রতারণা করতো আপনাকে বন্দী অথবা হত্যা করার উদ্দেশ্যে কিংবা আপনাকে বের করে দেয়ার জন্য তখন তারা যেমন পরিকল্পনা করতো তেমনি, আল্লাহও পরিকল্পনা করতেন। বস্তুতঃ আল্লাহর পরিকল্পনাই সবচেয়ে উত্তম।” (সুরা আনফাল, ৮: ৩০)

মুশরিকদের পরিকল্পনা ছিল রাসূলুল্লাহকে গোপনে হত্যা করা, কিন্তু আল্লাহর পরিকল্পনা ছিল তাঁকে তিনি রক্ষা করবেন। আল্লাহ আযযা ওয়াজাল তাঁর নবী মুহাম্মাদকে শিখিয়ে দিলেন একটি দুআ।

"বলুনঃ হে আমার রব, যেখানে গমন শুভ ও সন্তোষজনক, আপনি আমাকে সেখানে নিয়ে যান এবং যেখান হতে নির্গমন শুভ ও সন্তোষজনক সেখান হতে আমাকে বের করে নিন

এবং আপনার নিকট হতে আমাকে দান করুন সাহায্যকারী শক্তি।” (সূরা আল-ইসরা, ১৭: ৮০)

"আমাকে সেখানে নিয়ে যান, যেখানে আমার গমন শুভ" এখানে মদীনার কথা বোঝানো হচ্ছে; "যেখান হতে নির্গমন শুভ সেখান হতে আমাকে বের করে নিন" - এখানে বলা হচ্ছে মক্কার কথা এবং "আপনার নিকট হতে আমাকে দান করুন সাহায্যকারী শক্তি”- এখানে বলা হচ্ছে শাসনকর্তৃত্ব বা রাজনৈতিক ক্ষমতার কথা। আল্লাহ তাআলা শিক্ষা দিচ্ছেন এই দ্বীনকে টিকিয়ে রাখতে চাই শাসনকর্তৃত্ব বা শক্তি।

হিজরতের সিদ্ধান্ত:

আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে হিজরতের অনুমতি পাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ বকরকে বিষয়টি জানানোর জন্য তাঁর বাড়ির উদ্দেশ্যে বের হলেন। আ'ইশা আবু সেদিনের কথা বর্ণনা করেন, 'আমরা দেখলাম একজন মানুষ মুখ কাপড়ে ঢেকে আমাদের বাড়ির দিকে আসছেন।' আবু বকর তাঁকে দেখেই বুঝতে পারলেন যে তিনি আল্লাহর রাসূল। আবু বকর বলে উঠলেন, 'নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যাপার, তা না হলে তিনি এ অসময়ে এভাবে আসতেন না।' দুপুর বেলা বিশ্রামের সময়ে রাসূলুল্লাহর এভাবে আসার কথা না।

রাসূলুল্লাহ ঘরে ঢুকেই আবু বকরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার পরিবারের সবাই কি চলে গেছে?' আবু বকর বললেন, 'এখানে যারা আছেন তাঁরা তো সবাই আপনার পরিবারের সদস্য।' আবু বকর বুঝাতে চাইলেন, আমার পরিবার তো আপনার নিজের পরিবারের মতোই, তাই আপনি তাদের বিশ্বাস করতে পারেন এবং তাদের সামনেই গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে পারেন। এরপর রাসূলুল্লাহ আবু বকরকে জানালেন, 'আবু বকর, আল্লাহ তাআলা আমাকে মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করার অনুমতি দিয়েছেন।' আবু বকর বললেন, 'আল্লাহর রসূল, আমি কি আপনার সাথে যেতে পারি?' রাসূলুল্লাহ বললেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই!' রাসূলুল্লাহর সাথে যাওয়ার অনুমতি পেয়ে আবু বকর কাঁদতে লাগলেন। আ'ইশা বলেছেন, 'সেদিন আমার পিতা খুশিতে যেভাবে কেঁদেছিলেন আমি কোনোদিন কাউকে আনন্দে এভাবে কাঁদতে দেখিনি।

মদীনায় হিজরত করা যে খুব আনন্দদায়ক ভ্রমণ ছিল তা কিন্তু নয়। আবু বকর ভালোমতোই জানতেন যে, হিজরতে রাসূলুল্লাহর সফরসঙ্গী হওয়ার অর্থ নিজের জীবনকে ঝুঁকিতে ফেলে দেওয়া। তিনি বিপদাপন্ন একটি সফরে যাচ্ছেন জেনেও তিনি খুশিতে কেঁদে উঠেছিলেন শুধু এই কারণে যে, তিনি আল্লাহর রাসূলকে ভালোবাসতেন। নিজের জীবনের ভয়ে আবু বকর ভীত ছিলেন না, বরং রাসূলুল্লাহর জন্য এই আত্মত্যাগের সুযোগ পেয়ে তিনি আনন্দে কেঁদে ফেলেন।

বাসভবন ঘেরাও

গুপ্তহত্যার অপারেশনের জন্য নির্বাচিত করা হলো এগারো জনকে, এদের মধ্যে আবু জাহেল এবং আবু লাহাবও ছিল। তারা সবাই রাসূলুল্লাহর বাসার চারদিকে ওঁৎ পেতে রইল। রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করলো, রাসূলুল্লাহ ও শুয়ে পড়লেই তাঁর বাসায় একযোগে হামলা চালাবে। তারা নিশ্চিত মনে হাসাহাসি করছিল, এবারের মিশন সফল হবেই, কেউ তাদেরকে থামাতে পারবে না। নির্ঘুম চোখে তারা অপেক্ষা করছিল সেই 'বিজয়' মুহূর্তের।

রাসূলুল্লাহ জানতেন তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করছেন কুরাইশরা। সেই রাতে আলী ইবন আবু তালিবকে রাসূলুল্লাহ তাঁর কাছে রাখা কুরাইশদের আমানত বুঝিয়ে দিলেন এবং বললেন, 'তুমি আমার এই সবুজ হাদরামাউতি চাদর গায়ে দিয়ে আমার বিছানায় শুয়ে থাকো। ওদের হাতে তোমার কিছুই হবে না।' আলী নিজ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাসূলুল্লাহর কথামতো বিছানায় শুয়ে থাকলেন। সাহাবারা আগ্রহের সাথে তাদের এই দায়িত্বগুলো পালন করতেন। এমনকি নিজেদের জীবনের ঝুঁকিও নিয়েছেন খুশিমনে।এদিকে কুরাইশরা ব্যস্ত নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা-তামাশায়। আবু জাহেল তার সঙ্গীদের বললো, 'আরে তোমরা জানো মুহাম্মাদ কী বলে। সে বলে তার দ্বীন মানলে তোমরা নাকি আরব অনারবের বাদশাহ হবে! মরার পর তোমাদের নাকি বাগান থাকবে, জর্ডানের বাগানের মতো বাগান। আর তোমরা

যদি তাকে না মানো, তাহলে তোমাদের মেরে ফেলা বৈধ হয়ে যাবে আর মরার পর তোমরা আগুনে পুড়বে।'

'হ্যাঁ, আমি এ কথাই বলেছি আর আগুনেই পুড়বে তুমি' রাসূলুল্লাহ হাতে এক মুঠো মাটি নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এলেন এবং তাদের দিকে নিক্ষেপ করলেন। দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলেন রাসূলুল্লাহ, কেউ তাঁকে আর দেখতে পেল না। সকলের অগোচরে তিনি ঘর ত্যাগ করলেন। রাসূলুল্লাহ তখন আবৃত্তি করছিলেন সূরা ইয়াসীনের আয়াত,

'আমি ওদের সামনে ও পেছনে প্রাচীর স্থাপন করে দিয়েছি এবং আবৃত করে দিয়েছি, ফলে ওরা দেখতে পায় না।" (সূরা ইয়াসিন, ৩৬: ৯)

এদিকে কুরাইশদের সেই এগারো জন মাথায় মাটি নিয়ে বসে থাকলো নির্ধারিত সময়ের আশায়। কিন্তু তারা তার আগেই জানতে পারলো আল্লাহর রাসূল আগেই বাসা ছেড়ে চলে গেছেন। তবু দুরাশা নিয়ে রাসূলুল্লাহর ঘরে উঁকি দিয়ে দেখলো কেউ একজন বিছানায় শুয়ে আছে। তারা ভাবলো বুঝি রাসূলুল্লাহ শুয়ে আছে। ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করে তারা দেখলো শুয়ে আছে আলী। প্রচণ্ড হতাশ হয়ে আলীকে জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় মুহাম্মাদ?' আলী বললেন, 'জানি নাহ।

মদীনার পথে

রাসূলুল্লাহ ও আবু বকর ইতিমধ্যেই মদীনা অভিমুখে যাত্রা শুরু করে দিয়েছে বেশ অনেক পথ পাড়ি দিয়ে ফেলেছেন। রাসূলুল্লাহ তাঁর জন্মভূমি মক্কাকে খুব ভালোবাসতেন। তাই তিনি মক্কা ত্যাগ করার সময় বারবার পিছনে ফিরে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'আল্লাহর নামে বলছি, মক্কা আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় নগরী। আমাকে যদি এখান হতে বের করে দেওয়া না হতো তাহলে আমি কখনো এ নগরী ছেড়ে যেতাম না। এখানে থেকে যাওয়ার কোনো সুযোগ থাকলে আমি মক্কা ত্যাগ করতাম না।'

মদীনা অভিমুখে তাদের যাত্রা শুরু হলো। কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ খেয়াল করলেন আবু বকর কিছু সময় তাঁর আগে-আগে হাঁটছেন আবার কিছু সময় তাঁর পিছন- পিছন হাঁটছেন। তাই রাসূলুল্লাহ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন,

কী ব্যাপার? কখনো তুমি আমার সামনে চলছো, আবার কখনো পিছনে চলছো, কেন?

আমার যখন মনে হয় কেউ আপনাকে সামনের দিক থেকে হঠাৎ আক্রমণ করতে পারে তখন আমি আপনার সামনে চলে যাই। আবার যখন মনে হয় কেউ আপনাকে পেছন থেকে আক্রমণ করতে পারে তখন আমি আপনার পিছন-পিছন হাঁটি।

- আবু বকর, তুমি কোনটা চাও, আমার ক্ষতি নাকি তোমার ক্ষতি?

আল্লাহর রাসূল, আমার ক্ষতি হলে হোক, কিন্তু আপনার ক্ষতি হোক এটা আমি হতে দিতে চাই না।'

"এমন দু'জন সম্পর্কে তোমার কী ধারণা, যাদের তৃতীয় সঙ্গী হচ্ছেন আল্লাহ?"

এরপর তাঁরা একটি গুহার কাছে পৌঁছালেন। প্রথমে আবু বকর গুহার ভেতরে ঢুকে সবকিছু ভালোমতো পরীক্ষা করে দেখলেন যে, সেখানে কোনো সাপ, বিছা অথবা কোনো শত্রুদল ঘাপটি মেরে আছে কিনা। সবকিছু নিরাপদ দেখে তিনি রাসূলুল্লাহকে * ভিতরে আসতে বললেন। কিন্তু কুরাইশ মুশরিকরা তাদের গতিবিধি নজরদারি করতে সক্ষম হয় এবং গুহার খুব কাছে চলে আসে। আবু বকর রাসূলুল্লাহকে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, যদি মুশরিকদের কেউ মাথা নিচু করে পা বরাবর তাকায় তাহলে তারা আমাদের দেখে ফেলবে।' রাসূলুল্লাহ খুব নির্ভীক কণ্ঠে বললেন, 'আবু বকর, এমন দু'জন সম্পর্কে তোমার কী ধারণা, যাদের তৃতীয় সঙ্গী হচ্ছেন আল্লাহ? তুমি কি তাদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত হবে?' গুহার খুব কাছে এসেও মুশরিকদের ফিরে যাওয়ার কারণটি ছিল খুবই অদ্ভুত। একটি অতি ঠুনকো মাকড়শার জাল।

"... আর সব ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো অধিক দুর্বল..." (সূরা আনকাবূত, ২৯: ৪১)

যে মাকড়শার জালকে একটি আঙ্গুল দিয়ে ছিঁড়ে ফেলা যায়, সেই দুর্বল মাকড়সার জালই হয়ে গেল এখানে আল্লাহ তাআলার সৈনিক। এটিই গুহায় মুশরিকদের সৈনিকদের ঢুকতে বিরত রেখেছিল। আল্লাহ যদি চান, তিনি তাঁর সুবিশাল সৃষ্টির মধ্য থেকে সবচেয়ে দুর্বলতম সৃষ্টিকেও সৈনিক হিসেবে কাজে লাগাতে পারেন। হিজরতের দিনে রাসূলুল্লাহর সঙ্গী হিসেবে ছিলেন শুধু আবু বকর, সাহাবাদের কেউই সেখানে ছিলেন না। তার উপর মুশরিকরা তাদের ঘিরে রেখেছিল, কিন্তু রাসূলুল্লাহকে সেই ভয়ানক পরিস্থিতি থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ তাআলা নিজেই যথেষ্ট ছিলেন। এই ঘটনার পর আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন,

"যদি তোমরা তাঁকে (রাসূলুল্লাহকে) সাহায্য না কর তাহলে আল্লাহই তাঁকে সাহায্য করবেন যেমন তিনি তাকে সাহায্য করেছিলেন সেই সময়ে যখন কাফিরেরা তাঁকে দেশান্তর করেছিল। তিনি ছিলেন দু'জনের একজন, যখন তাঁরা গুহার মধ্যে ছিলেন। তখন তিনি তাঁর আপন সঙ্গীকে বলেছিলেন, বিষন্ন হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর প্রতি তাঁর পক্ষ থেকে প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাঁর সাহায্যে এমন বাহিনী পাঠালেন, যা তোমরা দেখনি। বস্তুতঃ আল্লাহ কাফেরদের মাথা নীচু করে দিলেন আর আল্লাহর কথাই সদা সমুন্নত এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা তাওবাহ, ৯:৪০)

আবু বকরের জন্য এই আয়াত একটি বিরাট সম্মান। কারণ এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা আবু বকরকে আল্লাহর রাসূলের সঙ্গী বা সাহাবি হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ আবু বকরের সাথে সেই গুহাতে তিনদিন অবস্থান করেন। আবু বকরের ছেলে আবদুল্লাহ তাদের সাথে রাতের বেলা গুহায় অবস্থান করতো কিন্তু দিনের বেলা মক্কায় গিয়ে খোঁজ নিত মুশরিকরা রাসূলুল্লাহর ব্যাপারে কী পরিকল্পনা করছে। মুশরিকরা যাতে আবদুল্লাহর গুহায় যাওয়া-আসার বিষয়ে টের না পায় এজন্য সে আবু বকরের আযাদকৃত দাস আমির ইবন ফুহাইরাহকে বলে দিত সে যেন তার ভেড়ার পাল নিয়ে আবদুল্লাহর অনুসরণ করে। এতে দুটো সুবিধা, প্রথমত, রাসূলুল্লাহ ও আবু বকর ভেড়ার দুধ পান করতে পারতেন। এতে তাদের খাবারের প্রয়োজন পূরণ হতো। দ্বিতীয়ত, তেড়ার পাল

আবদুল্লাহ ও আমিরের যাত্রাপথে তাদের পায়ের ছাপ নষ্ট করে দিত, ফলে তাদের গন্তব্যস্থল সম্পর্কে কেউ আঁচ করতে পারতো না।

এভাবেই তিনদিন চলে গেল। তিনদিন পর সেখানে আবদুল্লাহ ইবন উরাইকাত নামের এক ব্যক্তি এলো। রাসূলুল্লাহ ও আবু বকরকে মক্কা থেকে মদীনায় নেওয়ার জন্য নবীজি তাকে ভাড়া করেছিলেন। সে ছিল মুশরিক। সাধারণত যে পথে সবাই মক্কা থেকে মদীনায় যায় আবদুল্লাহ ইবন উরাইকাত তাদেরকে সেই পথ দিয়ে না নিয়ে অন্য আরেকটি পথ দিয়ে নিয়ে যায়। মদীনা পৌঁছার আগ পর্যন্ত তাঁরা উপকূল ঘেঁষে চলতে থাকেন।

হুলিয়া জারি ও মাথার দাম ঘোষণা

কুরাইশের মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ ও আবু বকরকে এ ধরিয়ে দেওয়ার জন্য একশো উট পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা করে। জীবিত অথবা মৃত। তারা মরুভূমির বেদুইন গোত্রসমূহের কাছে এই পুরস্কারের ঘোষণা জানিয়ে দেয়। তারা মরুভূমির পথঘাট সম্পর্কে দক্ষ ছিল। এমনই এক লোক ছিল সুরাকা ইবন মালিক। সে ছিল এক বেদুইন গোত্রের নেতা। হিজরতের একটি ঘটনা তার মুখে জানা যায়।

"আমি বন্ধুদের সাথে বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম। এমন সময় একজন এসে বললো, 'আমি দিগন্তের দিকে দুইজন লোককে দেখেছি। কুরাইশরা দুজনকে খুঁজছে। মনে হয় তারাই সেই লোক।' আমি তাকে বাধা দিয়ে বললাম, 'আরে না, তারা সেই লোক হতে পারে না। কিছুক্ষণ আগেও এই দুই লোক এখানে ছিল, এইমাত্র চলে গেছে।' আসলে আমি ঠিকই জানতাম যে ওই দুইজন লোক আসলে মুহাম্মাদ আর আবু বকর। কিন্তু আমি নিজেই একশ উট পাওয়ার লোভে তাদেরকে মিথ্যে বলি।'

এরপর সুরাকা সেখানে আরো কিছুক্ষণ বসে থাকলো। কারণ চট করে উঠে গেলে কেউ তাকে সন্দেহ করতে পারে। তারপর সে বাসায় গিয়ে তার চাকরকে বললো তার ঘোড়াটি প্রস্তুত করে লুকিয়ে রাখতে। কিছুক্ষণ পর সে পেছনের দরজা দিয়ে বের হয়ে যায়। সাথে নেয় একটি লম্বা বর্শা। কেউ যেন সেই বর্শা দেখতে না পায় এজন্য সে বর্শাটি মাটির

সাথে ঘেঁষে ঘেঁষে নিয়ে গেল। তারপর ঘোড়ায় চড়ে সে রাসূলুল্লাহ ও আবু বকরকে ধরার জন্য রওনা দিল। কিছুক্ষণ পর আবিষ্কার করলো সে ওই লোকের দাবিই ঠিক। ওই দুই লোক আসলেই রাসূলুল্লাহ এবং আবু বকর।

কোটিপতি হওয়ার সুযোগ থেকে সুরাকা মাত্র অল্প কিছু হাত দূরে। অন্যদিকে, আবু বকর বারবার পিছনে ফিরে তাকাচ্ছিলেন আর রাসূলুল্লাহ নিশ্চিন্তমনে কুরআন পাঠ করছিলেন। তিনি একবারও পিছন ফিরে তাকাননি। তিনি নিশ্চিতভাবেই জানতেন যে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বিজয়ী হতে সাহায্য করবেন। আবু বকর নিজেকে নিয়ে চিন্তিত ছিলেন না, তিনি রাসূলুল্লাহর নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। কিছুক্ষণ পর আবু বকর বুঝতে পারলেন কেউ একজন তাদের অনুসরণ করছে। তিনি রাসূলুল্লাহকে ব্যাপারটি জানালেন। রাসূলুল্লাহ আল্লাহর কাছে দুআ করলেন। তৎক্ষণাৎ সুরাকা ঘোড়া থেকে পড়ে গেল আর ঘোড়াটি মাটিতে বসে গেল। লোভী সুরাকা আবার ঘোড়াটিকে সামলানোর চেষ্টা করলো কিন্তু সে আবার ঘোড়া থেকে পড়ে গেল। এমন ঘটনা তার জীবনে আর কখনো ঘটেনি। তৃতীয়বার যখন একই ঘটনা ঘটলো তখন সুরাকার চোখেমুখে একরাশ ধূলি এসে পড়ল। সুরাকা বুঝতে পারল যে এই লোকের সাথে আল্লাহর সাহায্য আছে। এরপর সে রাসূলুল্লাহকে অনুরোধ করলো যেন তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ আগেও যে ব্যক্তি পুরস্কারের লোভে রাসূলুল্লাহকে কুরাইশদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য খুঁজছিল এখন সে নিজের বেঁচে থাকা নিয়েই চিন্তিত! সুরাকা বললো, 'আমার নিরাপত্তার জন্য একটি চিঠি লিখে দিন।' রাসূলুল্লাহ আমির ইবন ফুহাইরাহকে একটি নিরাপত্তাপত্র লেখার নির্দেশ দিলেন। পত্রটি লেখা হয়েছিল চামড়া অথবা হাড়ের উপর। সুরাকা এই পত্রটিকে স্মারকচিহ্ন হিসেবে নিজের কাছে রেখে দেয়। ৮-৯ বছর পরে নবীজির পারস্য অবরোধের সময় সুরাকা মুসলিমদের হাতে বন্দী হয়। সুরাকা তখন সেই নিরাপত্তাপত্রটি বের করে দেখালে মুসলিমরা তাকে ছেড়ে দেয়।

নিরাপত্তাপত্র যোগাড় করে সুরাকা মক্কায় ফিরে যায়। সেখানে গিয়ে সে রাসূলুল্লাহকে * খোঁজাখুঁজি করার ব্যাপারে কুরাইশদের নিরুৎসাহিত করতে লাগল। রাসূলুল্লাহই * তাকে এই কাজটি করতে অনুরোধ করেছিলেন। এভাবে সুরাকা হয়ে গেল রাসূলুল্লাহর পাহারাদার, অথচ কিছুক্ষণ আগেও সে পুরস্কারের লোভে রাসূলুল্লাহকে ধরার জন্য তৎপর ছিল।

যাত্রাবিরতি: উম্ম মা'বাদের তাঁবু-

যাত্রাপথে রাসূলুল্লাহ ও আবু বকর খুযাআ গোত্রের উম্ম মা'বাদ নামক এক মহিলার তাঁবুর কাছে থামেন। উম্ম মা'বাদ ছিলেন একজন দানশীল মহিলা। তাঁবুর পাশ দিয়ে যাওয়া পথিকদের তিনি আপ্যায়ন করতেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ও আবু বকরকে উম্ম মা'বাদ কিছুই দিতে পারেননি। রাসূলুল্লাহ ও উম্ম মা'বাদের কাছে খাবারের খোঁজ করেন। উম্ম মা'বাদ বললেন যে যদি দেওয়ার মতো কিছু থাকতো তাহলে তাঁর কাছে চাওয়া লাগতো না, বরং তিনি নিজে থেকেই দিতেন। আসলে উম্ম মা'বাদের শুধু একটি দুর্বল বকরী ছিল। খরার কারণে সেটির দুধ শুকিয়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ বকরীর দুধ দোহানোর জন্য তাঁর কাছে অনুমতি চান। উম্ম মা'বাদ তাঁকে অনুমতি দেন। রাসূলুল্লাহ তাঁর কাছ থেকে একটি বড় পাত্র চেয়ে নেন। তিনি বকরীটিকে স্পর্শ করামাত্রই বকরীটি দুধ দেওয়া শুরু করে। পাত্র না ভরা পর্যন্ত বকরীটি দুধ দিতে লাগল। পাত্রটি ভরে গেলে রাসূলুল্লাহ । প্রথমে তা উম্ম মা'বাদকে দেন। এরপর একে একে সবাই তৃষ্ণা মিটিয়ে দুধ পান করেন।

রাসূলুল্লাহ সবার শেষে দুধ পান করেন। দুধ পান শেষে তিনি বলেন, 'ঘরের সেবকরা সবার শেষেই পান করে।' রাসূলুল্লাহ । উম্ম মা'বাদের জন্য পাত্রে কিছু দুধ রেখে দেন। উম্ম মা'বাদের স্বামী বকরীর পাল নিয়ে বাড়িতে ফিরে এসে দুধ দেখে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই দুধ কোথা থেকে এল?' উম্ম মা'বাদ বললেন, 'এক বরকতময় লোক এসেছিলেন আজ। তিনি-ই বকরীর দুধ দোহন করেছেন।' আবু মা'বাদ স্ত্রীর কাছে সেই লোকের বর্ণনা শুনতে চাইলেন। উম্ম মা'বাদ রাসূলুল্লাহকে একবার মাত্র দেখেছিলেন। কিন্তু যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তা এখন পর্যন্ত রাসূলুল্লাহর সম্পর্কে দেওয়া শ্রেষ্ঠ বর্ণনা।

'আমি তাঁকে দেখেছি, উজ্জ্বলদীপ্ত চেহারা, সুন্দর তাঁর গড়ন, সুদর্শন তাঁর মুখশ্রী, ছিপছিপে তাঁর শরীর। মাথাটা খুব ছোট নয়, বরং দেখতে তিনি অভিজাত এবং সুপুরুষ। চোখদুটো তাঁর ঘনকালো, পাঁপড়িগুলো টানাটানা। বুদ্ধিদীপ্ত তাঁর চেহারা, ভরাট তাঁর কণ্ঠস্বর। ভ্রু-যুগল উঁচু আর ধনুকের মতো বাকাঁনো, চুলগুলো পরিপাটি। তাঁর গ্রীবা বিস্তৃত এবং দাড়ি বেশ ঘন। তাঁর গাম্ভীর্য তাঁর আত্মমর্যাদা প্রকাশ করে, তাঁর কথা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহন করে। তাঁর কথাগুলো মনোমুগ্ধকর আর দৃঢ়, চটুল কিংবা ফেলনা নয়। তাঁর প্রতিটি শব্দ যেন সুতোয় বাঁধা মুক্তোর মতো মসৃণ। দূর থেকে তাঁকে দেখতে যেমন উজ্জ্বল আর

আকর্ষণীয়, কাছ থেকে দেখলেও তাঁকেই সবচেয়ে সুদর্শন লাগে। উচ্চতায় তিনি মাঝারি। খুব লম্বাও নন আবার খাটোও নন। বাকি দুইজনের মাঝে তিনি উঁচু বৃক্ষের শাখার মতো, তবে তিনজনের মাঝে তিনিই সবচে সুন্দর। তিনি ছিলেন তাঁর সঙ্গীদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। তিনি যখন কথা বলতেন, তারা মন দিয়ে শুনতো, তিনি যখন কিছু আদেশ দিতেন তা পালন করতে তারা ছুটে যেতো। তিনি কখনও মুখ গোমড়া করেননি। আর কেউ একবারও তাঁর কথার বিরোধিতা করেনি।

বর্ণনা শুনে আবু মা'বাদ বললেন, 'এই লোকটি নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ। তাঁকে তো কুরাইশরা খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমি যদি তাঁর সাথে দেখা করতে পারতাম তাহলে তাঁর কাছে মুসলিম হওয়ার স্বীকারোক্তি দিতাম।' তাঁর স্ত্রী উম্ম মা'বাদ আগেই রাসূলুল্লাহর * কাছে ইসলাম গ্রহণের স্বীকারোক্তি দিয়ে মুসলিম হয়েছিলে

মদিনার উপকণ্ঠে রসুল(সা:) নতুন যুগের সূচনা-

রাসূলুল্লাহ এবং আবু বকর গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমে উত্তপ্ত মরুভূমির মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। গাইড তাদেরকে পথ দেখিয়ে উপত্যকার কাছে নিয়ে যায়। সেখান থেকে কুবায় বনু আমর ইবন আউফের কাছে নিয়ে যায়। সেদিন ছিল সোমবার, ১২ই রবিউল আউয়াল। গনগনে রৌদ্রতপ্ত দুপুরে সূর্য তখন প্রায় মাথার উপর। রাসূলুল্লাহর * সাথে দেখা করার আশায়, তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আনসারগণ প্রতিদিন সকালে মদীনার বাইরে যেতেন। কিন্তু রোদের তাপ বেড়ে গেলে তাঁরা ঘরে ফিরে আসতে বাধ্য হতেন। অন্যান্য দিনের মতো সেদিনও তাঁরা সকাল সকাল বাইরে গিয়ে রাসূলুল্লাহর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। রাসূলুল্লাহর দেখা না পেয়ে তাঁরা সেদিনের মতো ফিরে যান। এর মধ্যে এক ইহুদি মদীনার উঁচু দালানের উপর থেকে দেখতে পেল যে, সাদা জামা পরিহিত রাসূলুল্লাহ ও আবু বকর মদীনার দিকে হেঁটে আসছেন। ওই ইহুদি তাদের দেখতে পেয়ে চিৎকার করে উঠলো, 'হে আরবের লোকেরা। তোমরা যার জন্য এতদিন ধরে অপেক্ষা করছিলে তিনি চলে এসেছেন!' এ কথা শুনে আনসারগণ তাদের অস্ত্র নিয়ে রাসূলুল্লাহকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য ছুটে যায়। অস্ত্র নিয়ে বরণ করাই ছিল তাদের রীতি। এটা দিয়ে আরো বোঝায় যে, আগত অতিথিকে তারা নিরাপত্তা দিতে ইচ্ছুক। আরবের কিছু গোত্রে এই ঐতিহ্য এখনো বিদ্যমান।

রাসূলুল্লাহ ও আবু বকর মদীনার বাইরে কুবা নামক জায়গায় আসামাত্র আনসারগণ তাদেরকে অভ্যর্থনা জানানো শুরু করেন। রাসূলুল্লাহ কুবাতে চৌদ্দ দিন ছিলেন, এর মধ্যে তিনি সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এটিই ছিল ইসলামের ইতিহাসে প্রথম মসজিদ। রাসূলুল্লাহ যে বাড়িতে ছিলেন সেটিকে বলা হত 'ব্যাচেলর হাউস' বা 'কুমারবাড়ি', কারণ ওই বাসার সবাই অবিবাহিত ছিলেন। 66 সেটা ছিল সাদ ইবন খাইসামার বাড়ি। তাঁর সাথে অনেকেই দেখা করতে আসতো আর তিনি চাননি মানুষজনের আসা-যাওয়ার কারণে সেই পরিবারে কোনো অসুবিধা হোক। তাই তিনি এই বাড়িতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ সেখানে থাকাকালীন সময়ে মদীনায় প্রবেশের জন্য অনুমতি চেয়ে সংবাদবাহক পাঠান। এর প্রতিউত্তরে তাঁরা রাসূলুল্লাহর জন্য একটি বিরাট প্রতিনিধি দল পাঠান। এই প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহর সাথে দেখা করে বলেন, 'আসুন, আপনি এখানে নিরাপদ এবং আপনাকে মান্য করা হবে।' রাসূলুল্লাহ মদীনাতে নিছক অতিথি হিসেবে যাননি বরং তিনি একজন নেতা হিসেবে সেখানে গিয়েছেন।মদীনার আকাশে নতুন চাঁদ: তালা'আল বাদরু 'আলাইনা

রাসূলুল্লাহর মদীনাতে আগমনের দিনটি ছিল একটি চমৎকার দিন। চারদিকে সাজ সাজ রব, রাসূলুল্লাহর প্রবেশ উপলক্ষ্যে ব্যাপক প্রস্তুতি। মানুষজন তাঁকে স্বাগত জানাচ্ছিল, পুরুষেরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রাস্তায় নেমে আসে, আবিসিনিয়ানরা তাদের বর্শা নাচাচ্ছিল। মহিলারা ছাদে দাঁড়িয়েছিল আর রাসূলুল্লাহকে একনজর দেখার জন্য বাচ্চারা রাস্তায় নেমে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহকে তারা বরণ করে নেয় চমৎকার একটি নাশীদ গেয়ে, চৌদ্দশ বছর পরেও মুসলিমদের কাছে অতি প্রিয় একটি সুর।

তালা' আলা বাদরু আলাইনা মিন সানিয়াতিল ওয়াদা ওয়াজাবাশ শুকরু আলাইনা মাদা 'আ লিল্লাহি দাগ

আনাস ইবন মালিক বলেন, 'আমি দুটি দিন দেখেছি। একটি হচ্ছে আমার জীবনের সবচেয়ে উজ্জ্বল ও উত্তম দিন। এই দিনটি হলো রাসূলুল্লাহ ও আবু বকরের মদীনায় আগমনের দিন। অন্যদিনটি হলো আমার জীবনের সবচেয়ে অন্ধকার ও দুঃখের দিন। সেটি রাসূলুল্লাহর মৃত্যুর দিন। আমি শুধু এই দুটি দিনই দেখেছি।' রাসূলুল্লাহর আগমনের আনন্দে বৃদ্ধ লোকরাও সেদিন ঘর থেকে বের হয়ে এসে ছাদের উপর দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করতে

থাকেন, 'কোন সে জন? কোন সে জন?' আনাস ইবনে মালিকের ভাষায়, 'এমন দৃশ্য আমি এর আগে কোনোদিন দেখিনি!'

মদীনার প্রথম দিনগুলো:

মদীনার প্রত্যেকেই চাইছিল রাসূলুল্লাহ যেন তাদের বাড়িতে থাকেন। তারা প্রত্যেকে তাদের বাসায় থাকার জন্য নবীজিকে আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু রাসূলুল্লাহ বনু নাজ্জারের সাথে থাকতে চান। কারণ বনু নাজ্জারের সাথে তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। হাশিম বনু নাজ্জারের একজন মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। বনু নাজ্জার এসেছিল খাযরাজ থেকে, সে হিসেবে মদীনার বনু নাজ্জার ছিল রাসূলুল্লাহর । মায়ের গোষ্ঠী। রাসূলুল্লাহ বনু নাজ্জারের সাথে থাকার ইচ্ছার কথা সবাইকে জানিয়ে দেন। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করেন যে, তাঁর কাছাকাছি বনু নাজ্জারের কার ঘর আছে। আবু আইয়ুব আল আনসারী জানান তাঁর ঘর কাছাকাছি আছে। এরপর আবু আইয়ুব আনসারী রাসূলুল্লাহকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যান। আবু আইয়ুব আনসারী রাসূলুল্লাহকে উপরের ঘরে থাকার জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন কিন্তু রাসূলুল্লাহ * নিচের ঘরেই থাকতে চাইলেন। অনেকেই রাসুলুল্লাহর সাথে দেখা করতে আসতেন, এক্ষেত্রে তাঁর নিচ তলায় থাকার সিদ্ধান্ত সবার জন্যই সুবিধাজনক ছিল। অবশেষে আবু আইয়ুব রাজি হন। আবু আইয়ুব বলেন, 'একদিন আমাদের একটা পানির পাত্র মেঝেতে পড়ে গিয়েছিল। আমরা খুব চিন্তায় পড়ে গেলাম, এই পানি মেঝে চুইয়ে যদি রাসূলুল্লাহকে ঞ্জ ভিজিয়ে দেয়, তখন কী হবে? আমাদের একটিমাত্র কম্বল ছিল, আমরা সেই কম্বল মেঝের পানি শুকানোর জন্য ব্যবহার করলাম। সে রাতে আমি আর আমার স্ত্রী কম্বল ছাড়াই ঘুমালাম। '৬৪ এই ঘটনাটি দেখিয়ে দেয়, রাসূলুল্লাহর সামান্যতম কষ্টও সাহাবারা সহ্য করতে পারতেন না। তাঁরা নিজেরা কম্বল ছাড়া ঘুমিয়েছেন, কিন্তু আল্লাহর রাসূলের গায়ে এক ফোঁটা পানি তাঁরা পড়তে দেননি।

যাইদ ইবন সাবিত বলেন, 'আমিই সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহকে উপহার দিয়েছিলাম। সেটি ছিল দুধ, মাখন ও রুটি দিয়ে পরিপূর্ণ বড় একটি কাঠের বাটি। রাসূলুল্লাহ তখন আবু আইয়ুবের বাসায়, আমি নিজে সে উপহার তাঁর কাছে নিয়ে যাই। আমি নবীজিকে জানাই যে, আমার মা তাঁর জন্য এ খাবার পাঠিয়েছেন। তিনি বললেন, 'আল্লাহ তোমার মায়ের মঙ্গল করুন।' এরপর তিনি তাঁর সঙ্গীদেরকে ডেকে সবাই একসাথে খেলেন। এরপর খাবার নিয়ে আসেন

সাদ ইবন উবাদা। তিনি আনেন মাংসের ঝোল আর রুটি। আবু আইয়ুবের বাড়িতে রাসূলুল্লাহ সাত মাস থেকেছিলেন। এই সাত মাস ধরে প্রতিদিন সন্ধ্যায় কেউ না কেউ, অন্তত তিন-চার জন রাসূলুল্লাহর সাথে খাবার নিয়ে দেখা করতে আসতো।' এই সাহাবীদের অধিকাংশই ছিলেন দরিদ্র। কিন্তু তারপরও তাঁরা রাসূলুল্লাহর জন্য নিজেদের খাবারটুকু পর্যন্ত দিয়ে দিতেন। রাসূলুল্লাহকে তাঁরা এতটাই ভালবাসতেন।

আল্লাহ আযযা ওয়াজাল এই অসাধারণ হিসেবে নির্ধারণ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ মানুষগুলোকে রাসূলুল্লাহর আনসার তাঁর জীবনের শেষভাগে বলেছেন, 'যদি না হিজরত করতাম, তাহলে আমি নিজেকে আল-আনসারের একজন সদস্য হিসেবেই ভাবতাম।'

মদিনার আর্থ সামাজিক কাঠামো

সে সময় মদীনাতে পাঁচটি গোত্র ছিল। সেগুলোর মধ্যে তিনটি ছিল ইহুদিদের গোত্র এবং দুইটি ছিল আরবদের গোত্র। বনু নাযির, বনু কুরায়যা ও বনু কায়নুকা – এগুলো ছিল ইহুদি গোত্র। বনু কায়নুকার বসবাস ছিল মদীনার কেন্দ্রে, তারা অলংকারের ব্যবসা করতো। আগে তারা মদীনার উপকণ্ঠে বসবাস করতো। কিন্তু অন্যান্য ইহুদিদের সাথে তাদের যুদ্ধ হওয়ার পর তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দেওয়া হয়। বনু নাযির ও বনু কুরায়যা উভয়ই মদীনার প্রান্তে বসবাস করতো। তাদের ছিল ৫৯টি দুর্গ। তাদের ছিল ২০০০ সৈন্যবিশিষ্ট সামরিক বাহিনী। অন্যদিকে আল-আওস ও আল-খাযরাজ ছিল আরব গোত্র। তাদের সামরিক বাহিনী ছিল ৪০০০ সৈন্যবিশিষ্ট।

এদের মধ্যে একটি গোত্র মদীনার উত্তরে বসবাস করতো আর অন্য গোত্রটি দক্ষিণে। মদীনা ছিল অনেকগুলি এলাকার সমন্বয়ে গঠিত। একেক এলাকায় ছিল একেক গোত্রের বসবাস। মদীনাবাসীর জীবিকা ছিল মূলত কৃষিনির্ভর। মদীনায় ছিল খেজুরের বাগান। সেগুলো চাষ করার জন্য কৃষকদের টাকা প্রয়োজন হতো, ফলনের সময় হলে তারা সে টাকা পরিশোধ করতো। ইহুদি গোত্রগুলো তাদেরকে সুদের বিনিময়ে এই টাকা ধার দিত। এ কারণে আরব ও ইহুদিদের মধ্যে কিছু তিক্ততা বিদ্যমান ছিল।

এই ছিল মোটামুটিভাবে ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে মদীনার অবস্থা। ইসলাম আসার পর মদীনার বহুমাত্রিক সমাজে মুশরিক, ইহুদিদের সাথে নতুন যোগ হয় মুসলিমরা। তাই রাসূলুল্লাহকে খুব সাবধানতার সাথে সবাইকে সামাল দিতে হয়েছে।

কিন্তু মদীনার কিছু লোক রাসূলুল্লাহর আগমনে খুশি হতে পারেনি। বিভিন্ন ধর্ম ও জাতিগোষ্ঠী একসাথে থাকার কারণে মদীনার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কিছুটা জটিলতার সৃষ্টি হয়। একবার রাসূলুল্লাহ তাঁর গাধার পিঠে চড়ছিলেন। সে সময় একটি সমাবেশ দেখতে পেয়ে সেখানে গেলেন। সেই সমাবেশে আরব, মুসলিম, অমুসলিম ও ইহুদি- সবাই ছিল। তাঁর গাধাটি যেতে যেতে ধূলো উড়োচ্ছিল। তখন আবদুল্লাহ ইবন উবাই বললো, 'যান তো, আপনার ধূলো আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নিন।'

আবদুল্লাহ ইবন উবাই পরবর্তীতে মুনাফিকদের নেতা হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ তাঁর কথায় কোনো প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে উপস্থিত সবাইকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। দাওয়াত দেওয়া শেষ হলে আবদুল্লাহ ইবন উবাই বললো, 'দেখুন, আমাদের সমাবেশে এসে এভাবে বিরক্ত করবেন না। যেখানে উঠেছেন সেখানেই থাকুন আর আপনার এসব গল্প তাদের সাথে করুন যারা আপনার কাছে আসে। আগ বাড়িয়ে আমাদের সাথে এসব গল্প করবেন না।' সাথে সাথে আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা বলে উঠলেন, 'না! আমরা চাই তিনি আমাদের সমাবেশে আসবেন এবং কথা বলবেন।' উপস্থিত লোকেরা চিৎকার-চেঁচামেচি এবং কথা কাটাকাটি শুরু করে দিল। ব্যাপারটা এমন এক পর্যায়ে চলে গেল যেন যুদ্ধ বেঁধে যাবে। অবস্থা বেগতিক দেখে রাসূলুল্লাহ সবাইকে শান্ত করতে লাগলেন, পরে সবকিছু শান্ত হলো।

রাসূলুল্লাহ সাদকে জিজ্ঞেস করলেন, 'সাদ তুমি কি দেখনি আবদুল্লাহ ইবন উবাই কী করেছিল?' সাদ জানতে চাইলেন কী ঘটেছে। রাসূলুল্লাহর কাছে থেকে বিস্তারিত শোনার পর তিনি বললেন, 'আপনি আসার আগে আবদুল্লাহ ইবন উবাইকে তার গোত্রের লোকেরা রাজা হিসেবে প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছিল। এজন্য সে আপনাকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে।' খাযরাজ গোত্র আবদুল্লাহ ইবন উবাইকে তাদের নেতা বানানোর সবরকম প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল কিন্তু রাসূলুল্লাহ আগমনের কারণে সবাই রাসূলুল্লাহকে তাদের শাসক হিসেবে মেনে নেয়। এ কারণে উবাই আর রাজা হতে পারেনি। এরকমই একটি কঠিন জটিল পরিস্থিতিতে মদীনায় আল্লাহর রাসূলের আগমন ঘটে।

ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

চারটি প্রজেক্ট

মদীনায় পৌঁছে রাসূল চারটি প্রজেক্ট হাতে নেন এগুলো হলো:

১) মসজিদ নির্মাণ।

২) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা।

৩) মদীনার বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক কেমন হবে সে ব্যাপারে একটি সুস্পষ্ট দলিল বা সনদ প্রণয়ন।

৪) মুসলিম সেনাবাহিনী গড়ে তোলা।

প্রথম প্রজেক্ট: মসজিদ নির্মাণ

রাসূলুল্লাহ মদীনায় পৌঁছেই প্রথমে মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ নেন। রাসূলুল্লাহ কুবাতে অবস্থানকালেও একই কাজ করেছিলেন। মসজিদ হলো মুসলিমদের শিক্ষাকেন্দ্র। আর এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সবকিছুর আগে মসজিদ নির্মাণের দিকে দৃষ্টি দেন। মক্কায় তিনি দার-উল-আরকামে মুসলিমদের প্রশিক্ষণের কাজ চালাতেন। পরবর্তীতে মদীনায় মসজিদ নির্মাণের মধ্য দিয়ে দার-উল-আরকামের কার্যক্রম ব্যাপকতা লাভ করে। তবে মক্কার দার-উল-আরকাম ছিল একটি গোপন জায়গা। সেখানে মুসলিমরা সালাত আদায় করতে আসত এবং কুরআন শিক্ষা করতো। কিন্তু মদীনাতে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ায় আর গোপনীয়তার প্রয়োজন ছিল না। তাই নির্মিত হয় 'মসজিদ-ই-নববী।'

মসজিদের জন্য জায়গা নির্বাচন

রাসূলুল্লাহ তাঁর উটে চড়ছিলেন আর লোকজন যার যার দিকে উটটিকে টানছিল। তখন রাসূলুল্লাহ বললেন, 'এটিকে ছেড়ে দাও, কারণ এটি আল্লাহর নির্দেশে চলছে।' উটটি মদীনার রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলো। এটি থামলো একটি শুকনো খেজুরের মাঠে। সেই মাঠের মালিক ছিল দুই এতিম ছেলে। উটটি থামলে রাসূলুল্লাহ বললেন, 'এটিই হলো আমাদের মসজিদের জায়গা।' অতঃপর সেই জায়গাটি মসজিদের জন্য এবং রাসূলুল্লাহর থাকার জায়গা হিসেবে নির্বাচন করা হলো।

রাসূলুল্লাহ জায়গাটি এতিম বালকদের কাছ থেকে কিনে নিতে চাইলেন। কিন্তু তারা বিক্রি করতে রাজি হলো না বরং তায়া সেই জায়গাটি কোনো টাকা ছাড়াই রাসূলুল্লাহকে দিতে চাইল। অবশেষে মসজিদ-ই-নববীর নির্মাণ কাজ শুরু হলো। মসজিদের দেয়াল তৈরি করা হয়েছিল কাদামাটির ইট দিয়ে আর ছাদ নির্মাণ করা হয়েছিল তালপাতা দিয়ে। বৃষ্টি হলে পাতা চুইয়ে বৃষ্টির পানি তাদের মাথায় পড়তো, আর মেঝেতে ছিল শুধু বালি। মসজিদটি ছিল খুবই সাদামাটা কিন্তু এটি হলো ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে বরকতময় মসজিদ। এখানেই মুসলিমদের প্রথম ও সেরা প্রজন্মটি দ্বীনের শিক্ষা লাভ করেন। রাসূলুল্লাহ নিজেও সাহাবাদের সাথে মসজিদ নির্মাণে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজ কাঁধে ইট বহন করেছিলেন।

আযানের সূচনা:

মসজিদ-ই-নববীর নির্মাণকাজ পুরোপুরি শেষ হওয়ার পর আলোচনা শুরু হয় কীভাবে সবাইকে সালাতের দিকে আহ্বান করা যায়। কেউ পরামর্শ দিল, খ্রিস্টানদের মতো ঘণ্টা ব্যবহার করা অথবা মদীনায় ইহুদিরা যেভাবে হর্ন ব্যবহার করতো সেরূপ কিছু করা। কোনো প্রস্তাবই রাসূলুল্লাহর ৫ মনঃপুত হলো না। এমন সময়ে রাসূলুল্লাহর একজন সাহাবী, আবদুল্লাহ ইবন যাইদ একটি স্বপ্ন দেখলেন। তিনি দেখলেন, একটি লোক একটি ঘণ্টা বহন করছে। তা দেখে তিনি ওই লোকের কাছে ঘণ্টাটির দাম জানতে চান। লোকটি আবদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কেন ঘন্টাটি চাও?' আবদুল্লাহ স্বপ্নের মধ্যে উত্তর দিলেন যে, তিনি এটা দিয়ে মানুষকে সালাতের দিকে আহ্বান করবেন। লোকটি উত্তরে বললো যে, তার কাছে দেওয়ার মতো এর চেয়েও ভালো কিছু আছে। আবদুল্লাহ জানতে চাইলেন সেটি কী। লোকটি তাঁকে বলতে বললো,

আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার।

আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার!

আশ-হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ

আশ-হাদু আল্লা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ

আশ-হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ

আশ-হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ

হাইয়্যা 'আলাস-সালাহ

হাইয়্যা 'আলাস-সালাহ

হাইয়্যা 'আলাল-ফালাহ

হাইয়্যা 'আলাল-ফালাহ

আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ

আবদুল্লাহ ইবন যাইদ রাসূলুল্লাহকে এই স্বপ্নের কথা জানান। স্বপ্নের বর্ণনা শুনে রাসূলুল্লাহ বুঝতে পারলেন যে এই স্বপ্ন সত্য স্বপ্ন। এরপর তিনি আবদুল্লাহকে বললেন বিলালকে এই আযান দেওয়া শিখিয়ে দিতে। বিলালের কণ্ঠস্বর ছিল খুব জোরালো আর সুন্দর। আযানের শব্দ শুনতে পেয়ে উমার দ্রুত মসজিদে আসেন। তিনি বললেন যে, তিনিও স্বপ্নে এই কথাগুলো শুনেছেন। একাধিক ব্যক্তি একই স্বপ্ন দেখার অর্থ হলো স্বপ্নটি সত্য।

সেই থেকে আযান ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ প্রতীকসমূহের একটি। যে সব জায়গায় প্রকাশ্যে আযান দেওয়া হয়, সেসব জায়গায় ইসলাম ও মুসলিমদের উপস্থিতি আছে এমনটা ধরে নেওয়া হয়।

মসজিদে নববীর একটি খুতবা:

মসজিদে নববী স্থাপিত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ এদিন সবার উদ্দেশ্যে খুতবা দেন। খুতবায় তিনি বলেন,

'ভাইয়েরা, ভালো কাজে এগিয়ে যাও। নিজেদের জন্য ভালো আমল আল্লাহর কাছে জমা করো। জেনে রাখো, আল্লাহর শপথ! তোমাদের প্রত্যেকের জীবনেই মৃত্যু এসে হাজির হবে। সেদিন তোমরা তোমাদের যাবতীয় সম্পদ পিছনে ফেলে যাবে। তোমাদের পালিত পশুগুলো প্রতিপালকহীন অবস্থায় পড়ে থাকবে। সেদিন তোমাদের আর আল্লাহর মাঝে কোনো দোভাষী থাকবে না, কোনো পর্দা থাকবে না। সেদিন তোমাদের রব তোমাদের প্রত্যেককে না, কোনো পর্দা থাকবে না। সেদিন তোমাদের রব তোমাদের প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করবেন, 'তোমাদের কাছে কি আমার রাসূল যায়নি? সে কি তোমাদের কাছে আমার বার্তা পৌঁছে দেয়নি? আমি তোমাকে অর্থবিত্ত দিয়েছি, আমার নি'আমতে তোমাকে পরিপূর্ণ করে রেখেছি। কিন্তু তুমি নিজের জন্য, এই দিনের জন্য কী আমল পাঠিয়েছো?' সেদিন প্রত্যেকে তার ডানে বামে অসহায়ের মতো তাকাবে কিন্তু কিছুই দেখতে পাবে না। অতঃপর সামনে তাকিয়ে সে দেখতে পাবে জাহান্নামের আগুন!

তাই তোমাদের সাধ্যানুযায়ী নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা

করার চেষ্টা করো। যদি একটি খেজুরের অংশবিশেষ দান করা তোমার সাধ্যে কুলায় তবে তাই করো। যদি এটুকু করারও সামর্থ্য না থাকে তবে দুটি ভালো কথা বলো, ভালো আচরণ করো। জেনে রেখো, প্রত্যেকটি ভালো কাজকেই আল্লাহ তাআলা দশ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত বর্ধিত করেন। আল্লাহর নিরাপত্তা, মমতা আর বারাকাহ তোমাদের ঘিরে থাকুক।

আহলুস-সুফফা:

যখন কিবলা উত্তর দিক, অর্থাৎ জেরুসালেম বরাবর ছিল তখন মসজিদে নববীর পাশে ছায়ার জন্য একটি ছাউনি তৈরি করা হয়। সেই ছাউনিটি আস-সুফফা নামে পরিচিত ছিল। ইবন হাজর আস-সুফফা সম্পর্কে বলেছেন যে, মসজিদ-ই-নববীর পিছনের জায়গাটি আস-সুফফা নামে পরিচিত ছিল। এখানে ছিল একটি ছাউনি। এটি মূলত সেসব মানুষদের জন্য তৈরি করা হয়েছিল যাদের কোনো পরিবার বা থাকার জায়গা ছিল না। সেখানে যারা থাকতেন তাদের বলা হতো আহলুস-সুফফা। আবু হুরাইরা একজন আহলুস-সুফফা ছিলেন। তিনি বলেছেন, আস-সুফফার অধিবাসীরা ছিলেন ইসলামের অতিথি। তাদের দেখাশোনার জন্য কোনো পরিবার অথবা সম্পদ ছিল না। তাই তাঁরা সেখানে থাকতেন। যারা সেখানে থাকতেন তাদের সবাই যে অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের কারণে নিতান্তই বাধ্য হয়ে থাকতেন বিষয়টি তেমন নয়। কেউ কেউ স্বেচ্ছায় আহলুস-সুফফায় থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

এমন একজন সাহাবী ছিলেন আবু হুরাইরা। তাঁর সম্পদ ছিল কিন্তু তিনি পড়াশোনা করে দিন কাটাতে ভালোবাসতেন। তাই তিনি আস-সুফফায় অন্যান্যদের সাথে থাকতেন। আবু হুরাইরা প্রথমদিকের সাহাবী ছিলেন না। তিনি অনেক পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তারপরেও তিনি মুহাজির ও আনসারদের থেকে অনেক বেশি হাদীস বর্ণনা করেছেন। কীভাবে তা সম্ভব হলো? এই ব্যাপারে আবু হুরাইরা বলেছেন, মুহাজিররা যখন ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন তখন তিনি ক্ষুধা পেটে রাসূলুল্লাহকে অনুসরণ করতেন। তাঁর তেমন কিছুই ছিল না কিন্তু তারপরও তিনি রাসূলুল্লাহর সাথে সাথে থাকতেন। মুহাজিররা কিছু ভুলে গেলে তিনি সেগুলো মনে রাখতেন। অন্যদিকে আনসাররা তাদের ক্ষেতের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকত। আনসাররা কিছু ভুলে গেলে তিনি সেগুলো মনে করিয়ে দিতেন।

আবু হুরাইরা তাঁর দ্বীনি পড়াশুনার জন্য 'ফুল টাইম' বরাদ্দ রেখেছিলেন বলেই রাসূলুল্লাহর হাদীস নিয়ে পর্যালোচনা করার মতো সময় পেতেন। তিনি রাতের সময়কে তিন ভাগে ভাগ করতেন: এক অংশ ছিল ঘুমানোর জন্য, আরেক অংশ ইবাদতের জন্য বরাদ্দ এবং অন্য অংশে সারাদিন তিনি রাসূলুল্লাহর যত হাদীস শুনেছেন তা নিয়ে পর্যালোচনা করতেন। যখন অন্যান্য মুহাজির ও আনসারগণ ব্যবসা ও ক্ষেতের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, তখন

আবু হুরাইরা আহলুস-সুফফাতে সময় দিতেন এবং রাসূলুল্লাহর সাথে থেকে সারাদিন পড়াশোনা করতেন।

আস-সুফফায় যারা থাকতেন তাদের ভরণপোষণের একটি উৎস ছিল রাসূলুল্লাহর পাঠানো সাদাকাহ। রাসূলুল্লাহ ও কোনো সাদাকাহ পেলে সেখানে পাঠিয়ে দিতেন। তিনি কোনো উপহার পেলে নিজের জন্য কিছু রেখে বাকিটুকু সুফফাবাসীদের জন্য পাঠিয়ে দিতেন। তিনি ধনী সাহাবীদের উৎসাহ দিতেন যেন তাঁরা আস-সুফফার অধিবাসীদের নিজেদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ জানায়।

রাসূলুল্লাহ বলেছেন, 'যদি কারো কাছে দুইজনের জন্য যথেষ্ট খাবার থাকে তাহলে সে যেন সেই খাবারে তৃতীয়জনকে আহ্বান করে। যদি কারো কাছে চারজনের জন্য যথেষ্ট খাবার থাকে তাহলে সে যেন আরো এক বা দুইজনকে সেই খাবারে শরীক করে।'' যেসব সাহাবা আহলুস-সুফফাদের নিমন্ত্রণ করতেন তাঁরা কোটিপতি ছিলেন এমন নয়। কিন্তু রাসূল তাদের বলেছেন যদি তাদের কাছে দুইজনের যথেষ্ট খাবার থাকে তাহলে যেন তৃতীয় আরেকজনকে নিয়ে খায়।

উদারতা ও অন্যের জন্য নিজের জিনিস ছেড়ে দেওয়া এই গুণগুলো ইসলামের একেবারে প্রাথমিক যুগ থেকে অনুশীলিত হয়ে আসছে। ইসলামের প্রথম প্রজন্মের মানুষগুলোর মধ্যে যে বন্ধন দেখা যায় তা আর কোনো যুগে দেখা যায় না। এতিম, গরিব, অভাবীদের প্রতি দয়া দেখানো, অতিথির সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করা- এ সকল ব্যাপারে আল্লাহ আযযা ওয়াজাল কুরআনের অনেক আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। এ কাজগুলো কিন্তু ইবাদাতেরই অন্তর্ভুক্ত। কুরআন নাযিলের শুরু থেকে এসব ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। মুসলিম হওয়ার সাথে অন্যের জন্য ত্যাগ স্বীকার জড়িত এবং এই ইবাদাত আল্লাহ তাআলার অনেক পছন্দের একটি ইবাদাত।

ফাতিমা ছিলেন রাসূলুল্লাহর মেয়ে। রাসূলুল্লাহ তাঁর এই মেয়েকে খুবই ভালোবাসতেন। ফাতিমা ঘরের সমস্ত কাজ নিজ হাতে করতেন, তাঁর হাতে ফোস্কা পড়ে গিয়েছিল। স্বামী আলী ইবন আবি তালিব তাঁকে জানালেন যে, রাসূলুল্লাহর হাতে কিছু দাস এসেছে, ফাতিমা যেন তাঁর পিতার কাছে গিয়ে একজন দাসের জন্য সুপারিশ করেন। ফলে, ফাতিমা তাঁর

পিতার কাছে গিয়ে একজন দাসের জন্য অনুরোধ করলেন। রাসূলুল্লাহ বললেন, 'আমি তোমাকে কোনো দাস দিতে পারছি না, কারণ আমি সুফফাবাসীদের খালি পেটে থাকতে দিতে পারি না। তাদের জন্য খরচ করার মতো টাকা আমার কাছে এখন নেই। আমি এই দাসদের বিক্রি করে দিব আর সেই টাকা তাদের জন্য ব্যয় করা হবে।' এ থেকে বোঝা যায় রাসূলুল্লাহ আহলুস- সুফফার জন্য কত চিন্তিত ছিলেন।

দ্বিতীয় প্রজেক্ট: মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা

"আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমরা সে নিয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা আল্লাহ তোমাদেরকে দান করেছেন। তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু, অতঃপর আল্লাহ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে, এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ। তোমরা অবস্থান করছিলে এক অগ্নিকুন্ডের পাড়ে, অতঃপর তা থেকে তিনি তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। এভাবেই আল্লাহ নিজের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা হিদায়েত প্রাপ্ত হতে পার।" (সূরা আল ইমরান, ৩: ১০৩)

"আর প্রীতি সঞ্চার করেছেন তাদের অন্তরে। যদি আপনি যমীনের সব কিছু ব্যয় করে ফেলতেন, তবুও তাদের অন্তরে প্রীতি সঞ্চার করতে পারতেন না। কিন্তু আল্লাহ তাদের মনে প্রীতি সঞ্চার করেছেন। নিঃসন্দেহে তিনি পরাক্রমশালী, সুকৌশলী।" (সূরা আল-আনফাল, ৮: ৬৩)

এখানে আল্লাহ আযযা ওয়াজাল রাসূলুল্লাহকে বলছেন, মুসলিমদের অন্তরে একে অপরের জন্য যে ভালোবাসা, তা আল্লাহ তাআলা নিজগুণে তৈরি করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ । যদি চাইতেন, দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ দিয়েও এই কাজটি করতে পারতেন না। এটা একমাত্র আল্লাহরই ইচ্ছা। তাঁরা কেউ কাউকে চিনতেন না, কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই। তা সত্ত্বেও শুধুমাত্র একই দ্বীনের অনুসারী হওয়ার কারণে যে ভালোবাসা তাদের মধ্যে ছিল তা আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি। তিনিই মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে একে অপরের প্রতি ভালোবাসা দিয়েছেন এবং তাদেরকে পরস্পরের ভাই করে দিয়েছেন।

"যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদীনায় বসবাস করেছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা মুহাজিরদের ভালবাসে। মুহাজরিদেরকে যা দেওয়া হয়েছে তার জন্য এরা তাদের অন্তরে কোন ঈর্ষা অনুভব করে না। নিজেদের

অভাব থাকা সত্ত্বেও নিজেদের ওপর তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়। যারা কার্পণ্য হতে নিজেদের মুক্ত করেছে তারাই সফলকাম।" (সূরা হাশর, ৫৯: ৯)

আল্লাহ আযযা ওয়াজাল আনসারদের অন্তর থেকে যাবতীয় কার্পণ্য দূর করে দিয়েছিলেন। এই আয়াতে যদিও সাধারণ ভ্রাতৃত্ববোধের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু মুহাজির ও আনসারদের মধ্যকার ভ্রাতৃত্ববোধ অন্য পর্যায়ের, অতুলনীয়। আস-সুহাইলি থেকে জানা যায়, কিছু ব্যক্তি বলেছেন যে, এই ভ্রাতৃত্ববোধের সূচনা হয় হিজরতের পাঁচ মাস পরে। আবার কেউ বলেছেন হিজরতের ৯ মাস পরে। অন্যান্যরা বলেছে মসজিদ-ই-নববী নির্মাণের পর পরই এই ভ্রাতৃত্ববোধের সূচনা হয়।

তৃতীয় প্রজেক্ট: মদীনার সনদ বা চুক্তিপত্র

মদীনায় ছিল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বসবাস। এ ধরনের বহুত্ববাদী একটি সমাজে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, আনুগত্য পারস্পরিক বিবাদ ইত্যাদি সাধারণ সমস্যা। এ ধরনের জটিলতা নিরসনে রাসূলুল্লাহ একটি সনদ প্রণয়ন করলেন যাতে এসব বিষয়ে কোনো জটিলতার অবকাশ না থাকে এবং মদীনা একটি স্থিতিশীল রাষ্ট্র হিসেবে পরিচালিত হতে পারে। তিনি এ সনদে বিভিন্ন গোত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক কীরূপ হবে, কোনো বিবাদ হলে কীভাবে তার মীমাংসা হবে, যুদ্ধে কে কার পক্ষ নেবে বা সাহায্য করবে, কারা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত হবে এ বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করলেন।

চুক্তিপত্রের কয়েকটি ধারা এখানে উল্লেখ করা হলো।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

১. এটি নিরক্ষর নবী মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পাদিত। কুরাইশ ও ইয়াসরিবের মু'মিন ও মুসলিমদের মাঝে লিখিত। এটি তাদের জন্যও প্রযোজ্য যারা তাদের অনুসারী, মিত্র এবং সহযোগী।

২. এরা সকলে এক উম্মাত, অন্যদের থেকে আলাদা।

৩. কুরাইশের মুহাজিরগণ তাদের আগের অবস্থায় থাকবে। নিজেদের মাঝে পূর্বের রীতিতে রক্তপণ আদায় করবে এবং নিজেদের বন্দীর মুক্তিপণ বহন করবে। আর তা করবে মু'মিনদের মাঝে স্বীকৃত নীতি ও ইনসাফ অনুসারে।

৪. বনু আউফ তাদের আগের অবস্থায় থাকবে। নিজেদের মাঝে আগের রীতিতে রক্তপণ লেনদেন করবে এবং নিজেদের বন্দীর মুক্তিপণ বহন করবে। আর তা করবে মু'মিনদের মাঝে স্বীকৃত নীতি ও ইনসাফ অনুসারে।

[একই ধারা অন্য কিছু গোত্রের জন্য পুনরাবৃত্তি করা হয়।]

৫. যারা বাড়াবাড়ি করবে, সকল সত্যনিষ্ঠ মুসলিম তাদের বিরোধিতা করবে, যদিওবা তাদের সন্তান হয়।

৬. এক মু'মিন অন্য মু'মিনকে কোনো কাফিরের বদলে হত্যা করবে না এবং কোনো কাফিরকে কোনো মুমিনের বিরুদ্ধে সাহায্য করবে না।

৭. কোনো মুসলিম কাফির কুরাইশদের জানমালের নিরাপত্তা বা আশ্রয় দেবে না

৮. কোনো মু'মিন, যে এই লিপির ধারাগুলো স্বীকার করেছে এবং আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান এনেছে তার জন্য বৈধ নয়, কোনো দুষ্কৃতিকারীকে সাহায্য করা বা তাকে আশ্রয় দেওয়া।

৯. আর যে বিষয়েই তোমাদের মাঝে মতভেদ হবে তা আল্লাহর সমীপে ও মুহাম্মাদের * সমীপে উপস্থাপিত হবে।

১০. বনু আউফের ইহুদিরা মু'মিনদের সাথে এক দলভুক্ত- ইহুদিদের জন্য ইহুদিদের

ধর্ম, মুসলিমদের জন্য মুসলিমদের ধর্ম।

[একই ধারা ইহুদিদের অন্যান্য গোত্রগুলো জন্য পুনরাবৃত্তি করা হয়।]

১১. ইহুদিরা মুহাম্মাদের অনুমতি ছাড়া (যুদ্ধার্থে) বের হবে না।

১২. ইহুদিরা বহন করবে তাদের নিজেদের ব্যয়ভার ও মুসলিমরা তাদের নিজেদের। তাদের কেউ বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে একে অপরকে সাহায্য করবে এবং বিশ্বাসঘাতকতা করবে না।
১৩. মদীনাকে পবিত্র স্থান বলে গণ্য করা হবে।

১৪. এই সনদভুক্ত পক্ষগুলোর মাঝে যদি কোনো সমস্যা বা বিবাদ সৃষ্টি হয়, যা থেকে হানাহানি বেধে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয় তাহলে তার নিষ্পত্তিতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

১৫. নিরাপত্তা দেওয়া যাবে না কুরাইশকে, আর না তাকে যে কুরাইশের সাহায্য করে।

১৬. চুক্তির সকল পক্ষ মদীনায় আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে পরস্পর সাহায্য করব

চতুর্থ প্রজেক্ট: মুজাহিদ বাহিনী গঠন

জিহাদের সূচনা

মাদানী যুগ মানেই জিহাদের যুগ। তাই রাসূলুল্লাহর সময়ে সংঘটিত বিভিন্ন যুদ্ধ সম্পর্কে জানার আগে জিহাদ কী তা বোঝা জরুরি। মাদানী যুগ ছিল ১০ বছর স্থায়ী আর এই অল্প সময়ে রাসূলুল্লাহ নিজে ১৯টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এবং ৫৫টির বেশি সামরিক অভিযান পাঠিয়েছেন। অর্থাৎ এই ১০ বছরের মধ্যে ৭০টিরও বেশি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, বছরে গড়ে ৭টি করে যুদ্ধ। যুদ্ধ মানেই ব্যাপক প্রস্তুতি, অর্থায়ন, অস্ত্রায়ণ এবং সেনাবাহিনীকে সুসংগঠিত করা এই প্রতিটি কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়সাপেক্ষ। এছাড়াও তখনকার প্রযুক্তিতে আকাশপথের ব্যবহার ছিল না তাই একেকটি অভিযান বা যুদ্ধস্থলে পায়ে হেঁটে বা ঘোড়ায় করে পৌঁছাতে এবং সেখান থেকে ফিরে আসতে অনেক সময় লেগে যেতো। এর থেকে বোঝা যায় মদীনার যুগ ছিল কেবলই যুদ্ধের যুগ এবং এই যুদ্ধগুলোর পেছনে অনেক শ্রম, সময় ও অর্থ বিনিয়োগ করতে হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে রাসূলুল্লাহ কেন এসব যুদ্ধের পেছনে এত সময় ও শক্তি ব্যয় করলেন।

জিহাদ নিয়ে আলোচনা করা আরেকটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। তা হলো বর্তমানে জিহাদের ব্যাপারে নানা ধরনের বিতর্ক তৈরি হয়েছে। জিহাদ কী, এর উদ্দেশ্য কী এবং এর পেছনের কারণ কী ইত্যাদি এসব ব্যাপারে অনেক ভুল ধারণা রয়েছে। রাসূলুল্লাহর জীবন দেখলে এই প্রতিটি প্রশ্নের দ্ব্যর্থহীন জবাব পাওয়া সম্ভব।

জিহাদ শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'প্রচেষ্টা', এর মানে হলো 'সংগ্রাম বা চেষ্টা করা'। কিন্তু ইসলামে এ শব্দটি একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ বহন করে। আরবিতে এমন কিছু শব্দ আছে যেগুলোর আভিধানিক অর্থ একরকম কিন্তু ইসলামি পরিভাষায় শব্দগুলোর ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়

রয়েছে। যেমন: আরবি শব্দ 'সালাত' এর আভিধানিক অর্থ হলো 'দুআ'। কিন্তু ইসলামি পরিভাষায় সালাত বলতে দুআ বোঝায় না, বরং বিশেষ একটি ইবাদাত বোঝায় যা মুসলিমরা দৈনিক পাঁচবার আদায় করে থাকে। তেমনিভাবে যাকাত শব্দের অর্থ পবিত্রতা

হলেও ইসলামি পরিভাষায় যাকাত হলো একটি বিশেষ ইবাদাত, বছরান্তে সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ নির্দিষ্ট খাতে দান করা। এভাবেই ইসলাম পুরনো শব্দকে নতুন অর্থে সংজ্ঞায়িত করে। তেমনি জিহাদ শব্দের আভিধানিক অর্থ 'প্রচেষ্টা' হলেও যেকোনো প্রকার প্রচেষ্টাকে, এমনকি হোক তা ইসলামের পথে, তাকে জিহাদ বলে গণ্য করা হয় না। বরং সালাত বা যাকাতের মতো জিহাদ শব্দ দ্বারাও একটি বিশেষ ইবাদাতের কথা বোঝানো হয়। তাই ইসলামি পরিভাষায় শব্দটির অর্থ হলো যারা আল্লাহ তাআলার দ্বীনের বিরুদ্ধাচারণ করে অর্থাৎ যারা আল্লাহর শত্রু তাদের বিরুদ্ধে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করতে যুদ্ধ করা। চারটি সুপ্রতিষ্ঠিত মাযহাবের সংজ্ঞা অনুযায়ী জিহাদ মানে হলো আল্লাহর পথে আল্লাহর বাণীকে সর্বোচ্চ করার জন্য যুদ্ধ করা।

আল্লাহ আযযা ওয়াজালের পথে যুদ্ধ ব্যতীত অন্য সকল যুদ্ধ হলো অন্যায় ও অসত্যের পক্ষে যুদ্ধ। কাজেই ইসলামের দৃষ্টিতে সকল প্রকার রক্তপাত নিষিদ্ধ, শুধু ব্যতিক্রম হলো জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ। এর পক্ষে দলীল হলো,

"যারা ঈমান এনেছে তারা লড়াই করে আল্লাহর রাস্তায়, আর যারা কুফরী করেছে তারা লড়াই করে তাগুতের পথে। সুতরাং তোমরা লড়াই কর শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে। নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল।" (সূরা নিসা, ৪: ৭৬)

এই আয়াতে আল্লাহ আযযা ওয়াজাল সকল যুদ্ধকে দুইভাগে ভাগ করেছেন, একটি যুদ্ধ হলো আল্লাহর পথে ঈমানদারদের যুদ্ধ এবং অপরটি তাগুতের পক্ষে কাফিরদের যুদ্ধ।

কিবলার পরিবর্তন

রাসূলুল্লাহর মদীনায় হিজরতের ১৪ মাস পরে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা ঘটে। তা হলো কিবলার পরিবর্তন। মক্কাতে থাকাকালীন সময়ে কিবলা ছিল জেরুসালেম বরাবর; কিন্তু তখন কিবলা নিয়ে কোনো সমস্যা হয়নি, কারণ মক্কায় থাকাকালীন তিনি জেরুসালেম ও কাবা উভয়কে সামনে রেখে সালাত আদায় করতেন। এভাবে তিনি জেরুসালেম ও কাবা উভয়ের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতে পারতেন। কিন্তু মদীনায় হিজরতের পর

দেখা গেল যে, সেখান থেকে মক্কা ও জেরুসালেমের অবস্থান পরস্পরের বিপরীত। রাসূলুল্লাহ কাবা বরাবর সালাত আদায় করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি আল্লাহকে জিজ্ঞেস করার সাহস পাননি। এরপর আল্লাহ আযযা ওয়াজাল ইবরাহীমের কিবলা অর্থাৎ কাবাকে মুসলিমদের কিবলা বানানোর নির্দেশ দিয়ে আয়াত নাযিল করলেন। এ আয়াতটি মদীনাতে অবতীর্ণ হয়েছিল। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ নতুন কিবলা বরাবর সালাত আদায় করলেন। এরই মধ্যে একজন সাহাবী মদীনার কয়েক মাইল দূরে তাঁর গোত্রকে কিবলা পরিবর্তনের খবরটি জানানোর জন্য বের হয়ে পড়েন। তিনি গিয়ে দেখলেন যে তাঁরা পুরনো কিবলা অর্থাৎ জেরুসালেম বরাবর আসরের সালাত পড়ছে। ওই অবস্থাতেই সেই সাহাবী তাদেরকে বললেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আমি মাত্রই রাসূলুল্লাহর সাথে মক্কা বরাবর সালাত আদায় করেছি।' এ কথা শুনে তাঁরা তৎক্ষণাৎ সালাতের মধ্যেই নিজেদের কিবলা মক্কার দিকে পরিবর্তন করে ফেললো। এ ঘটনা থেকে রাসূলুল্লাহর প্রতি সাহাবিদের প্রবল আনুগত্য যেমন বোঝা যায়, তেমনি বোঝা যায় সেই সমাজে একজন মুসলিমের কথার উপর সবাই কতটা আস্থা রাখত।

কিন্তু এ ঘটনাটি বেশ কিছু বিতর্কের জন্ম দেয়। শুধুমাত্র কিবলা পরিবর্তনের বিষয় নিয়েই আল্লাহ আযযা ওয়াজাল সূরা আল-বাকারাহর ৪০টি আয়াত নাযিল করেছেন। ইবনুল কায়্যিম বলেন যে এটি ছিল আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মুশরিকদের জন্য

একটি পরীক্ষা। কাবা ছিল আরবের মুশরিকদের কিবলা, তাই কিবলার দিক পরিবর্তনের পর তারা রাসূলুল্লাহ সম্পর্কে বলতে শুরু করলো, "তিনি আমাদের কিবলার দিকে ফিরে এসেছেন, এখন তিনি আমাদের ধর্মের দিকেও ফিরে আসবেন।" ইবনুল কায়্যিম আরও বলেন, এই কিবলা পরিবর্তন ছিল মুনাফিকদের জন্যেও একটা পরীক্ষা ছিল যারা বলতো মুহাম্মাদ নিজেই জানে না সে কী করছে; সে বারবার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করছে। কিবলার পরিবর্তন ইহুদিদের জন্যেও একটি পরীক্ষা ছিল। ইহুদিরা জেরুসালেমকে নবীদের কিবলা বলে বিশ্বাস করতো। রাসূলুল্লাহ যখন কিবলা পরিবর্তন করলেন, তখন তারা তাঁর সম্পর্কে বলতে শুরু করলো, 'তিমি পূর্বের নবীদের কিবলা পরিত্যাগ করেছেন এতেই প্রমাণিত হয় যে তিনি আল্লাহর রাসূল নন।' পাশাপাশি এটা মুসলিমদের জন্যও একটি পরীক্ষা ছিল আল্লাহ দেখতে চাইছিলেন রাসূলুল্লাহর অনুসরণে তারা কতোটা দৃঢ়- তারাও কি রাসূলুল্লাহর

সাথে কিবলা পরিবর্তন করছেন কি না। অর্থাৎ এই একটি ঘটনা ছিল মুসলিম-মুশরিক-ইহুদী-মুনাফিক সকলের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে একটি পরীক্ষা।

"এখন নির্বোধেরা বলবে, কীসে মুসলমানদের ফিরিয়ে দিল তাদের ওই কিবলা থেকে, যার উপর তারা ছিল? আপনি বলুনঃ পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে চালান।" (সূরা আল-বাকারাহ, ২: ১৪২)

কাবা, মক্কা কিংবা জেরুসালেম সবকিছুই আল্লাহর সৃষ্টি, আর তাই মুসলিমরা কোন দিক বরাবর দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে তা ঠিক করে দেওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহ আযযা ওয়া জালের, তাই আল্লাহ বলছেন, "পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক আল্লাহ।" ইবনে কাসীর বলেন, 'যদি আল্লাহ তাআলা প্রতিদিন নতুন একটি কিবলা নির্ধারণ করে দেন, তাহলে আমাদেরকে ঠিক সেই কিবলামুখি হতে হবে। আমরা তাঁরই বান্দা এবং তাঁরই অধীনস্থ।'

সামরিক অভিযানের শুরু

গাজওয়া ও সারিয়া:

আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে জিহাদের অনুমতি পাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ পাঠানো শুরু করলেন 'সারিয়া'। সীরাহর বইগুলোতে দু'ধরনের যুদ্ধের কথা এসেছে, একটি হলো সারিয়া ও অপরটি হলো গাযওয়া। বদর বা উহুদের যুদ্ধকে বলা হয় গাযওয়ায়ে বদর বা গাযওয়ায়ে উহুদ; অন্যদিকে আবু উবাইদাহর নেতৃত্বে সামরিক অভিযানকে বলা হয়েছে সারিয়ায়ে আবু উবাইদাহ। পার্থক্য হলো, যেসব অভিযানে রাসূলুল্লাহ অংশগ্রহণ করেননি সেগুলোকে সারিয়া বলা হয় আর রাসূলুল্লাহ নিজে যেসব অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছেন সেগুলোকে বলা হয় গাযওয়া। গাযওয়া বলতে সাধারণভাবে বোঝানো হয় সেসব যুদ্ধ যেগুলোতে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে সেনাদল পাঠানো হয় আর সারিয়া বলতে বোঝানো হয় সেনা অভিযান (Military Raid)।

রাসূলুল্লাহ সর্বপ্রথম যে গাযওয়ায় অংশ নিয়েছেন সেটি হলো গাযওয়াত উল আবওয়া। এই গাযওয়াতে কোনো যুদ্ধ হয়নি। এরপর রাসূলুল্লাহ উবাইদাহ ইবন হারিসের নেতৃত্বে সারিয়া পাঠান। এ দলে ৬০ জন মুহাজির ছিলেন। তাঁরা সবাই পায়ে হেঁটে এ অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা রাতে হটিতেন আর দিনে লুকিয়ে থাকতেন। এ অভিযানে তীর ছোঁড়াছুড়ি হয়েছিল কিন্তু কেউ মারা যায়নি। ইসলামের আবির্ভাবের পর মুসলিমদের পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম যিনি তীর ছুঁড়েছিলেন তিনি হলেন সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস। তিনি বলেছেন, 'আমিই সেই জন যে আল্লাহর রাস্তায় প্রথম তীর নিক্ষেপ করি।'

এরপর হামযা ইবন আবদুল মুত্তালিবের নেতৃত্বে আরেকটি সারিয়া পাঠানো হয়। এ অভিযানে ৩০ জন মুহাজিরকে পাঠানো হয়। এবার তাঁরা উটে চড়ে অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা কুরাইশদের একটি কাফেলা আক্রমণ করার জন্য গিয়েছিলেন। এ কাফেলাতে কুরাইশদের প্রচুর সম্পদ ছিল এবং এর সাথে অনেক রক্ষক ছিল। শেষপর্যন্ত এ অভিযানেও কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি, কেননা সে এলাকায় এক গোত্রনেতার সাথে রাসূলুল্লাহ এবং কুরাইশদের চুক্তি ছিল। কোনো ধরনের মারামারি যাতে না হয় সে ব্যাপারে তিনি লক্ষ্য রেখেছিলেন। এ ঘটনার পর আবু জাহেল তার লোকদের কাছে গিয়ে সতর্ক করে বললো যে, মুহাম্মাদ 'ক্রুদ্ধ সিংহের' ন্যায় তাদের পেছনে লেগেছে, কেননা তাঁকে ও তাঁর সঙ্গীদের মক্কা থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। আবু জাহেল তার লোকদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়ে বললো যে, মুহাম্মাদ তাদের কাফেলা ও তাদের উপর আক্রমণ করার জন্য অপেক্ষা করছে।

আরো একটি গাযওয়া সংঘটিত হয়েছিল যার নাম গাযওয়ায়ে বুয়াত। কুরাইশদের একটি কাফেলা দখল করার জন্য এই অভিযান পরিচালিত হয় কিন্তু কাফেলাটি পাওয়া যায়নি।

গাযওয়াত আল আশিরাতেও একটি কাফেলা আটক করার জন্য সেনাদল পাঠানো হয় কিন্তু সেটিও পাওয়া যায়নি। এরপরে ঘটে সারিয়ায়ে সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস এবং গাযওয়ায়ে বদর উলা। হিজরতের প্রথম দুই বছরের মধ্যেই অভিযানগুলো পরিচালিত হয়।

সারিয়ায়ে নাখলা:

ইসলামের ইতিহাসে এই সারিয়া বেশ তাৎপর্য বহন করে। এই সারিয়ার নেতৃত্বে ছিলেন আবদুল্লাহ ইবন জাহশ। এই সারিয়াতে অল্পসংখ্যক সাহাবীকে তাঁর সাথে পাঠানো হয়, উদ্দেশ্য ছিল কুরাইশদের একটি কাফেলা আক্রমণ করা। অভিযানের আগে রাসলল্লাহ আবদল্লাহ ইবন জাহশের হাতে একটি চিঠি দিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় যেতে বললেন, সেখানে গিয়ে দুইদিন পর চিঠিটি পড়তে বললেন।

রাসূলুল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী আবদুল্লাহ ইবন জাহশ দুইদিন পরে চিঠিটি খুললেন। চিঠিতে রাসূলুল্লাহ নির্দেশ দিয়েছিলেন মক্কা ও তাইফের মধ্যবর্তী একটি জায়গায় যেতে। চিঠিতে আরো লেখা ছিল, অভিযানে প্রেরিত সাহাবীদের মধ্যে যারা স্বেচ্ছায় যেতে চান তাঁরা যেন আবদুল্লাহ ইবন জাহশকে অনুসরণ করেন। অর্থাৎ এই সারিয়াতে অংশ নেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল না, কেউ চাইলে অংশ না নেওয়ারও সুযোগ ছিল। সম্ভবত অভিযানটি বেশ বিপদজনক হওয়ায় এরকম নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

আবদুল্লাহ ইবন জাহশকে যে এলাকায় যেতে বলা হয়েছিল সেটি কাফেরদের ভূখণ্ডের কাছাকাছি ছিল। সেখানে একটি কুরাইশ কাফেলা পাওয়া যাবে, সেটি আক্রমণ করাই ছিল এই সারিয়ার উদ্দেশ্য। এর আগ পর্যন্ত যতগুলো সারিয়া পরিচালিত হয়েছে সেগুলো ছিল মদীনার কাছাকাছি, কিন্তু এবারের বিষয়টি ভিন্ন। মক্কা ও তাইফের মধ্যবর্তী এই জায়গাটি মদীনা থেকে বেশ দূরে হওয়ায় এ অভিযানটি বিপদজনক ছিল। আবদুল্লাহ ইবন জাহশ পত্রে যা লিখা ছিল তা দলের অন্যান্যদের জানিয়ে দিলেন এবং বললেন যে তিনি এই অভিযানে যাবেন এবং যার ইচ্ছা হয় তিনি যেন তাঁকে অনুসরণ করেন। আবদুল্লাহ ইবন জাহশসহ দলের সবার জন্য এ অভিযানটি ঐচ্ছিক ছিল। দলের সবাই আবদুল্লাহ ইবন জাহশ এর সাথে যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তাঁরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার জন্য এতটাই উদগ্রীব ছিলেন যে কেউই দল থেকে বের হননি। তাদের এই অদম্য বাসনাই বলে দেয় তাঁরা দুনিয়ার জন্য যুদ্ধ করতেন না, বরং তাঁরা আল্লাহর জন্যই যুদ্ধ করতেন।

তাঁরা শেষ পর্যন্ত কুরাইশ কাফেলা খুঁজে পেলেন। কাফেলার নিরাপত্তা ব্যবস্থা তেমন একটা শক্তিশালী ছিল না, মাত্র চারজন লোক পাহারায় ছিল। তাঁরা কাফেলার খুব কাছাকাছি চলে

আসলেন, তীরের সীমানার ভেতর কাফেলা চলে আসলো। কিন্তু তখন সাহাবারা একটি ব্যাপার নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেলেন। সেদিন ছিল রজব মাসের শেষ দিন আর চারটি পবিত্র আরবি মাসের একটি হলো রজব। আরবরা এই চারটি পবিত্র মাসে নিজেদেরকে যাবতীয় যুদ্ধবিগ্রহ থেকে বিরত রাখত। তাই তারা ভাবলেন, একদিন পরে আক্রমণ করলেই হয়, পবিত্র মাসে আর যুদ্ধ করতে হবে না। কিন্তু সমস্যা হলো তাঁরা যদি পরদিনের জন্য অপেক্ষা করেন তবে কাফেলা মক্কার পবিত্র সীমানার ভেতরে ঢুকে যাবে, পবিত্র সীমানার ভেতরেও যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ। অর্থাৎ, হয় তাদেরকে পবিত্র মাসের পবিত্রতা লঙ্ঘন করতে হবে, নতুবা মক্কার পবিত্রতা লঙ্ঘন করতে হবে। অবশেষে তাঁরা সেদিনই অর্থাৎ রজব মাসে কাফেলা আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাদের ছোঁড়া তীরের আঘাতে চারজন পাহারাদারের আলহাদরামি নামে একজন মারা গেল, আরেকজন পালিয়ে গেল আর বাকি দুইজনকে কারাবন্দী হিসেবে আটক করা হলো। পুরো কাফেলা মুসলিমদের হাতে চলে আসে। এরপর তাঁরা মদীনায় ফিরে এলেন।

এ ঘটনাটি সবার চায়ের কাপে ঝড় তুললো, সবার মুখে মুখে এই অভিযান নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা। কুয়াইশরা এই সুযোগের হাতছাড়া করতে ভুল করলো না। তারা এই ঘটনাকে পুঁজি করে ব্যাপক হৈ-চৈ লাগিয়ে দিল এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালালো। তারা খুব বড় করে এই কাহিনি প্রচার করতে লাগলো। তারা বলে বেড়ালো মুহাম্মাদ আর তাঁর লোকেরা পবিত্র মাসের রীতি ভেঙেছে। তাঁরা পবিত্র মাসে রক্তপাত করেছে, আমাদের লোকদের বন্দী হিসেবে তুলে নিয়েছে। পবিত্র মাসে আমাদের সম্পদ চুরি করেছে, এই করেছে, সেই করেছে এভাবে তারা এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক শোরগোল তুললো। অভিযানে অংশ নেওয়া সাহাবীরা এই ফিরে এলে রাসূলুল্লাহ তাদেরকে বললেন, 'আমি তো তোমাদেরকে পবিত্র মাসে যুদ্ধ করতে নিষেধ করেছি।

অভিযানে অংশ নেওয়া সাহাবীরা এক কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হলেন। তাঁরা মানসিকভাবে খুব বিপর্যস্ত বোধ করতে থাকলেন। আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারটি কীভাবে বিচার করবেন তা নিয়ে তাঁরা খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এদিকে রাসূলুল্লাহ অভিযানে বন্দী ব্যক্তি ও কাফেলার কোনোকিছু গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালে সারিয়ার সদস্যরা আরও বেশি চিন্তিত হয়ে পড়েন। তাঁরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেখানে গিয়েছিলেন, অথচ তাদের দখলকৃত কাফেলার সম্পদ কেউ গ্রহণ করছে না, বরং সবাই তাদের প্রতি নারাজ।

অন্যদিকে কুরাইশরা এ ঘটনাটির সুযোগ নিচ্ছিল। এরপর সূরা বাকারাহর এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়,

"সম্মানিত মাস সম্পর্কে তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে যে, তাতে যুদ্ধ করা কেমন? বলে দাও এতে যুদ্ধ করা ভীষণ বড় পাপ। আর আল্লাহর পথে প্রতিবন্দুকতা সৃষ্টি করা এবং কুফরী করা, মসজিদে-হারামের পথে বাধা দেয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বহিস্কার করা, আল্লাহর নিকট তার চেয়েও বড় পাপ। আর ধর্মের ব্যাপারে ফিতনা সৃষ্টি করা নরহত্যা অপেক্ষাও মহা পাপ। আর তারা তোমাদের সাথে লড়াই করতে থাকবে, যতক্ষণ না তোমাদেরকে তোমাদের দীন থেকে ফিরিয়ে দেয়, যদি সম্ভব হয়। তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হলো দোযখবাসী। তাতে তারা চিরকাল বাস করবে"। (সূরা বাক্বারাহ, ২: ২১৭)

এই ঘটনার পর আল্লাহর রাসূলের কাছে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল, 'সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করা কি ইসলামের বিধানে আছে?; আল্লাহ তাআলা এই প্রশ্নের জবাবে উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, আবদুল্লাহ ও তাঁর লোকেরা যে কাজ করেছেন অর্থাৎ পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা।

অনেক বড় পাপ।' কিন্তু এরপরেই আল্লাহ তাআলা মুসলিমদেরকে শিখিয়ে দিলেন কীভাবে এই সব ঘটনা সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে হয়।

আল্লাহ তাআলা বললেন, এই সাহাবারা যা করেছেন তা ভীষণ গুনাহের কাজ কিন্তু এরপরই আল্লাহ তাআলা কুফফারদের দ্বারা সংঘটিত বড় বড় অপরাধগুলোর তালিকা তুলে ধরলেন।

প্রথমত, আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। কুরাইশের লোকেরা মানুষকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দিত।

দ্বিতীয়ত, কুফরি করা, এটি হলো আরো একটি বড় গুনাহের কাজ যা কুরাইশের লোকেরা অনবরত করেই যাচ্ছিল।

তৃতীয়ত, মসজিদে-হারামের পথে বাধা দেওয়া। মুসলিমদেরকে তখন মক্কায় যেতে দেওয়া হতো না।

চতুর্থত, সেখানকার অধিবাসীদেরকে বহিষ্কার করা- কুরাইশরা মুহাজিরদের মক্কা থেকে বের করে দিয়েছিল।

এই আয়াতটি সবাইকে পুরো বিষয়টি সঠিকভাবে দেখতে শেখালো। আল্লাহ তাআলা বললেন, আবদুল্লাহ ইবন জাহশ যা করেছিলেন, তা ভুল ছিল, কিন্তু কুরাইশরা ১৩ বছর ধরে যা করে আসছে তা আরো অনেক গুণ বড় অপরাধ।

গাজওয়া বদর-বদর যুদ্ধ

মদিনা থেকে প্রায় ৮০ মাইল দূরের একটি কূপের নাম বদর। এই কূপের নামে সেখানে একটি গ্রামও রয়েছে। তখনকার দিনে সেখানে পানির প্রাচুর্য থাকায় স্থানটির বেশ গুরুত্ব ছিল। এখানেই ইসলামের ইতিহাসের প্রথম সম্মুখযুদ্ধ হয়।

মদিনায় বইতে থাকা ইসলামি বসন্তের হাওয়া মক্কার কাফিরদের বেশ ভাবিয়ে তুলছিল- না জানি কখন তা দমকা হাওয়ায় রূপ নিয়ে তাদের উড়িয়ে নিয়ে যায়; কিংবা তাদের ব্যবসার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই মুসলিমদের চিরতরে নিশ্চিহ্ন করতে তারা সর্বদা সচেষ্ট থাকত। মোটকথা, তাদের গর্ব, অহংকার এবং শক্তির উৎস ছিল শামে তাদের ব্যবসাবাণিজ্য। বিষয়টি মুসলিমরাও আঁচ করতে পেরেছিলেন। ফলে মুসলিমদের জন্য রাজনীতি ও কৌশল হিসেবে কুরাইশদের শক্তির এই উৎস বন্ধ করা জরুরি ছিল।

এ সময় অর্থসংগ্রহ ও যুদ্ধসরঞ্জাম কেনার উদ্দেশ্যে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে মক্কার এক বিশাল বাণিজ্যকাফেলা শামে গিয়েছিল। কুরাইশদের এই বাণিজ্যকাফেলা যখন শাম থেকে ব্যবসা শেষে অস্ত্র নিয়ে ঘরে ফিরছিল, তখন নবিজি এ সম্পর্কে জানতে পেরে দ্বিতীয় হিজরির ১২ রমজান ৩১৪ জন মুহাজির ও আনসার সাহাবিকে নিয়ে তাদের মোকাবিলায়

বেরিয়ে পড়েন। রাওহা নামক স্থানে পৌঁছার পর তাঁরা সেখানে শিবির স্থাপন করেন। কেননা, মুসলিমবাহিনীর কাছে তখন আত্মরক্ষার্থে হামলা করা

*** রাওহা মদিনা থেকে ৪০ মাইল দক্ষিণের একটি জায়গার নাম।

ছাড়া আর কোনো পথ খোলা ছিল না। বিষয়টি আবু সুফিয়ান টের পেয়ে রাস্তা ছেড়ে সমুদ্রের উপকূল ধরে কাফেলা নিয়ে এগিয়ে যান। পাশাপাশি তিনি এক অশ্বারোহীকে দ্রুত মক্কার কুরাইশদের কাছে এটা জানাতে পাঠিয়ে দেন যে, কুরাইশরা যেন নিজেদের পূর্ণ ক্ষমতা ও শক্তি নিয়ে দ্রুত এগিয়ে আসে এবং কাফেলাকে বিপদমুক্ত করে।

এদিকে কুরাইশরা আগ থেকেই মুসলিমদের মূলোৎপাটন করতে বিভিন্ন বাহানা খুঁজছিল। ফলে সংবাদটি জানার সঙ্গে সঙ্গে আবু জাহলের নেতৃত্বে ৯৫০ জন সশস্ত্র যোদ্ধার এক বিশাল বাহিনী মদিনা আক্রমণের জন্য বের হয়। তাদের সঙ্গে ১০০ ঘোড়া এবং ৭০০ উটও ছিল। এ বাহিনীতে কুরাইশের বড় বড় সকল নেতা অংশ নেয়।

সাহাবিদের আত্মত্যাগ :

রাসুল এ বিষয়ে অবগত হলে তিনি সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। এ সময় আবু বকর ও অন্যান্য সাহাবি নিজেদের জানমাল নবিজির খিদমতে সঁপে দেন। অল্পবয়সি হওয়ায় উমায়ের ইবনু ওয়াক্কাসকে যুদ্ধ অংশ নেওয়া থেকে বারণ করলে তিনি কান্না শুরু করেন। ফলে নবিজি তাঁকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দেন।**

এদিকে আনসারদের থেকে খাজরাজের সরদার সাআদ ইবনু উবাদা রা. দাঁড়িয়ে বলেন, 'আল্লাহর কসম, আপনি নির্দেশ দিলে আমরা সমুদ্রেও ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত। *১** এ ছাড়া সহিহ বুখারির বর্ণনায় রয়েছে, তখন মিকদাদ রা. দাঁড়িয়ে বলেন, 'আল্লাহর রাসুল, আমরা আপনার ডানে-বামে, সামনে-পেছনে সব দিক থেকে লড়াই করে যাব।'

রাসুল তাঁদের এসব কথায় অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং সামনে এগিয়ে যেতে নির্দেশ দেন। এরপর সবাই ঐতিহাসিক বদর-প্রান্তরের সন্নিকটে পৌঁছে জানতে পারেন, আবু সুফিয়ান

তাঁর বাণিজ্যকাফেলা নিয়ে এখান থেকে অন্যদিকে চলে গেছেন এবং কুরাইশেরই একটি বিশাল সেনাবহিনী মাঠের অন্য প্রান্তে শিবির স্থাপন করেছে। আবু সুফিয়ানের বাণিজ্যকাফেলা নিরাপদে চলে যাওয়ার পরও আবু জাহল তার লোকজনকে যুদ্ধ স্থগিত না করতে কুপরামর্শ দেয়।

মুসলিমরা তাদের এমন মনোভাব বুঝতে পেরে সামনে অগ্রসর হন এবং দেখতে পান, কুরাইশবাহিনী ময়দানের এমন জায়গায় অবস্থান নিয়েছে, যেটি যুদ্ধের জন্য বেশ উপযুক্ত। কেননা, পানির উৎসগুলো সেখানেই ছিল। আর মুসলিমবাহিনী ময়দানের

এমন জায়গায় অবস্থান নেয়, যেটি শুষ্ক আর বালুকাময়। এখানে চলাফেরা করাও কঠিন। এ ছাড়া পানিরও কোনো নামগন্ধ ছিল না।

গায়েবি সাহায্য:

আল্লাহ তাআলা মুসলিমবাহিনীর জন্য বিজয় ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছিলেন। তিনি সেভাবেই সবকিছু ব্যবস্থা করেন। যুদ্ধের আগের দিন বৃষ্টি হয়, ফলে বৃষ্টির পানিতে বালু জমে শক্ত হয়ে যায়। মুসলিম সেনারা তখন তৃপ্তিভরে পানি পান করেন এবং নিজ নিজ পাত্রগুলোতে পানি ভরে রাখেন। অন্যদিকে এই বৃষ্টি কাফিরদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। তারা যেখানে অবস্থান করছিল, সে জায়গায় বৃষ্টির পানিতে কাঁদা জমে পিচ্ছিল হয়ে যায়। হাঁটাচলা করাও তাদের জন্য কষ্টকর হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় হিজরির ১৭ রমজান শুক্রবার উভয় পক্ষ চূড়ান্ত যুদ্ধে নাজিল হয়। এ সময় নবিজি এটি সেনাদের কাতার ঠিক করতে নিজেই দাঁড়িয়ে যান। ফলে মুসলিমবাহিনী সুদৃঢ় প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে যায়।

মুসলিমদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা:

মাত্র ৩০০ নিরস্ত্র মুসলিম সেনা যখন প্রায় ১ হাজার অস্ত্রসজ্জিত সেনার মোকাবিলা করছে, এ সময় যদি মাত্র একজন লোকও তাঁদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসে, তাহলে সেটা

অত্যন্ত উপকারী মনে করা হবে। তবে ইসলামে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা এমন কঠিন মুহূর্তে পাওয়া সাহায্য থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। ফলে যখন উভয় বাহিনীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ চলছে, তখন হুজায়ফা ও আবু হাসানা রা. যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য রণাঙ্গণে এসে উপস্থিত হন। এ সময় তাঁরা রাস্তায় ঘটে যাওয়া ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, 'কাফিররা রাস্তায় আমাদের আটক করেছিল। তখন তারা আমাদের জিজ্ঞেস করে, "তোমরা কি মুহাম্মাদকে সাহায্য করতে যাচ্ছ?" আমরা তা অস্বীকার করি এবং যুদ্ধে অংশ নেব না বলে প্রতিশ্রুতি দিই।' নবিজি যখন তাঁদের এমন প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জানতে পারেন, তখন তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে তাঁদের বিরত রাখেন এবং বলেন, 'আমরা সর্বাবস্থায় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করব। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন এবং আমাদের জন্য তিনিই যথেষ্ট

এরপর মুসলিম সেনাদের কাতার সোজা করা হলে তখনকার রীতি অনুযায়ী দ্বন্দ্বযুদ্ধের মাধ্যমে লড়াই শুরু হয়। কুরাইশদের থেকে তিনজন বীর-উতবা ,ইবনু রাবিআ, শায়বা

ইবনু রাবিআ ও ওয়ালিদ ইবনু উতবা লড়াইয়ের জন্য সামনে আসে; আর মুসলিমদের থেকে হামজা ইবনু আবদুল মুত্তালিব, উবায়দা ইবনু হারিস ও আলি ইবনু আবি তালিব রা. তাদের মোকাবিলা করেন। কুরাইশের পক্ষের তিনজনই নিহত হয়। মুসলিমদের শুধু উবায়দা রা. আহত হন। আলি রা. তখন তাঁকে কাঁধে করে নবিজির কাছে নিয়ে আসেন। নবিজি তাঁকে নিজের উরুতে শুইয়ে দিয়ে তাঁর চেহারা থেকে ধুলোবালি নিজ হাতে পরিষ্কার করে দেন। এ সম্পর্কে কবি বলেন,

বন্ধু আমার আঁচল দিয়ে মুছে দিচ্ছেন অশ্রু আজকের কান্নায় তাই আছে আনন্দের কারণ।

উবায়দা রা. শাহাদাত-মুহূর্তে নবিজিকে জিজ্ঞেস করেন, 'আল্লাহর রাসুল, আমি কি শাহাদাতের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলাম?' নবিজি বলেন, 'না, তুমি নিশ্চয় শহিদ এবং আমি নিজেই এর সাক্ষী।' নবিজির মুখে এ কথা শুনে উবায়দা অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং বলতে থাকেন, 'আজ যদি আবু তালিব বেঁচে থাকতেন, তাহলে তাঁকে এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হত যে আমিই হলাম তাঁর কবিতার উপযুক্ত ব্যক্তি।

আবু জাহলকে হত্যা:

আবু জাহলের অপকর্ম এবং ইসলামের বিরুদ্ধে তার শত্রুতা সম্পর্কে সবাই জানতেন, ফলে আনসারদের মধ্যে কিশোর মুআজ ও মুআওয়িজ নামের দুই ভাই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তাঁরা যখনই তাকে দেখবেন, তখনই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করবেন অথবা নিজেরা শহিদ হয়ে যাবেন।

বদরের যুদ্ধকে সুযোগ মনে করে নিজেদের প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে দুই ভাই বের হন; কিন্তু তাঁরা আবু জাহলকে কখনো দেখেননি, তাই তাকে চিনতেন না। তাঁরা আবদুর রাহমান ইবনু আউফকে জিজ্ঞেস করেন, 'আবু জাহল লোকটা কে?' আবদুর রাহমান ইবনু আউফ রা. তখন ইশারায় তাকে দেখিয়ে দেন। আবু জাহলকে দেখামাত্রই তাঁরা বাজপাখির মতো তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। মুহূর্তের মধ্যেই কাফির সরদার আবু জাহল মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

এ সময় আবু জাহলের পাশেই যুদ্ধ করছিলেন তার ছেলে ইকরিমা। তিনি পরে মুসলমান হয়েছিলেন। তিনি পিতার এই করুণ দশা দেখে প্রথমে ভড়কে যান। এরপর পেছন দিক থেকে এসে মুআজ রা.-এর বাহুতে তরবারি দিয়ে সজোরে আঘাত করেন। ফলে তাঁর হাতটি কেটে যায় এবং শরীর থেকে আলাদা হয়ে চামড়ার সামান্য অংশে ঝুলে থাকে। এ অবস্থায়ই তিনি ইকরিমার পিছু ধাওয়া করেন; কিন্তু ইকরিমা দৌড়ে পালিয়ে যান।

মুআজ রা.-এর কর্তিত হাতটি তখনো ঝুলে ছিল এবং এতে তাঁর বেশ কষ্ট হচ্ছিল, এ জন্য তিনি সে হাতটি পায়ের নিচে রেখে এক টানে ছিঁড়ে ফেলেন। তারপর ছিঁড়ে ফেলা

হাত দূরে নিক্ষেপ করে আবারও যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন।***

একমুঠো পাথরকণা দিয়ে শত্রুদের পরাজিত করা এবং ফেরেশতাদের সাহায্য:

আল্লাহ তাআলার আদেশে রাসুল এ একমুঠো মাটি বা পাথর নিয়ে শত্রুদের প্রতি ছুড়ে মারেন এবং সাহাবিদের নির্দেশ দেন, 'একযোগে তোমরা তাদের ওপর হামলা চালাও।' এদিকে রাসুলের নিক্ষিপ্ত পাথর তাদের সবার চোখে বিশ্ব হয়।

নবিজির নির্দেশ পেয়েই সাহাবিদের ছোট এই বাহিনী কাফিরদের দিকে এগিয়ে যায়। অন্যদিকে আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের সাহায্যের জন্য ফেরেশতাদের পাঠিয়ে দেন। এভাবেই আল্লাহ তাঁর সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পূরণ করেন।

এ যুদ্ধে কুরাইশদের বড় বড় অনেক নেতা নিহত হয়। এতে করে মুশরিক সেনাদের মনোবল ভেঙে যায় এবং পরাজিত হয়ে তারা যুদ্ধের মাঠ থেকে পালায়। মুসলিমরা তখন শত্রুবাহিনীর পিছু ধাওয়া করে অনেককে হত্যা এবং অনেককে বন্দি করেন। এভাবে কাফিরদের ৭০ জন নিহত ও ৭০ জন বন্দি হয়। নিহতের মধ্যে কুরাইশের নেতা আবু জাহল, উমাইয়া ইবনু খালফ, শায়বা ইবনু রাবিআ, তার ভাই উতবা এবং তার ছেলে ওয়ালিদ ইবনু উতবা গং ছিল। অপরদিকে মুসলিমদের মধ্যে মাত্র ১৪ জন শহিদ হন। তাঁদের মধ্যে ছয়জন মুহাজির ও আটজন আনসার সাহাবি ছিলেন।

উল্লেখ্য, এ যুদ্ধ বা গাজওয়া মূলত শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইসলামের সত্যতার ব্যাপারে প্রকাশ্য একটি মুজিজা। এমন না হলে এই অসম যুদ্ধে অল্পসংখ্যক মুসলিমবাহিনীর বিজয়ের কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। মাত্র ৩১৪ জন নিরস্ত্র মুসলমানের মোকাবিলায় কুরাইশের ১ হাজার স্বশস্ত্র সেনার বিশাল বাহিনীর পরাজয় বিস্ময়ের অন্যতম প্রকৃষ্ট নিদর্শন। কেননা, বিপক্ষদলে নেতৃস্থানীয় বিত্তশালী এমন অনেক লোক ছিল, যাদের একেকজন পুরো বাহিনীর খাবার ও অন্যান্য খরচ বহনের সক্ষমতা রাখত। আর তাদের মোকাবিলায় ছিল অস্ত্র ও সহায়-সম্বলহীন সামান্য কিছু মুসলমান। এদিকে কাফিরবাহিনীতে ছিল ১০০ অশ্বারোহী; আর মুসলিমবাহিনীতে ছিল মাত্র দুটি ঘোড়া। কুরাইশদের কাছে ছিল বিশাল অস্ত্রভান্ডার; আর মুসলিমবাহিনীতে হাতেগোনা কয়েকটি তরবারি।

নবিজির সঙ্গে হাফসা ও জায়নাবের বিয়ে:

তৃতীয় হিজরির শাবানে উম্মুল মুমিনিন হাফসা এবং রমজানে জায়নাব বিনতু খুজাইমা রা. নবিজির সঙ্গে বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হন।**

গাজওয়ায়ে উহুদ বা উহুদ যুদ্ধ:

উহুদ মদিনা থেকে প্রায় তিন মাইল দূরের একটি পাহাড়ের নাম। সেখানে হারুন আ.-এর কবর রয়েছে। সবার ঐকমত্যে উহুদের যুদ্ধ তৃতীয় হিজরির শাওয়ালে সংঘটিত হয়। তবে ইতিহাসবিদদের মতে, এর নির্দিষ্ট তারিখ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। যেমন: ৭, ৯, ১০ ও ১১ শাওয়াল।১**

বদরযুদ্ধে মক্কার মুশরিকদের পরাজয় ও অপমানের গ্লানি এবং সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় লোকদের হত্যার ফলে দুঃখের বোঝা তাদের বহন করতে হচ্ছিল। এই শোক, ক্ষোভ-দুঃখ নিয়ে যদিও তারা একটি বছর পার করেছে; কিন্তু মুসলিমদের বিরুদ্ধে ক্রোধ ও প্রতিহিংসার আগুনে দখ হচ্ছিল। এমনকি তাদের নিহতদের জন্য শোক প্রকাশ করতেও লোকদের নিষেধ করে দিয়েছিল। এ পর্যায়ে তারা যুদ্ধপ্রস্তুতি সম্পন্ন করে ৩ হাজার সেনার বিশাল বাহিনী নিয়ে মদিনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে ৭০০ বর্ম, ২০০ ঘোড়া এবং ৩ হাজার উট ছিল। এমনকি ১৪ জন মহিলাকে তারা এ জন্য সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল যে, এরা তাদের পুরুষদের আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তুলবে এবং যারা পালাতে চায়, এরা তাদের তিরস্কার ও লজ্জা দেবে।

এদিকে নবিজির চাচা আব্বাস রা.- যিনি এ সময় ইসলাম কবুল করে নিয়েছেন, তবে তখনো মক্কাতেই ছিলেন-কুরাইশদের এমন আয়োজন ও যুদ্ধপ্রস্তুতি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করছিলেন এবং এতে তিনি অত্যন্ত বিচলিতবোধ করেন। এ জন্য তিনি এর বিস্তারিত সংবাদ জানিয়ে চিঠিসহ দ্রুতগামী একজন দূতকে মদিনায় নবিজির কাছে পাঠিয়ে দেন।

নবিজি এ সম্পর্কে অবগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুজন লোককে সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য পাঠান। তাঁরা ফিরে এসে তাঁকে সংবাদ দেন যে, কুরাইশরা মদিনার উপকণ্ঠে এসে গেছে। যেহেতু মদিনা শহরে আক্রমণের আশঙ্কা ছিল, তাই শহরের চারদিকেই পাহারার ব্যবস্থা করা হয়। সকালে নবিজি ঐ সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। এরপর ১ হাজার সেনার এক বাহিনী নিয়ে মদিনার বাইরে চলে আসেন। এ বাহিনীতে মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ও তার সমমনা ৩০০ মুনাফিকও ছিল। তবে তারা পথিমধ্যেই বাহিনী ছেড়ে ফিরে আসে। ফলে মুসলিমদের সৈন্যসংখ্যা কমে ৭০০ জনে দাঁড়ায়।***

সেনাবিন্যাস ও সাহাবি-সন্তানদের জিহাদি স্পৃহা:

মদিনা থেকে বেরোনোর পর মুজাহিদের যখন চূড়ান্ত যাচাই-বাছাই করা হয়, তখন অল্পবয়সি কিশোর মুজাহিদদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এ-সকল কিশোরের অন্তরে জিহাদের প্রতি আন্তরিকতা ও স্পৃহা ছিল অতুলনীয়। রাফি ইবনু খাদিজকে যখন বলা হয়, 'তোমার বয়স কম, তুমি মদিনায় ফিরে যাও।' তখন তিনি পায়ের গোড়ালিতে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়ান, যেন তাঁকে লম্বা ও উঁচু মনে করা হয়। তাঁর আগ্রহ দেখে শেষপর্যন্ত তাঁকে বাহিনীতে যুক্ত করা হয়। এ ছাড়া সামুরা ইবনু জুনদুব রা.-যিনি রাফি ইবনু খাদিজের সমবয়সি ছিলেন-তিনি যখন এ ঘটনা দেখেন, তখন নবিজির কাছে আবেদন করেন, 'আমি তো রাফিকে মল্লযুদ্ধে পরাস্ত করে থাকি। তাঁকে যদি যুদ্ধের জন্য মনোনীত করা হয়, তাহলে তো আমাকে আরও আগেই নেওয়া উচিত!' তাঁর কথামতো রাফি ও সামুরাকে কুস্তিতে লাগিয়ে দেওয়া হয়। কুস্তিতে সামুরা রাফি ইবনু খাদিজকে পরাস্ত করেন। ফলে তাঁকেও বাহিনীতে যুক্ত করা হয়।এরপর যুদ্ধ শুরু হয়। দীর্ঘক্ষণ যুদ্ধের পর মুসলিমবাহিনী কুরাইশদের পিছু হটাতে সক্ষম হয়। এ পর্যায়ে মুসলিমবাহিনী বিজয়ী হিসেবে যুদ্ধময়দানে অবস্থান করে; আর কুরাইশরা মনোবল হারিয়ে এদিকে-সেদিক পালাতে থাকে। মুসলিম সেনারা তখন যুদ্ধময়দানে গনিমত সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এ দৃশ্য দেখে পাহাড়ের ওই গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নবিজি যে ৫০ জন সেনাকে পাহারায় নিযুক্ত করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। ফলে তাঁদের অনেকে মুসলিমদের বিজয় হয়েছে মনে করে নিশ্চিন্ত মনে সেখান থেকে চলে আসেন। তবে তাঁদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়ের রা. বার বার নিষেধ করছিলেন; কিন্তু তাঁরা তাঁদের নেতার কথা মানেননি। তবে এরপরও কয়েকজন সেখানে থেকে যান।

এ জায়গাটি প্রায় ফাঁকা দেখে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ-যিনি তখনো মুসলমান হননি এবং কুরাইশের পক্ষে যুদ্ধ করছিলেন-পেছন দিক থেকে আচমকা আক্রমণ করে যুদ্ধের দৃশ্য পালটে দেন। তখন আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়েরসহ তাঁর সঙ্গে থাকা অল্প কয়েকজন সাহাবি প্রাণপণ লড়াই চালিয়ে যান, তবে শেষপর্যন্ত সবাই শাহাদতবরণ করেন।

এবার পথ পরিষ্কার হয়ে যায়। খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ তাঁর বাহিনী নিয়ে মুসলিমদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। মুসলমান ও কাফির উভয় বাহিনী তখন যুদ্ধময়দানে এমনভাবে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় যে, মুসলমান মুসলমানের হাতেই নিহত হতে থাকেন।

এ যুদ্ধে মুসআব ইবনু উমায়ের রা. শহিদ হন। তাঁর চেহারার সঙ্গে নবিজির চেহারার অনেক মিল ছিল। ফলে তাঁর শাহাদাতের পর গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, রাসুল শহিদ হয়েছেন। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, শয়তান বা মুশরিকদের কেউ একজন উচ্চৈঃস্বরে এ ঘোষণা দেয় যে, 'মুহাম্মাদ নিহত হয়েছেন।***

এই মিথ্যা সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহাবিদের মনোবল ভেঙে যায়। এমনকি বড় বড় অনেক সাহাবিও হতাশ হয়ে যান। তবে অনেকে তখনো অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যান। বিশৃঙ্খলার কারণে মুসলিমদের হাতে মুসলিমরা শহিদ হতে থাকেন। তবে সবার দৃষ্টি তখন নবিজিকে খুঁজে ফিরছিল। এরপর কাআব ইবনু মালিক রা. প্রথমে তাঁকে দেখতে পান। তিনি আনন্দের আতিশয্যে চিৎকার দিয়ে ওঠেন, 'মুবারক হো, নবিজি নিরাপদ ও সুস্থ আছেন।'

কাআব ইবনু মালিকের এ আওয়াজ যখন সাহাবিরা শুনতে পান, তখন সবাই নবিজির

কাছে দৌড়ে আসতে থাকেন। এ সময় কাফিররা অন্য দিক থেকে সরে এসে এদিকে মনোনিবেশ করে। তারা কয়েকবার নবিজির ওপর আক্রমণ করতে উদ্যত হয়, তবে তিনি নিরাপদই থাকেন। এমনকি কাফিররা একবার কঠোর আক্রমণ করলে তিনি সাহাবিদের উদ্দেশ করে বলেন, 'কে আছে এমন, যে আমার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত?' তখন জিয়াদ ইবনু সাকান রা. নিজের চার সঙ্গীসহ তাঁর দিকে এগিয়ে আসেন। তাঁরা অত্যন্ত

সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করে শেষপর্যন্ত সবাই শহিদ হন। জিয়াদ রা. যখন আহত হয়ে মাটিতে পড়ে যান, তখন রাসুল বলেন, 'তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এসো।' সাহাবিরা তাঁকে পাঁজাকোলা করে তাঁর কাছে নিয়ে আসেন। তখনো তাঁর প্রাণ বাকি ছিল। জিয়াদ নবিজির পায়ের ওপর নিজের মুখ রাখেন এবং এ অবস্থায়ই শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন।

নবিজির চেহারা মুবারক আহত হওয়া:

কুরাইশদের প্রখ্যাত বীর আবদুল্লাহ ইবনু কুমাইয়া সেনাদের সারি ভেদ করে সামনে এগিয়ে যায় এবং নবিজির চেহারা মুবারকে তরবারি দিয়ে সজোরে আঘাত করে। ফলে নবিজির মাথায় পরিহিত শিরস্ত্রাণের (লোহার টুপি) দুটি কড়া মুখ ভেদ করে ঢুকে যায় এবং একটি দাঁত শহিদ হয়। তখন আবু বকর রা. শিরস্ত্রাণের কড়া দুটি ক্ষতস্থান থেকে ওঠাতে এগিয়ে এলে আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রা. বলেন, 'আল্লাহর কসম,এ খিদমতটি আমাকে করার সুযোগ দিন।' তিনি সামনে এগিয়ে গিয়ে হাত না লাগিয়ে নিজের মুখ দিয়ে সেই কড়া দুটিতে টান দেন। এতে করে যদিও একটি কড়া বেরিয়ে আসে; কিন্তু এর সঙ্গে আবু উবায়দার একটি দাঁতও উপড়ে যায়। এ দৃশ্য দেখে আবু বকর দ্বিতীয় কড়াটি বের করতে সামনে এগিয়ে এলে তখন আবু উবায়দা আবারও কসম দিয়ে তাঁকে বিরত রাখেন এবং নিজেই তাতে মুখ লাগিয়ে টান দেন। এবারও তাঁর আরেকটি দাঁত উঠে আসে।

এ সময় কাফিরদের তৈরি একটি গর্তে রাসুল পড়ে যান। মুসলিমদের ভূপাতিত করতেই তারা এটা খুঁড়েছিল।

এ অবস্থা দেখে প্রাণোৎসর্গকারী সাহাবিরা নবিজিকে চারদিক থেকে ঘিরে দাঁড়ান। তখন তরবারির ঝনঝনানি ও তিরবৃষ্টি হচ্ছিল। সাহাবিরা ঢাল হিসেবে দাঁড়িয়ে সেগুলো নিজেদের শরীরে বিদ্ধ করতে থাকেন। আবু দুজানা রা. তো নিজেকে নবিজির ঢাল

বানিয়ে রাখেন। এদিকে কাফিরদের নিক্ষিপ্ত তিরগুলো তাঁর শরীরে বিশ্ব হতে থাকে। তালহাও তির-তরবারির আঘাতগুলো নিজের শরীর দিয়ে প্রতিহত করছিলেন। ফলে তাঁর একটি হাত শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। যুদ্ধ শেষে হিসাব করে দেখা যায়, তালহার শরীরে ৭০টিরও বেশ আঘাত রয়েছে।***

আবু তালহা রা. একটি ঢালের মাধ্যমে নবিজিকে হিফাজত করছিলেন। নবিজি যখনই ঘাড় উচিয়ে সেনাদের দিকে তাকাতেন, তখন আবু তালহা বলতেন, 'আল্লাহর রাসুল, আপনি মাথা ওঠাবেন না। শত্রুরা নিপাত যাক। আপনার শরীরে যাতে কোনো তির না লাগে, এ জন্য আপনার আগে আমার বুক প্রস্তুত রয়েছে।'

এ সময় এক সাহাবি এসে নবিজিকে জিজ্ঞেস করেন, 'আল্লাহর রাসুল, যুদ্ধে যদি আমি নিহত হই, তাহলে অবস্থান কোথায় হবে?' তিনি বলেন, 'জান্নাত।' এই সাহাবির হাতে তখন কয়েকটি খেজুর ছিল এবং তিনি সেগুলো খাচ্ছিলেন। নবিজির এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি খেজুরগুলো ফেলে দিয়ে সোজা যুদ্ধের ময়দানে চলে যান এবং বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে শাহাদাতবরণ করেন।

এদিকে কুরাইশের হতভাগারা নবিজির ওপর নির্দয়ভাবে তির নিক্ষেপ করছিল; কিন্তু রাহমাতুল্লিল আলামিনের পবিত্র জবানে তখন উচ্চারিত হচ্ছিল,

اللهم اغفر لقوي فإنهم لا يعلمون

হে আল্লাহ, তুমি আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করে দাও। তারা তো জানে না।

নবিজির চেহারা মুবারক থেকে তখনো রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল; আর রহমতের নবি তাঁর চেহারা থেকে সেই রক্ত মুছে নিচ্ছিলেন। নবিজি বলেন, 'যদি এই রক্তের একটি ফোঁটাও মাটিতে পড়ত, তাহলে সবার ওপর আল্লাহর আজাব নেমে
আসত।***

এদিকে নবিজির দৃঢ় অবস্থানের কারণে কাফিররা যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে চলে যায় এবং ঘোষণা দেয়, আগামী বছর বদরে আবার মুসলিমদের সঙ্গে যুদ্ধ হবে।

এ যুদ্ধে মুসলিমদের পক্ষে ৭০ জন শহিদ হন; আর কাফিরদের পক্ষে মাত্র ২২ বা ২৩ জন নিহত হয়।

বিরে মাউনা অভিমুখে সারিয়ায়ে মুনজির:

এ বছরই সফর মাসে রাসুল ৭০ জন সাহাবির এক বাহিনীকে নাজদের লোকদের কাছে ইসলামপ্রচারের উদ্দেশ্যে পাঠান। এ বাহিনীতে বিখ্যাত অনেক আলিম ও কারি সাহাবি ছিলেন।

এ বাহিনী নাজদে পৌঁছে দেখতে পায়, সেখানে আমির, রা'ল, জাকওয়ান ও আসাইয়া গোত্রের লোকেরা তাঁদের মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। শেষপর্যন্ত লড়াই হয় এবং ঘটনাক্রমে সকল সাহাবিই শহিদ হয়ে যান। নবিজির কাছে যখন মর্মন্তুদ এ ঘটনার সংবাদ পৌঁছায়, তখন তিনি এতই ব্যথিত ও মর্মাহত হন যে, এই ৭০ জন সাহাবির হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক কয়েকদিন ফজরের নামাজে বদদুআ করতে থাকেন।**

এ বছরের শাওয়ালে হাসান রা. জন্মান এবং উম্মু সালামা রা, নবিজির সঙ্গ বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হন।

কুরাইশ ও ইয়াহুদিদের সম্মিলিত ষড়যন্ত্র:

নবিজি যখন মদিনায় আসেন, তখন এখানকার ইয়াহুদিদের সঙ্গে একটি শান্তিচুক্তি করেন। তিনি সর্বদা এই চুক্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন; কিন্তু ইয়াহুদিদের মনোভাব ছিল সম্পূর্ণ উলটো। নবিজির আগমনের পর ইসলামের ক্রমাগত উন্নতি ও শক্তি দেখে তাদের মনে হিংসা, ক্ষোভ আর ক্রোধ সৃষ্টি হয়। এ জন্য তারা সবসময় নবিজিসহ সকল মুসলিমের বিরোধিতায় নিয়োজিত থাকে।

বদরযুদ্ধে মুসলিমদের বিস্ময়কর বিজয় ইয়াহুদিদের ক্ষোভ ও হিংসা আরও বাড়িয়ে দেয়। সুপ্ত এই বিদ্বেষ শেষপর্যন্ত প্রকাশ্যে চলে আসে। এবার তারা খোলাখুলি চুক্তি লঙ্ঘনের ধৃষ্টতা দেখাতে শুরু করে। দ্বিতীয় হিজরিতে তাদের একটি গোত্র বনু কায়নুকা যুদ্ধ ঘোষণা করে বসে, বনু নাজির নবিজিকে হত্যার পাঁয়তারা এবং মদিনায় বিদ্রোহ ছড়িয়ে দেওয়ার দুঃসাহস দেখায়। অবস্থাদৃষ্টে নবিজি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধপ্রস্তুতি শুরু করেন। তাদের মোকাবিলা করা হলে সকল ইয়াহুদি দুর্গে আত্মগোপন করে। ফলে এভাবেই তারা দুর্গে

কিছুদিন আত্মগোপনে থাকে। পরে নবিজি মদিনা থেকে বনু কায়নুকা ও বনু নাজিরকে তাড়িয়ে দেন। এদিকে মক্কার কুরাইশরা তো প্রথম থেকেই মদিনার ইয়াহুদি ও মুনাফিকদের সঙ্গে পত্রমারফত মুসলিমদের বিরুদ্ধে উসকানি দিচ্ছিল। এমনকি এই হুমকিও দিচ্ছিল যে, যদি মুহাম্মাদকে তোমরা সেখান থেকে বের করে না দাও, তাহলে আমরা তোমাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করব। ***

এ সময় ইসলামের বিরোধিতায় তাদের পারস্পরিক কুটিলতা তাদের মধ্যে ঐক্য ও সেতুবন্ধনের কাজ করে। ফলে এ পর্যায়ে মক্কার কুরাইশ, মদিনার ইয়াহুদি ও মুনাফিকদের সম্মিলিত শক্তি ইসলামের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়। মক্কা থেকে মদিনা পর্যন্ত সব গোত্রের মধ্যে ঘৃণা ছড়িয়ে পড়ে। এই ঐক্যের ধারাবাহিক পরিণতি হিসেবে

পঞ্চম হিজরির ১০ মুহাররাম জাতুর রিকার যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

এ বছরের রবিউল আউয়ালে দাওমাতুল জানদাল নামে যে যুদ্ধটি হয়, এটিও এই ষড়যন্ত্রের ফল। এরপর ২ শাবান সংঘটিত হয় বনু মুস্তালিকযুদ্ধ। এগুলো ছিল মূলত চরম একটি আঘাতের পূর্বাভাস।

খন্দকের যুদ্ধ

মক্কা থেকে মদিনা সবাই ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার দুরভিসন্ধিতে একজোট হয়। পঞ্চম হিজরির জিলকদে সম্মিলিত বাহিনী তাদের সব শক্তি একত্র করে একযোগে মদিনা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়। ১০ হাজার লোকের সমন্বয়ে গঠিত বিশাল সশস্ত্রবাহিনী পৃথিবীর বুক থেকে মুসলিমদের চিরতরে উচ্ছেদের লক্ষ্যে মদিনার দিকে এগোয়।

রাসুল যখন তাদের এগিয়ে আসার সংবাদ অবগত হন, তখন সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শসভা ডাকেন। সব শুনে সালমান ফারসি রা. তখন খোলা ময়দানে বেরিয়ে যুগ্ম করা সমীচীন হবে না বলে মত প্রকাশ করেন; বরং যেদিক থেকে শত্রুদের মদিনায় প্রবেশের আশঙ্কা রয়েছে, সেদিকে পরিখা খননের পরামর্শ দেন। তাঁর এই পরামর্শ গৃহীত হয়। পরামর্শ

অনুযায়ী রাসুল ৩ হাজার সাহাবিকে সলো নিয়ে পরিখা খননে লেগে যান। মাত্র ছয় দিনে পাঁচ গজ গভীর পরিখার কাজ সমাপ্ত হয়। খননকাজে যোদ রাসুলও অংশ নেন।**

পরিখা খননের সময় একবার বিশাল আকৃতির একটি পাথরখণ্ড বের হয়। এটি সরাতে সবাই ব্যর্থ হলে রাসুল তাঁর পবিত্র হাত দিয়ে পাথরটিতে এমন এক আঘাত করেন যে, সেটি খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যায়। এভাবেই পরিখা খনন করা হয়।

এদিকে কাফিরদের সম্মিলিত বাহিনী এসে মদিনা অবরোধ করে ফেলে। ফলেমুসলমানরা প্রায় ১৫ দিন অবরুদ্ধ থাকেন। এ সময় ইয়াহুদিদের শেষ গোত্র বনু কুরায়জাও চুক্তি ভঙ্গ করে কাফিরদের সম্মিলিত বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয়।

সম্মিলিত বাহিনীর অবরোধ আর ভেতরে বনু কুরায়জার বিদ্রোহ চরম অস্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি করে। রসদস্বল্পতার কারণে মুসলমানরা তিন দিন অনাহারে কাটান। সাহাবিরা এ সময় ক্ষুধায় অস্থির হয়ে নবিজিকে নিজেদের পেট উন্মুক্ত করে দেখান যে, সবাই পেটে পাথর বেঁধে রেখেছেন। তিনি তখন তাঁর পবিত্র উদর খুলে দেখান যে, তাতে দুটি পাথর বাঁধা রয়েছে।

অবরোধকারীরা পরিখা পেরোতে না পেরে মুসলিমদের ওপর তির ও পাথর বর্ষণ শুরু করে। উভয় পক্ষেই তখন অনবরত তির-বর্ষণ চলতে থাকে। অবস্থা এমন সংকটাপন্ন ও শ্বাসরুদ্ধকর ছিল যে, নবিজির চার ওয়াক্ত নামাজ কাজা হয়ে যায়।

কাফিরদের ওপর ঝড়োহাওয়া ও আল্লাহর সাহায্য:

অবশেষে সাজসরঞ্জামহীন মুসলিমবাহিনীর তরে মহান আল্লাহর সাহায্য আসে। কাফিরদের ওপর এমন ঝড়োহাওয়া বয়ে যায় যে, তাদের তাঁবুর খুঁটি পর্যন্ত উড়ে যায় এবং চুলায় থাকা ডেগ-ডেকচি উলটে পড়ে। এই ঝড়োহাওয়া কাফিরদের হতবুদ্ধি করে দেয়। অন্যদিকে তাদের রসদও ফুরিয়ে এসেছিল। এ সময় নাইম ইবনু মাসউদ রা. এমন এক কৌশল অবলম্বন করেন, এতে করে কাফিরদের মধ্যে বিভেদ ও ভাঙন সৃষ্টি হয়। পালানো

ছাড়া তখন তাদের আর উপায় থাকেনি। ফলে অল্পসময়ে নিদারুণ পরাজয়ের দাগ নিয়ে যুদ্ধের ময়দান খালি করে তারা ফিরে যায়।

এ বছরের বিভিন্ন ঘটনা:

• এ বছর হজ ফরজ হয়। অবশ্য হজ ফরজ হওয়ার তারিখ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে।

• জামাদিউল উলায় নবিজির নাতি আবদুল্লাহ ইবনু উসমান অর্থাৎ, নবিকন্যা রুকাইয়ার ছেলে আবদুল্লাহ ইনতিকাল করেন।

এ বছর শাওয়ালের শেষ দিকে আয়েশা রা.-এর মায়ের ইনতিকাল হয়।

এ বছরের জিলকদে জায়নাব বিনতু জাহাশ রা. নবিজির সঙ্গে বিয়েবন্ধনে আবন্ধ হন।

• এ বছরই মদিনায় ভূমিকম্প ও চন্দ্রগ্রহণ হয়।**

হুদায়বিয়ার সন্ধি, বায়আতে রিজওয়ান এবং রাষ্ট্রপ্রধানদের প্রতি ইসলামের দাওয়াত

হুদায়বিয়ার সন্ধি

ষষ্ঠ হিজরির জিলকদে রাসুল এ উমরা করার নিয়তে ইহরাম বাঁধেন। তাঁর সঙ্গে ১৪ বা ১৫ শত সাহাবির বিরাট জামাআত মক্কা অভিমুখে রওনা হয়। হুদায়বিয়া মক্কা থেকে এক মঞ্জিল দূরে একটি কূপের নাম; এর নামানুসারেই এলাকার নামও হুদায়বিয়া। রাসুল এখানে যাত্রাবিরতি করেন।**

নবিজির মুজিজা:
সেখানে একটি কূপ একেবারে শুকনো ছিল। নবিজির মুজিজায় সেটি পানিতে ভরে ওঠে। হুদায়বিয়ায় পৌঁছার পর তিনি উসমান রা.-কে কুরাইশদের এ মর্মে অবহিত করতে মক্কায়

পাঠান যে, তিনি এবার শুধু বায়তুল্লাহ জিয়ারত ও উমরা পালনের জন্যই তাশরিফ এনেছেন, এ ছাড়া অন্য কোনো (রাজনৈতিক) উদ্দেশ্য তাঁর নেই।

উসমান রা. মক্কা পৌঁছাতেই কুরাইশ কাফিররা তাঁকে আটক করে ফেলে। এদিকে মুসলিমদের মধ্যে এ গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, কাফিররা তাঁকে হত্যা করেছে। নবিজির কাছে যখন এ সংবাদ আসে, তখন তিনি একটি বাবলাগাছের নিচে বসে সাহাবিদের কাছ থেকে জিহাদের বায়আত নেন। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে এবং এটিকে বায়আতে রিজওয়ান বলা হয়।

পরে জানা যায়, উসমান-হত্যার খবরটি ছিল মিথ্যা; বরং কুরাইশরা মুসলিমদের সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাবে আগ্রহ প্রকাশ করে এবং সন্ধির শর্তসমূহ চূড়ান্ত করতে সাহল ইবনু আমরকে পাঠায়। পরে নিম্নোক্ত শর্তগুলো চূড়ান্ত করে অঙ্গীকারপত্র লেখা হয় এবং

১৬ মাইল বা ২৫.৭৬ কিলোমিটারে এক মনজিল।

পবিত্র কুরআনের সুরা ফাতহের ১০ নম্বর আয়াতে বায়আতে রিজওয়ানের আলোচনা রয়েছে।

১০ বছরের জন্য উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধিচুক্তি হয়:

১. মুসলিমরা এবার উমরা না করেই ফিরে যাবেন।

২. আগামী বছর হজ করতে এসে মাত্র তিন দিন থেকে ফিরে যাবেন।

৩. অস্ত্রসজ্জিত হয়ে আসতে পারবেন না। তরবারি সঙ্গে রাখা যাবে, তবে তা কোষবন্ধ থাকবে।

৪. মক্কা থেকে কোনো মুসলমানকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেন না।

৫. কোনো মুসলমান যদি মক্কায় চলে আসতে চায়, তাকে বাধা দেওয়া যাবে না।

৬. যদি কেউ মদিনা চলে যায়, তাহলে নবিজি তাকে ফেরত পাঠাবেন।

৭. মদিনা থেকে কেউ মক্কায় চলে এলে কাফিররা তাকে ফেরত পাঠাবে না।

এসব শর্ত যদিও বাহ্যত মুসলিমদের বিরুদ্ধে এবং প্রকাশ্যভাবে পরাজয় ও বৈষম্যমূলক ছিল; কিন্তু মহান আল্লাহ কুরআনে একে 'মহা বিজয়' বলে অভিহিত করেন। সাহাবিগণ এভাবে নতজানু হয়ে সন্ধি করাকে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছিলেন না। নবিজি তাঁদের মনোভাব বুঝতে পেরে বলেন, 'আমার প্রতি এটাই মহান আল্লাহর নির্দেশ এবং এতেই আমাদের ভবিষ্যৎ-কল্যাণ নিহিত।'

পরবর্তীকালের ঘটনাসমূহ এ রহস্যের সমাধান করে দেয়- যেমন: সন্ধির কল্যাণে শান্তি ও পূর্ণ নিরাপত্তার সঙ্গে মক্কা-মদিনার মধ্যে যাতায়াত শুরু হয়। কাফিররা নবিজির খিদমতে এবং মুসলিমদের কাছে বিনা বাধায় আসা-যাওয়া করতে থাকে। এদিকে ইসলামি চরিত্রের চুম্বক শক্তি কাফিরদের দারুণভাবে আকৃষ্ট করতে শুরু করে।

ইতিহাসবিদরা বলেন, এ সময় এত অধিক পরিমাণ লোক ইসলামগ্রহণ করে, ইতিপূর্বে কখনো হয়নি, প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল মক্কা বিজয়ের ভূমিকা

বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে চিঠি:

হুদায়বিয়ার সন্ধির ফলে দাওয়াতের পথ মসৃণ হয়। তখন রাসুল ও সত্যের এই আহ্বান গোটা দুনিয়ার শাসকদের কাছে পৌঁছে দিতে মনস্থ করেন। সুতরাং এ উদ্দেশ্যে আমর ইবনু উমাইয়াকে হাবশার বাদশাহ আসহামা নাজাশির কাছে পাঠান। আসহামা নবিজির চিঠিটি তাঁর উভয় চোখে রেখে সিংহাসন থেকে নিচে নেমে মাটিতে বসে পড়েন এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলামগ্রহণ করেন। রাসুল -এর যুগেই তিনি ইনতিকাল করেন।

দাহইয়া কালবি রা.-কে রোম-সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে পাঠান। রাসুল এটি যে সত্য নবি, তা তিনি অকাট্য প্রমাণাদি ও অতীতের আসমানি গ্রন্থসমূহের মাধ্যমে স্পষ্ট

জানতে পেরেছিলেন। তখন সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইসলামগ্রহণের ইচ্ছা করেন; কিন্তু এতে তার সকল প্রজা খেপে যায়। তাই তিনি এই চিন্তায় ভীষণ ভয় পেয়ে যান যে, আমি যদি ইসলামগ্রহণ করি, এরা আমাকে সিংহাসনচ্যুত করবে। এ জন্য তিনি ইসলামগ্রহণ থেকে বিরত থাকেন।

আবদুল্লাহ ইবনু হুজায়ফা রা.-কে পারস্যের সম্রাট খসরু পারভেজের কাছে পাঠান। এই হতভাগা নবিজির চিঠির সঙ্গে অত্যন্ত ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ করে এবং চিঠিটি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে। নবিজির কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি তার জন্য বদদুআ করেন- 'আল্লাহ তার সাম্রাজ্যকে এমনভাবে টুকরো টুকরো করে দিন, যেভাবে সে আমার চিঠিটি টুকরো টুকরো করেছে।' নবিজির দুআ বিফলে যায়নি। কিছুদিন পরই খসরু পারভেজ তার পুত্র শিরওয়াহর হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়।

এ ছাড়া হাতিব ইবনু আবি বালতাআ রা.-কে মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়ার বাদশাহ মুকাওকিসের কাছে পাঠান। আল্লাহ তাঁর অন্তরে ইসলামের সত্যতা ও মহানবি সম্পর্কে বিশ্বাস ঢেলে দিয়েছিলেন। ফলে বাদশাহ মুকাওকিস হাতিব ইবনু আবি বালতাআর সলো অত্যন্ত উত্তম আচরণ করেন এবং নবিজির জন্য কিছু উপহারও পাঠান। এর মধ্যে মারিয়া কিবতিয়া নামের একজন দাসী এবং দুলদুল নামে সাদা রঙের একটি খচ্চরও ছিল। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, ১ হাজার স্বর্ণমুদ্রা আর একজোড়া কাপড়ও ছিল।

আমর ইবনুল আস রা.-কে চিঠিসহ আম্মানের বাদশাহ জাইফার ও আবদুল্লাহর কাছে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পাঠান। তাঁদের উভয়ের অন্তরেও ব্যক্তিগত অনুসন্ধান আর আসমানি কিতাবাদির মাধ্যমে নবিজির সত্য নবি হওয়া সম্পর্কে বিশ্বাস জন্মে। পরে তাঁরা উভয়ে মুসলমান হন। তখন থেকেই তাঁরা তাঁদের প্রজাদের কাছ থেকে জাকাত সংগ্রহ করতে থাকেন এবং আমর ইবনুল আসের হাতে জাকাতের সেসব সম্পদ অর্পণ করেন।

খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ ও আমর ইবনুল আসের ইসলামগ্রহণ:

খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা. তখন পর্যন্ত প্রতিটি যুদ্ধে মুসলিমদের বিরুদ্ধে অসাধারণ রণনৈপুণ্য দেখিয়ে আসছিলেন। অধিকাংশ যুদ্ধে, বিশেষত উহুদযুদ্ধে তাঁর কারণেই কাফিরদের পিচ্ছিল পা দৃঢ় হয়েছিল। তবে হুদায়বিয়ার সন্ধির পর তিনি নিজ থেকেই ইসলামগ্রহণের জন্য মক্কা থেকে মদিনার পথে রওনা দেন। পথিমধ্যে আমর ইবনুল আসের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তখন তিনি জানতে পারেন, আমরও ইসলামগ্রহণের উদ্দেশ্যে সফর করছেন। এরপর তাঁরা উভয়ে একসঙ্গে মদিনায় নবিজির খিদমতে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন।

খায়বারযুদ্ধ, ফাদাক বিজয় এবং কারা উমরাহ আদায়

গাজওয়ায়ে খায়বার বা খায়বারযুদ্ধ:

মদিনার ইয়াহুদিদের মধ্যে বনু নাজির সম্প্রদায় যখন খায়বারে গিয়ে বসতি স্থাপন করে, তখন খায়বার ইয়াহুদিদের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়। সেখান থেকেই তারা পুরো আরবের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদের ইসলামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করত।

তাদের শায়েস্তা করতে সপ্তম হিজরির মুহাররম বা জামাদিউল উলায় রাসুল ৪০০ পদাতিক এবং ২০০ অশ্বারোহী সেনার বাহিনী নিয়ে তাদের মোকাবিলার জন্য খায়বারে উপস্থিত হন। উভয় বাহিনীর মধ্যে তুমুল লড়াই এবং ব্যাপক হতাহত হয়। শেষপর্যন্ত আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের বিজয় দান করেন এবং ইয়াহুদিদের সব দুর্গ তখন মুসলিমদের হাতে চলে আসে।

খায়বারের এই যুদ্ধে আলি রা. বিশেষ রণনৈপুণ্য দেখান। তিনি একাই হাত দিয়ে খায়বারের দুর্গফটক উপড়ে ফেলে দেন; অথচ ফটকটি একসঙ্গে ৭০ জন লোকও নাড়াতে পারত না। কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে যে, আলি রা. যুদ্ধে এই ফটকটি হাতের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছেন।*

ফাদাক বিজয়:

খায়বার বিজয়ের পর নবিজি ঐ ফাদাকের ইয়াহুদিদের প্রতি ছোট একটি বাহিনী পাঠান। ইয়াহুদিরা তখন মুসলিমদের সঙ্গে সন্ধি করে করে নেয়।

খায়বার মদিনা থেকে শাম দিকে তিন-চার মঞ্জিল দূরে অবস্থিত একটি বড় শহর।

কাজা উমরাহ আদায়:

গত বছর (ষষ্ঠ হিজরির জিলকদ মাসে) হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় যে উমরা আদায় করা সম্ভব হয়নি এবং কুরাইশ কাফিরদের সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল যে, 'মুসলিমরা আগামী বছরা উমরা আদায় করবে এবং তিন দিনের বেশি সময় মক্কায় থাকবেন না।' এ বছর সেই প্রতিশ্রুতি ও চুক্তি অনুযায়ী রাসুল এ তাঁর সাহাবিদের নিয়ে মক্কায় উপস্থিত হন এবং চুক্তির সব শর্ত মেনে উমরা পালন শেষে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

সারিয়ায়ে মুতা, মক্কাবিজয়, হুনাইন ও তায়েফযুদ্ধ:

সারিয়ায়ে মুতা:

মুতা' অঞ্চলটি শামের বালকা শহরের পার্শ্ববর্তী একটি এলাকা। বায়তুল মাকদিস থেকে প্রায় দুই মঞ্জিল দূরে। এখানেই মুসলমান ও রোমানদের মধ্যে প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

এই যুদ্ধের কারণ ছিল, রোম সম্রাট কায়সারের পক্ষ থেকে শামের বালকায় নিযুক্ত বসরার গভর্নর ছিল আমর ইবনু শূরাহবিল। সে নবিজির দূত হারিস ইবনু উমায়ের রা.-কে হত্যা করে। আর দূত হত্যা ছিল তখনকার রীতিনীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। এটা ছিল যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর। ফলে মুসলিমদের যুদ্ধ করা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না।

নবিজি ঞ্জ যখন হারিস ইবনু উমায়েরের শহিদ হওয়ার সংবাদ পান, তখন জায়েদ ইবনু হারিসার নেতৃত্বে ৩ হাজার সেনার এক বাহিনী তার বিরুদ্ধে পাঠান। জায়েদের বাহিনী

যখন মুতা অঞ্চলে পৌঁছায়, তখন রোমানরাও এ সম্পর্কে জানতে পারে। ফলে তারা দেড় লাখ সেনার এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মুসলিমদের মোকাবিলায় যুদ্ধ করতে এগিয়ে আসে।

কয়েকদিন যুদ্ধ চলার পর আল্লাহ তাআলা দেড় লাখ কাফিরের বিশাল বাহিনীর অন্তরে মাত্র ৩ হাজার মুসলিমের এমন ভীতি সঞ্চার করেন যে, যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় তারা খুঁজে পায়নি।

মক্কাবিজয়:

হুদায়বিয়ার সন্ধিপত্রে যেসব শর্ত লেখা ছিল, মুসলিমরা তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সেগুলো পূর্ণ নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করছিলেন। কিন্তু অষ্টম

'মুতা' জর্দানের বালকা এলাকার নিকটবর্তী একটি জনপদ। এই জায়গা থেকে বায়তুল মাকদিসের দূরত্ব মাত্র দুই মনজিল। এখানেই মুতার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

হিজরিতে কুরাইশরা সেই সন্ধি ভঙ্গ করে বসে। রাসুল একজন দূত পাঠিয়ে চুক্তিনামা নবায়নের জন্য কুরাইশদের সামনে তখন কয়েকটি শর্ত দেন এবং শেষের দিকে লিখে দেন যে, এ শর্তগুলো তাদের মনঃপুত না হলে হুদাবিয়ার সন্ধি ভেঙে গেছে বলে মনে করতে হবে। ফলে কুরাইশরা সন্বিভঙ্গের প্রস্তাবই গ্রহণ করে।

এরপর রাসুল যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করেন এবং অষ্টম হিজরির ১০ রমজান মঙ্গলবার আসরের নামাজের পর ১০ হাজার সাহাবির বিশাল এক বাহিনী সঙ্গে নিয়ে মদিনা থেকে রওনা হন। তারপর 'কুদায়বিয়া' নামক স্থানে মাগরিবের সময় হলে সবাই সেখানে ইফতার করেন। মক্কার উপকণ্ঠে পৌঁছার পর খালিদ ইবনুল ওয়ালিদকে মুসলিমবাহিনীর একটি অংশসহ উপর দিকের রাস্তা দিয়ে মক্কায় প্রবেশের জন্য পাঠান। তাঁদের এটাও বলে দেন যে, 'কেউ তোমাদের সঙ্গেঙ্গ সংঘর্ষে না জড়ালে তোমরাও তরবারি উন্মুক্ত করবে না।'

এদিকে রাসুল এ নিজে অপর প্রান্ত দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন এবং সাধারণ ঘোষণা দেন- 'যে মসজিদে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ। যে আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে, সে-ও

নিরাপদ। যে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখবে, সে-ও নিরাপদ।' অবশ্য তিনি ১১ জন পুরুষ আর চারজন মহিলার রক্ত ক্ষমা করেননি। কারণ, তাদের অস্তিত্বই ছিল যাবতীয় বিশৃঙ্খলার মূল। কিন্তু তারা সবাই এদিক-সেদিক ছড়িয়ে পড়ে। পরে তাদের অধিকাংশই মক্কাবিজয়ের পর মদিনায় পৌঁছে ইসলামগ্রহণ করে।

২০ রমজান শুক্রবার রাসুল ৯ তাওয়াফ সম্পন্ন করেন। তখন পর্যন্ত কাবার আশপাশে ৩৬০টি মূর্তি যথারীতি বিদ্যমান ছিল। এ সময় নবিজির হাতে একটি কাঠের টুকরো ছিল। তিনি যখন একটি মূর্তির পাশ দিয়ে যেতেন, তখনই কাঠ দ্বারা সেদিকে ইঙ্গিত করতেন আর মূর্তিটি মুখ থুবড়ে পড়ে যেত।

তিন. মক্কাবিজয়ের পর কুরাইশদের সঙ্গে মুসলিমদের আচরণ

তাওয়াফ সমাপ্ত করে রাসুল এ কাবা শরিফের চাবিরক্ষক উসমান ইবনু তালহা শাইবির কাছ থেকে কাবার চাবি নিয়ে কাবার ভেতরে প্রবেশ করেন। সেখান থেকে বেরিয়ে মাকামে ইবরাহিমে নামাজ আদায় করেন। নামাজ শেষে তিনি মসজিদে তাশরিফ নেন।

এদিকে লোকজন গভীর উৎকণ্ঠায় এ অপেক্ষা করছিল যে, রাসুল এট কুরাইশদের ব্যাপারে আজ কী নির্দেশ জারি করেন। কিন্তু সব দ্বিধা, সংশয় আর উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে বিশ্বনবি কুরাইশদের সম্বোধন করে বলেন, 'তোমারা সব দিক থেকে স্বাধীন ও নিরাপদ!' তারপর তিনি কাবাঘরের চাবিও তাদের হাতে ফেরত দিয়ে দেন।

নবিজির চরিত্রমাহাত্ম্য ও আবু সুফিয়ানের ইসলামগ্রহণ:

আবু সুফিয়ান-যিনি নবিজির বিরুদ্ধে কুরাইশদের সর্বাপেক্ষা বড় নেতা ছিলেন এবং তাদের পরিচালিত প্রায় সব যুদ্ধে তিনি প্রধান সেনাপতির ভূমিকা পালন করে আসছিলেন- মক্কাবিজয়ের প্রাক্কালে গোপনে মুসলিমবাহিনীর সংবাদ সংগ্রহ করতে তিনি মক্কা থেকে বেরোলে সাহাবিরা তাঁকে গ্রেপ্তার করেন। বন্দি অবস্থায় তাঁকে রহমতে আলম নবিজির খিদমতে আনা হলে তিনি তাঁকে ক্ষমা করে দেন। নবিজির মহত্ত্ব ও উদারতার ফলে আবু

সুফিয়ান তখনই কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে যান। ফলে আজ তাঁর নামের সলো 'রাজিআল্লাহু আনহু' উচ্চারণ করা হয়।

মক্কাবিজয়ের দিন একব্যক্তি ভীত হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে নবিজির দরবারে উপস্থিত হয়। করুণার নবি তাকে বলেন, 'শান্ত হও, আমি কোনো রাজা-বাদশাহ নই, আমি তো একজন সাধারণ মায়ের সন্তান।'

মক্কাবিজয়ের পর ১৫ দিন রাসুল সেখানে অবস্থান করেন।

এ সময় মদিনার আনসাররা এ কথা ভেবে মনে কষ্ট পাচ্ছিলেন যে, এখন হয়তো রাসুল মক্কায় থেকে যাবেন; আর আমরা তাঁর থেকে দূরে থেকে যাব। কিন্তু রাসুল এ যখন তাঁদের এই সংশয় আঁচ করতে পারেন, তখন বলেন, 'এখন তো আমার জীবন-মরণ তোমাদেরই সঙ্গে জড়িত।'

এরপর রাসুল আত্তাব ইবনু উসায়েদকে মক্কার গভর্নর মনোনীত করে মদিনার উদ্দেশে রওনা হন।

হুনাইনযুদ্ধ:

মক্কাবিজয়ের পর সাধারণভাবে আরবের লোকেরা বিপুলসংখ্যায় ইসলামগ্রহণ করতে থাকে। কেননা, তাঁদের মধ্যে এমন অনেক লোক ছিলেন, যাঁরা ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে নিঃশ্চিন্ত হওয়া সত্ত্বেও কুরাইশদের ভয়ে ইসলামগ্রহণে দেরি করছিলেন এবং

মক্কাবিজয়ের অপেক্ষায় ছিলেন। এখন তাঁদের সবাই দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করেন। বাকি আরবদের তখন এমন শক্তি বা সাহস ছিল না যে, তারা ইসলামের বিরুদ্ধে রুখে

দাঁড়াবে। কিন্তু হাওয়াজিন ও সাকিফ গোত্র দুটি নিজেদের আত্মসম্মানবোধ থেকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য মক্কার দিকে এগোয়।

রাসুল এটি এ ব্যাপারে অবগত হয়ে ১২ হাজার সেনার এক বিশাল বাহিনী তাদের মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত করেন। এঁদের মধ্যে ১০ হাজার ছিলেন আনসার ও মুহাজির, যাঁরা মক্কাবিজয়ের সময় মদিনা থেকে নবিজির সঙ্গে ছিলেন, আর ২ হাজার ছিলেন নওমুসলিম, যাঁরা মক্কাবিজয়ের সময় ইসলামগ্রহণ করেছিলেন। এ সংখ্যাটি তখন পর্যন্ত মুসলিমবাহিনীর সবচেয়ে বড় সংখ্যা ছিল।

অষ্টম হিজরির ৬ শাওয়াল আল্লাহর এ বাহিনী রওনা হয়। তাঁরা যখন হুনাইন প্রান্তরে পৌঁছান, তখন পাহাড়ের ঘাঁটিতে আত্মগোপনকারী শত্রুরা অতর্কিতভাবে তাদের ওপর হামলা চালিয়ে বসে। যেহেতু তখনো সেনাদের সারিবিন্যাসই সম্পন্ন হয়নি, তাই মুসলিমবাহিনীর সম্মুখভাগ পিছু হটা শুরু করে।

এই পিছু হটার বাহ্যিক কারণ সারিবিন্যাসের অপূর্ণতা আর মক্কার নওমুসলিমদের ভয় বলা হলেও প্রকৃত কারণের ইঙ্গিত পবিত্র কুরআনে এভাবে রয়েছে যে-অর্থাৎ, মুসলিমরা তখন নিজেদের চিরাচরিত অভ্যাসের বিপরীতে নিজেদের সংখ্যাধিক্য এবং সাজসরঞ্জাম দেখে গর্ববোধ করছিলেন। কোনো কোনো সাহাবি, এমনকি আবু বকর রা.-এর মতো ব্যক্তির মুখ থেকে এ ধরনের কথা উচ্চারিত হয়েছিল যে, 'আজ আমরা পরাজিত হতে পারি না।' এ জন্য আল্লাহ তাঁদের সতর্ক করতে এ ব্যবস্থা নেন, যেন মুসলিমরা বুঝতে পারেন, জয়-পরাজয় আমাদের হাতে নয় এবং এটা তির- তরবারির ওপরও নির্ভরশীল নয়। বদরযুদ্ধে নিরস্ত্র হওয়া সত্ত্বেও এত বড় বিজয়; আর হুনাইনযুদ্ধে এত বিপুল সাজসরঞ্জাম থাকা সত্ত্বেও প্রাথমিক পরাজয়ের এটাই সেই নিগূঢ় রহস্য।

রাসুল তখন দুটি বর্ম পরে দুলদুলে বসা ছিলেন। নিজের বাহিনীকে পিছু হটতে দেখে তাঁর নির্দেশে আব্বাস রা. মুসলিমদের এক বীরত্বপূর্ণ আওয়াজ দ্বারা দৃঢ় থাকার আহ্বান জানান। এতে নড়বড়ে ও টালমাটাল বাহিনী পুনরায় সুদৃঢ় হয়ে যায় এবং উভয় দলের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়।

একমুঠো মাটি দ্বারা শত্রুবাহিনীকে পরাজিত করা:

এদিকে রাসুল একমুঠো মাটি নিয়ে শত্রুবাহিনীর ওপর নিক্ষেপ করেন। আল্লাহর

কুদরতে এই একমুঠো মাটি শত্রুবাহিনীর প্রত্যেক সেনার চোখে গিয়ে পড়ে। এমনকি একটি সেনাও তা থেকে রক্ষা পায়নি। শেষপর্যন্ত শত্রুবাহিনী ভীত হয়ে পালায় এবং পরাজিত হয়।

এই যুদ্ধে মুসলিমদের পক্ষে মাত্র চারজন এবং ৭০ জনের চেয়ে বেশি শত্রুসেনা নিহত হয়। মুসলমানরা তখন প্রতিশোধস্পৃহায় শিশু ও মহিলাদের প্রতি আক্রমণে উদ্যত হলে রাসুল তাঁদের এ কাজ থেকে বিরত রাখেন।

তায়েফযুদ্ধ:

এরপর রাসুল ঐ তায়েফের দিকে দৃষ্টি দেন। তায়েফ ছিল বনু সাকিফ ও বনু হাওয়াজিনের কেন্দ্র। প্রায় ১৮ দিন তাদের অবরুদ্ধ রাখার পরও বিজয় অর্জিত হয়নি। ফলে অবরোধ তুলে ফেরার সময় জিইররানা নামক স্থানে যখন পৌঁছান, তখন তায়েফের হাওয়াজিনের একটি প্রতিনিধিদল নবিজির খিদমতে এসে আবেদন করে, হুনাইনযুদ্ধে মুসলিমদের হাতে তাদের যে-সকল লোক বন্দি রয়েছে, তাদের যেন মুক্তি দেওয়া হয়। নবিজি তাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে বন্দিদের মুক্ত করেন। এরপর তিনি যখন তায়েফ থেকে মদিনায় ফিরে আসেন, তখন তায়েফের একটি প্রতিনিধিদল তাঁর খিদমতে এসে ইসলামগ্রহণ করে।*

উমরায়ে জিইররানা

যুদ্ধ শেষে ফেরার পথে জিইরিরানা নামক স্থানে অবস্থানের সময় রাসুল এট উমরা পালনের ইচ্ছা করেন। ফলে এখান থেকেই ইহরাম বেঁধে মক্কায় পৌঁছান। এরপর উমরা আদায় করে মদিনার উদ্দেশে রওনা দেন। অষ্টম হিজরির ৬ জিলকদ তিনি মদিনায় ফিরে আসেন।

নবম হিজরি

তাবুকযুদ্ধ, ইসলামি হজ, বিভিন্ন প্রতিনিধিদলের আগমন এবং দলে দলে লোকজনের ইসলামগ্রহণ

এক. গাজওয়ায়ে তাবুক বা তাবুকযুদ্ধ ও ইসলামে পথ চলছেন। এটা দেখে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন, 'সে দুনিয়ায় একাকী চলবে, একাকী জীবন কাটাবে এবং একাকী মৃত্যুবরণ করবে।' বাস্তবেও তা-ই হয়েছিল।

খ. এ যুদ্ধসফরেই নবিজির উটনী হারিয়ে যায়। তখন আল্লাহ তাআলা জিবরিলের মাধ্যমে তাঁকে জানিয়ে দেন যে, উটনীর লাগাম অমুক জায়গায় একটি গাছের সঙ্গে আটকে আছে। পরে সেখানে গিয়ে উটনীকে এ অবস্থায়ই পাওয়া যায়।

গ. মুসলমানগণ যখন তাবুকে পৌঁছান, তখন সেখানে গিয়ে কাউকে পাওয়া যায়নি। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস তার বাহিনী নিয়ে হিমসে চলে যায়। নবিজি তখন খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা.-কে উকাইদির নামের খ্রিস্টান পাদরির কাছে পাঠান এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেন, 'তোমরা রাতে তার সঙ্গে এমতাবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, সে তখন শিকারে ব্যস্ত থাকবে।' খালিদ সেখানে পৌঁছে তাকে এ অবস্থায়ই দেখতে পান এবং তাকে বন্দি করে নিয়ে আসেন।

নবিজি তাবুকে প্রায় ১৫-২০ দিন অবস্থান করেন; কিন্তু কেউ তাঁর মোকাবিলা করতে আসেনি। একপর্যায়ে বাধ্য হয়ে তিনি তাবুক থেকে ফিরে আসেন। এটাই ছিল নবিজির শেষ গাজওয়া বা যুদ্ধাভিযান। নবম হিজরির রমজানে তিনি বাহিনী নিয়ে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

মসজিদে জিরারে অগ্নিসংযোগ:

তাবুক অভিযান থেকে ফেরার পর রাসুল এ সে জায়গাটি আগুন লাগিয়ে ধ্বংসের নির্দেশ দেন, যেটি মুনাফিকরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে পরামর্শের জন্য তৈরি করেছিল এবং মুসলিমদের ধোঁকা দিতে এর নাম দিয়েছিল 'মসজিদ'।

এর মাধ্যমে এ বিষয়টি প্রমাণিত হয় যে, সেটি আদৌ কোনো মসজিদ ছিল না; বরং মুসলিমদের ক্ষতির উদ্দেশ্যেই নির্মাণ করা হয়েছিল।

প্রতিনিধিদলের আগমন এবং দলে দলে লোকজনের ইসলামে প্রবেশ

হুদায়বিয়ার সন্ধির পর সর্বত্র যখন শান্তি ও নিরাপত্তা-পরিস্থিতি বিরাজ করে, সার্বিক পরিস্থিতি যখন অনুকূলে চলে আসে, তখন ইসলামের প্রচার-প্রসার আরও বিস্তৃত আঙ্গিকে শুরু হয়। এ জন্য হুদায়বিয়ার সন্ধিকে আসমানি দপ্তরে (আল্লাহর কাছে) বিজয় গণ্য করা হয়েছিল। কিন্তু এরপরও কিছু মানুষ কাফির কুরাইশদের ভয়ে ইসলামগ্রহণ করতে পারছিলেন না। তাঁদের জন্য মক্কাবিজয় সেই বাধাও দূর করে দেয়। ফলে তখন **

থেকেই সমগ্র আরবে পবিত্র কুরআন তার নিজের অলৌকিক ক্ষমতাবলে মানুষের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে। এর অনিবার্য ফল দাঁড়ায়-একসময় যাঁরা ইসলাম ও মুসলিমদের চেহারাও দেখতে চাইতেন না, আজ তাঁরাই দলে দলে নবিজির খিদমতে আসতে থাকে এবং স্বেচ্ছায় ইসলামগ্রহণ করে নিজেদের জানমাল উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে যান। এসব প্রতিনিধিদলের অধিকাংশই নবম হিজরিতে নবিজির খিদমতে উপস্থিত হয়।

বনু সাকিফের প্রতিনিধিদল:

তাবুকযুদ্ধের পর বনু সাকিফের প্রতিনিধিদল মদিনায় নবিজির খিদমতে এসে ইসলামগ্রহণ করে।

এরপর ধারাবহিকভাবে প্রতিনিধিদলের আগমন শুরু হয়। এসব প্রতিনিধিদলের সংখ্যা ৭০ পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়।” তন্মধ্যে কয়েকটির বর্ণনা নিচে তুলে ধরা হলো:

বনু ফাজারার প্রতিনিধিদল:

এই গোত্রের লোকেরা মদিনায় আসার আগেই ইসলামগ্রহণ করেন। এরপর তাঁরা প্রতিনিধিদল হিসেবে মদিনায় নবিজির খিদমতে উপস্থিত হন।চাঁদার প্রচলন

বনু তামিমের প্রতিনিধিদল:

বনু তামিমের প্রতিনিধিদল নবিজির খিদমতে এসে কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর তাঁরা সবাই মুসলমান হয়ে যান।

বনু সাআদ ইবনু বকরের প্রতিনিধিদল:

এই প্রতিনিধিদলের নেতা ছিলেন জিমাম ইবনু সালাবা। তিনি নবিজিকে বেশ কিছু প্রশ্ন করেন। রাসুল তাঁর সব প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দেন। ইসলাম সম্পর্কে বিস্তারিত যাচাই-বাছাইয়ের পর তাঁর অন্তর থেকে যখন সব দ্বিধা-সন্দেহ দূর হয়ে যায়, তখন তিনি ইসলামগ্রহণ করেন। এরপর আপন গোত্রে ফিরে গিয়ে ইসলামের প্রচার করতে থাকেন। ফলে একপর্যায়ে তাঁর গোত্রের সবাই মুসলমান হয়ে যান।

৫. কিন্দার প্রতিনিধিদল

পবিত্র কুরআনের সুরা সাফফাতের প্রথম দিকের কয়েকটি আয়াত শুনেই এই প্রতিনিধিদলের অন্তরে ইসলাম ঠাঁই করে নেয়। তাঁরা সবাই মুসলমান হয়ে যান।

বনু আবদুল কায়েসের প্রতিনিধিদল:

এই গোত্রের সবাই খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত ছিলেন। এরপর তাঁরা নবিজির খিদমতে এসে মুসলমান হন। তিনি এ সময় ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি তাঁদের শিক্ষা দেন।

বনু হানিফের প্রতিনিধিদল:

এই গোত্রের প্রতিনিধিদল নবিজির খিদমতে এসে মুসলমান হয়। তাদের মধ্যে মুসায়লিমাও ছিল। সে পরবর্তী সময়ে নবুওয়াতের মিথ্যা দাবির কারণে 'মুসায়লিমাতুল কাজ্জাব' নামে কুখ্যাতি লাভ করে। আবু বকর রা.-এর খিলাফতকালে তার সকল অনুসারীসহ সাহাবিদের হাতে নিহত হয়।

বনু কাহতানের প্রতিনিধিদল:

এই গোত্রের নেতা ছিলেন জায়েদ আল খায়ল। তাঁরা নবিজির খিদমতে এসে সবাই মুসলমান হয়ে যান।

বনু হারিসের প্রতিনিধিদল:

এই প্রতিনিধিদলে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা. ছিলেন। তিনি তাঁর সঙ্গীসাথিদের নিয়ে মুসলমান হয়ে যান।***

এভাবে বনু আসআদ, বনু মুহারিব, হামদান, গাসসান ইত্যাদি গোত্রের প্রতিনিধিদের মধ্যে কেউ কেউ নবিজির খিদমতে আসার আগে; আবার কেউ কেউ এসে ইসলামগ্রহণ করেন। হিমইয়ারের বিভিন্ন গোত্রের নেতাদের নিজ নিজ গোত্রের বাদশাহ মনে করা হতো। তাঁদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি এসে নবিজিকে সংবাদ দেন যে, তাঁরা সবাই স্বেচ্ছায় মুসলমান হয়ে গেছেন।

এভাবে পায়ে হেঁটে অথবা বাহনে চড়ে প্রতিনিধিদল নবিজির খিদমতে এসে ইসলামগ্রহণ করতে থাকে।

আবু বকরকে হজের আমির নির্ধারণ:

তাবুকযুদ্ধের পর নবম হিজরির জিলকদে নবিজি ঐ আবু বকর রা.-কে হজের আমির নির্ধারণ করে মক্কায় পাঠান।

বিদায় হজ্জ

"নিশ্চয়ই মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর নির্মাণ করা হয়েছিল তা মক্কায়, বরকতময় ও বিশ্ববাসীর হিদায়াতের দিশারী বানানো হয়েছিল (এ ঘরকে)।

এখানে রয়েছে আল্লাহর স্পষ্ট নির্দশনসমূহ, (আরও রয়েছে) মাকামে ইবরাহীম। আর এ ঘরে যে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ হয়ে যাবে। মানবজাতির ওপর আল্লাহর জন্য এই

দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তির এই ঘর পর্যন্ত পৌঁছানোর সামর্থ্য থাকবে, সে যেন এই ঘরের হজ্জ আদায় করে..." (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ৯৬-৯৭)

রাসূলুল্লাহ হিজরতের দশম বছরে হজ্জ করেছিলেন। এই হজ্জকেই বলা হয় বিদায় হজ্জ। এই হাজ্জেই রাসূলুল্লাহ মুসলিম উমাতের উদ্দেশ্যে চূড়ান্ত ভাষণ প্রদান করেন। সকল মুসলিম সম্মিলিতভাবে শেষবারের মতো রাসূলুল্লাহকে শোনার সুযোগ পায়। মদীনা থেকে তিনি এই একবারই হজ্জ করেছিলেন। দেখার ও

রাসূলুল্লাহ উটে চড়ে হজ্জ করেছিলেন। তাঁর এই হাজ্জে কোনো বিলাসিতা ছিল না, নিতান্তই সাদাসিধেভাবে তিনি হজ্জ সম্পন্ন করেছিলেন। সেই হজ্জ এখনকার মতো ভিআইপি হজ্জ ছিল না। আল্লাহর রাসূল মুসলিমদের হজ্জের নিয়মকানুন ব্যাখ্যা করলেন, এরপর যখন তিনি আরাফাতের ময়দানে তখন আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করলেন,

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিআমত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে।" (সূরা মায়িদা, ৫: ৩)

এই আয়াত নাযিল হলে সাহাবিরা কাঁদতে শুরু করেন। তারা বুঝতে পারলেন আল্লাহর রাসূল আর বেশিদিন তাদের মাঝে থাকবেন না। উমারকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তিনি কেন কাঁদছেন। তিনি উত্তর দেন, 'যখন কোনো কিছুর উত্থান ঘটে আর সেটা পরিপূর্ণতা লাভ করে, এরপর তার কেবল পতনই সম্ভব।' উমার বলতে চাচ্ছিলেন, ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। মুসলিমরা এই শ্রেষ্ঠত্ব কিছুকাল ধরে রাখবে, এরপর আস্তে আস্তে তাদের পতন হবে। এজন্যই আমরা বিশ্বাস করি, সাহাবিদের যুগ ছিল শ্রেষ্ঠ সময়, সেই স্বর্ণযুগ আর কখনো ফিরে আসবে না।

মাসজিদ আল-হারামে এসেই আল্লাহর রাসূল কালো পাথর স্পর্শ করে চুমু খেলেন। এরপর তাওয়াফ শুরু করলেন। প্রথম তিনবারের তাওয়াফ ছিল দ্রুতগতির তাওয়াফ,

আর পরের চারবার ছিল সাধারণ গতিতে। এরপর তিনি কুরআনের একটি আয়াত পাঠ করলেন,

"আর স্মরণ করো, যখন আমি কাবাকে মানুষের জন্য মিলনকেন্দ্র ও নিরাপদ স্থান বানালাম এবং (আদেশ দিলাম যে.) তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ করো। আর আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম যে, তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী ও রুকুকারী-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র করো।" (সূরা বাকারাহ, ২: ১২৫)

এরপর তিনি মাকামে ইবরাহীমকে তাঁর আর কাবার মাঝে রেখে দুই রাকাত সালাত আদায় করলেন। এরপর তিনি আবার কালো পাথর স্পর্শ করলেন, চুমু খেলেন। এরপর পাঠ করলেন সূরা বাকারাহ অন্য একটি আয়াত।

"নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে বাইতুল্লাহর হজ্জ করবে কিংবা উমরা করবে তার কোনো অপরাধ হবে না যে, সে এগুলোর তাওয়াফ করবে। আর যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কল্যাণ করবে, তবে, নিশ্চয় আল্লহ শোকরকারী, সর্বজ্ঞ।

এরপর আল্লাহর রাসূল সাফা ও মারওয়ার মাঝে 'সাঈ' করলেন সাতবার। আল্লাহর রাসূল উরানাহ উপত্যকায় এসে সবার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন, যেটা বিদায় হজ্জের ভাষণ নামে পরিচিত। তিনি বললেন,

'লোকেরা, তোমরা মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শোনো! হয়তো আজকের পর আমি আর কখনো এখানে তোমাদের সঙ্গে একত্রিত হতে পারবো না।

আজকের এই দিন, এই মাস ও এই শহর যেমন পবিত্র; তোমাদের জান, মাল, ইজ্জত কিয়ামত পর্যন্ত তেমনই পবিত্র। কারো কাছে যদি কোনো আমানত রক্ষিত থাকে, তাহলে সে যেন তা আমানতকারীর কাছে পৌঁছে দেয়। তোমরা অন্যের ওপর অত্যাচার করবে না, নিজেরাও অত্যাচারিত হবে না।

জেনে রেখো, জাহিলী যুগের সকল অপসংস্কৃতি আমার পায়ের নিচে। শুধু কাবাঘরের তত্ত্বাবধান ও হাজীদের পানি পান করানো ছাড়া। জাহিলিয়াতের সকল রক্তপণের দাবি বাতিল করা হলো। প্রথম যে রক্তপণের দাবি বাতিল করছি, তা হলো রবিয়া ইবন হারিস ইবন আবদুল মুত্তালিবের রক্ত। সে শিশু অবস্থায় বনু সাদের দুগ্ধপোষ্য ছিল, তখন হুযায়ল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে।

জাহেলী যুগের সুদের প্রথা বিলুপ্ত করা হলো। তোমাদের কেবল মূলধনের ওপর অধিকার থাকলো। সর্বপ্রথম যে সুদ বাতিল করছি, তা হলো আমার

বংশের আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিবের সুদ। তার সমস্ত সুদ বাতিল করা হলো।

নারীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নারীদের উপর যেমন পুরুষদের অধিকার রয়েছে, তেমনি পুরুষদের উপর রয়েছে নারীদের অধিকার। তোমরা তাদের আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর নির্ধারিত কালিমা বাক্যের মাধ্যমে তাদের লজ্জাস্থান নিজেদের জন্য হালাল করেছো। তাদের উপরে তোমাদের অধিকার এই যে, তোমরা অপছন্দ করো এমন কাউকে ঘরে প্রবেশের অনুমতি দেবে না। যদি তারা এরূপ করে, তবে হালকাভাবে প্রহার কর। আর তোমাদের উপর তাদের অধিকার হলো, তোমরা তাদের ভরণ-পোষণ ও পোশাক-পরিচ্ছেদের ভার বহন করবে ন্যায়সঙ্গতভাবে।

আমার পর তোমরা পরস্পর খুনোখুনিতে জড়িয়ে কুফরে পতিত হয়ো না। যারা সালাত আদায় করবে, তারা (পুনরায়) শয়তানের ইবাদাত করবে, এটা শয়তান আশা করে না। কিন্তু সে তোমাদের মধ্যে বিবাদ করতে থাকবে।

তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে। যদি বিকলাঙ্গ কোনো দাসও তোমাদের উপর নেতা নিযুক্ত হয় এবং সে তোমাদের আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী নেতৃত্ব দেয়, তাহলে তাঁকে শুনবে ও মানবে।

সাবধান! অপরাধী তার অপরাধের জন্য নিজেই দায়ী। সাবধান! পিতার অপরাধ সন্তানের ওপর বর্তায় না, না বর্তায় সন্তানের অপরাধ পিতার ওপরে। জেনে রেখো, এ নগরে আর

কখনো শয়তানের ইবাদাত হবে না, এ থেকে সে নিরাশ হয়ে গেছে। তবে তুচ্ছ ভেবে এমন অনেক কাজ তোমরা করবে, যা করলে সে খুশি হবে।

তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করবে, দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, রামাদান মাসে সিয়াম পালন করবে, যাকাত আদায় করবে ও তোমাদের নেতার আদেশ মেনে চলবে, তবে তোমরা জান্নাত লাভ করবে।

তোমাদের গোলাম ও অধীনস্থদের বিষয়ে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। তোমরা যা খাবে, তাদেরকে তা খেতে দেবে। তোমরা যা পরবে তাদেরকেও সেভাবে পরতে দেবে।জেনে রেখো, এক মুসলিম আরেক মুসলিমের ভাই। তোমাদের একের সম্পদ আরেকজনের জন্য বৈধ নয়। তবে কেউ স্বেচ্ছায়, খুশি মনে তার সম্পদ কাউকে দিয়ে দিলে সেটা ভিন্ন কথা। কাজেই নিজেরা নিজেদের ওপর জুলুম কোরো না।

আল্লাহ তাআলা তোমাদের সম্পদের মিরাস নির্দিষ্টভাবে বণ্টন করে দিয়েছেন। তার থেকে কম বেশি করবে না। সম্পদের তিন ভাগের এক ভাগের চেয়ে অতিরিক্ত কোনো অসিয়ত বৈধ নয়। সন্তান যার বিছানায় জন্ম গ্রহণ করবে, সে তারই হবে। ব্যভিচারের শাস্তি হচ্ছে প্রস্তরাঘাত। (অর্থাৎ সন্তানের জন্য শর্ত হলো তা বিবাহিত দম্পতির হতে হবে। ব্যভিচারীর সন্তানের অধিকার নেই)। যে সন্তান আপন পিতা ব্যতীত অন্যকে পিতা এবং যে দাস নিজের মালিক ব্যতীত অন্য কাউকে মালিক বলে স্বীকার করে, তাদের উপর আল্লাহ তাআলা, ফেরেশতাকুল এবং সমগ্র মানব জাতির অভিশাপ।

নিশ্চয়ই তোমাদের রব এক, তোমাদের পিতা এক। আরবের ওপর অনারবের এবং অনারবের ওপর আরবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই, সাদার উপর কালোর আর কালোর উপর সাদার কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হবে কেবল তাকওয়ার মাপকাঠিতে।

মনে রেখো, সকলকে একদিন আল্লাহ তাআলার সামনে হাজির হতে হবে। সে দিন তিনি প্রতিটি কাজের হিসাব গ্রহণ করবেন। তোমরা আমার পরে গোমরাহিতে লিপ্ত হবে না, পরস্পর হানাহানিতে মেতে উঠবে না। আমি শেষ নবী, আমার পরে আর কোনো নবী আসবে না। আমার মাধ্যমে ওয়াহীর পরিসমাপ্তি হতে যাচ্ছে। আমি তোমাদের জন্য দুটি

বস্তু রেখে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা এই দুটি বস্তু আঁকড়ে থাকবে, ততদিন তোমরা নিঃসন্দেহে পথভ্রষ্ট হবে না। একটি আল্লাহর কিতাব ও অপরটি রাসূলের সুন্নাহ।

প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে আমার কথাগুলো পৌঁছিয়ে দেয়। হতে পারে, যাদের কাছে পৌঁছানো হবে তাদের মধ্যে এমন অনেকে থাকবে যারা উপস্থিত শ্রোতার চাইতে আমার কথাগুলো ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারবে।'

খুতবা শেষে আল্লাহর রাসূল সাহাবিদের জিজ্ঞেস করলেন,

'তোমাদেরকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা তখন কী বলবে?'

সাহাবিরা উত্তর দিলেন, 'আমরা সাক্ষ্য দেবো, নিশ্চয়ই আপনি আপনার বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন, দায়িত্ব পালন করেছেন এবং আমাদের আন্তরিক উপদেশ দিয়েছেন।' এরপর আল্লাহর রাসূল আকাশের দিকে আঙুল তুললেন, এরপর আবার মানুষের দিকে আঙুল দেখালেন, এরকম কয়েকবার করলেন আর বলতে থাকলেন,

'হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো। হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো! হে আল্লাহ। তুমি সাক্ষী থেকো।'

উসামা ইবন যায়িদের নেতৃত্বে অভিযান:

হিজরতের একাদশ বছর। রাসূলুল্লাহ হজ শেষে মদীনায় ফিরে এসেছেন। মুহাররম মাস সেখানেই থাকলেন। সফর মাসে রাসূলুল্লাহ উসামা ইবন যায়িদ ইবন হারিসাকে একটি বাহিনীর প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করলেন। এই সেনাবাহিনী যাবে আশ শামে, রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। এর আগে রোমানদের বিরুদ্ধে মুতার যুদ্ধ হয়েছিল, তখন আমীর ছিলেন উসামার বাবা--আল্লাহর রাসূলের ইসলাম পূর্বযুগের

পালকপুত্র-- যাইদ ইবন হারিসা । সে যুদ্ধেই তিনি শহীদ হয়ে যান। এরপর তাবুকের যুদ্ধে আল্লাহর রাসুল নিজে অংশ নেন কিন্তু রোমানরা সেবার যুদ্ধ করতে আসেনি।

সেই একই রোমানদের বিরুদ্ধে তৃতীয় বারের মতো বাহিনী পাঠানো হচ্ছে, মুসলিমদের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তারই আমীর নির্ধারিত হলেন তরুণ সাহাবি উসামা । এই অভিযানে উসামাকে আল্লাহর রাসূল ও তার বাবার শহীদ হওয়ার স্থানে যেতে নির্দেশ দেন।

উসামার বয়স তখন মোটে আঠারো কি বিশ। মুহাজির এবং আনসারদের মধ্যে তখন প্রবীণ অনেক সাহাবিই ছিলেন, যারা কেবল বয়সেই বড় নন, বরং, জিহাদ, নেতৃত্ব আর সেনাবাহিনীর বিভিন্ন বিষয় ব্যবস্থাপনায়ও অভিজ্ঞ। সেখানে রাসূলুল্লাহ কি না এমন একজন তরুণ সাহাবিকে আমীর হিসেবে নিয়োগ দিলেন, যার অধীনে আবু বকর ও উমারের মতো সাহাবিরা যুদ্ধ করবেন!

ফলে এটা নিয়ে কিছুটা কানাঘুষা শুরু হয়। মুসলিম সমাজের আকার তখন আগের চাইতে অনেক বড়, তাই অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা আর কানাঘুষার মাত্রাও বেড়ে গিয়েছিল। আর মুনাফিকরা তো ছিলই, যারা ছিদ্রান্বেষণ আর সমালোচনার সুযোগ হাতছাড়া করতো না।

কানাঘুষা হলো দুটো বিষয়কে ঘিরে। প্রথম অভিযোগ ছিল, উসামার বয়স কম, আর দ্বিতীয় অভিযোগ তিনি দাস শ্রেণির। উসামার বাবা যাইদ এক সময় দাস ছিলেন, তার মা উম্ম আয়মানও দাসী ছিলেন, দাসের সন্তান হয়ে উসামা কীভাবে স্বাধীন মানুষের ওপর নেতৃত্ব পেতে পারে-- কেউ কেউ এটা মানতেই পারছিল না। রাসূলুল্লাহর কানে সে সব কথা এলে তিনি বললেন, 'তোমরা উসামার নিয়োগ নিয়ে বিতর্ক করছো? এর আগে তোমরা তার বাবার নিয়োগ পাওয়া নিয়েও বিতর্ক করেছিলে! আল্লাহর কসম করে বলছি, তার বাবা নেতা হিসেবে যোগ্য ব্যক্তি ছিল, সে ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষদের একজন। আর তার ছেলে তার পরে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় মানুষ।’

জীবন সায়াহ্নে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

আল্লাহর রাসূলের সীরাতের সফলতম সময় চলছিল। আল্লাহর রাসূলকে নবুওয়াতের যে মিশন দিয়ে পাঠানো হয়েছিল, সে মিশনের পূর্ণতাপ্রাপ্তি হয়েছে। আজ থেকে তেইশ বছর

আগে যে তাওহীদের বার্তা নিয়ে তিনি এসেছিলেন, সেই বার্তাকে লোকেরা এখন সাদরে গ্রহণ করেছে। আরব উপদ্বীপ থেকে শিরক বিতাড়িত হয়েছে, আল্লাহর ঘর কাবায় তাওহীদ প্রত্যাবর্তন করেছে। সমগ্র আরব ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়েছে, আরবের চারপাশে ইসলাম কড়া নাড়তে শুরু করেছে। আর আল্লাহর ইচ্ছায় রাসূল এমন এক প্রজন্মকে তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন যারা ইসলামের এই বিজয় মশাল পুরো বিশ্বে বহন করে নেওয়ার যোগ্যতা রাখেন। দুনিয়ার বুকে মুসলিমদের জীবন কীভাবে পরিচালিত হবে তার বাস্তব উদাহরণ মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের মাধ্যমে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর রাসূল তাঁর ওপর আরোপিত গুরুদায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন, তাঁর বিদায় নেওয়ার সময়ও তাই ঘনিয়ে এসেছে।

আল্লাহর রাসূল যে দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবেন, সে ব্যাপারে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল আগে থেকেই বেশ কিছু আয়াত নাযিল করেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন,

"আপনার জন্যে পরকাল ইহকাল অপেক্ষা শ্রেয়। আপনার রব শীঘ্রই আপনাকে এমন কিছু দেবেন যে আপনি খুশি হবেন।” (সূরা আদ দুহা, ৯৩: ৪-৫)

"নিশ্চয়ই আপনারও মৃত্যু হবে এবং তাদেরও মৃত্যু হবে। অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমরা সবাই তোমাদের রবের সামনে বাকবিতণ্ডা করবে।” (সূরা যুমার, ৩৯: ৩০-৩১)

"আপনার আগেও কোনো মানুষকে আমি অনন্ত জীবন দান করিনি। সুতরাং আপনার মৃত্যু হলে তারা কি চিরঞ্জীব হবে? প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভালো দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।” (সূরা আম্বিয়া, ২১: ৩৪-৩৫)

"আর মুহাম্মাদ কেবল একজন রাসূল। তার আগে নিশ্চয়ই অনেক রাসূল বিগত হয়েছে। যদি তিনি মারা যান অথবা তাঁকে হত্যা করা হয়, তবে তোমরা কি পেছনে ফিরে যাবে? আর যে ব্যক্তি পেছনে ফিরে যায়, সে কখনো আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারে না। আর আল্লাহ অচিরেই কৃতজ্ঞদের প্রতিদান দেবেন।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১৪৪)

"ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সব কিছু নশ্বর, অবিনশ্বর শুধু তোমার রবের মুখমণ্ডল যিনি মহিমাময়, মহানুভব।" (সূরা আর-রাহমান ৫৫: ২৬, ২৭)
"আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।" (সূরা মায়েদা, ৫: ৩)

এখানে রাসূলুল্লাহর মৃত্যুর সরাসরি কোনো ইঙ্গিত না থাকলেও রাসূলুল্লাহর মিশনের পূর্ণতা প্রাপ্তির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ আযযা ওয়া জাল আরও বলেন,

"যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়, এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাকারী।" (সূরা আন-নাসর, ১১০)

সূরা নাসরে আল্লাহর রাসূলের জীবনাবসানের ইঙ্গিত থাকার প্রসঙ্গে একটি কাহিনী আছে। আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস ছিলেন একজন তরুণ সাহাবি, কিন্তু তিনি বয়স্ক মুহাজির ও আনসারদের সাথে উমার ইবন খাত্তাবের দরবারে বসতেন। এত কমবয়স্ক একজন সাহাবির উপস্থিতিতে প্রবীণ মুহাজির এবং আনসাররা কিছুটা অস্বস্তি বোধ করতেন, তারা একদিন বললেন, 'এই যুবক আমাদের সাথে কেন বসছে?'

উমার তাদের প্রশ্নের জবাবটা একটু ঘুরিয়ে দিলেন, বললেন, 'আচ্ছা, সূরা নাসর থেকে আপনারা কে কী বোঝেন?' সবাই নিজ নিজ ব্যাখ্যা দিল। উমার এরপর ইবন আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি এই সূরা থেকে কী বোঝো?' ইবন আব্বাস বললেন, 'আমি এই সূরা থেকে রাসূলুল্লাহর মৃত্যুর ব্যাপারে ইঙ্গিত পাই।' উমার বললেন, 'আর আমিও তা-ই বুঝি।' এর মাধ্যমে উমার উপস্থিত সাহাবিদের বুঝিয়ে দিলেন যে, ইবন আব্বাসের ৪ বয়স কম হতে পারে, কিন্তু কুরআনের বিষয়ে তার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কারণে তিনি উমারের দরবারে অন্য প্রবীণ সাহাবিদের সাথে স্থান পেয়েছেন। সাধারণত কোনো কাজ শেষ করার পর আল্লাহ আযযা ওয়া জালের কাছে ইসতিগফার করা হয়। এই সূরায় আল্লাহ বলছেন, যখন আল্লাহর দ্বীনের বিজয় আসবে, মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করবে, তখন

আল্লাহর রাসূল যেন ইসতিগফার করেন। এই ইসতিগফার তাঁর দাওয়াহ মিশনের সমাপ্তির দিকে ইঙ্গিত করে।

আল্লাহর রাসূলের মৃত্যুর দিকে ইঙ্গিত করে এমন বেশ কিছু হাদীস রয়েছে। রাসূলুল্লাহ মুআয ইবন জাবালকে ইয়েমেনে পাঠানোর সময় বলেন, 'তোমার সাথে হয়তো আমার আর দেখা হবে না।' এ কথা শুনে মুআয কাঁদতে থাকেন। অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ ওঁ বলেছেন, 'আমার কাছ থেকে হজ্জের নিয়ম শিখে নিও, কেননা এই বারের পর হয়ত আমি আর কখনো হজ্জ করতে পারবো না।' আরও একটি হাদীস আছে সহীহ বুখারিতে, সেটি বর্ণনা করেছেন আইশা। তিনি বলেন,'একবার আমরা নবীজির সব স্ত্রী একসাথে বসে আছি, এমন সময় ফাতিমা পায়ে হেঁটে আসছিলেন। আল্লাহর কসম! তাঁর হাঁটা যেন অবিকল রাসূলুল্লাহর হাঁটার মতো ছিল। মেয়েকে দেখে নবীজি স্বাগত জানালেন, বললেন, 'আমার মেয়ের আগমন শুভ হোক!' তারপর তাঁকে নিজের পাশে বসালেন। এরপর ফাতিমাকে কানে-কানে কিছু একটা বললেন, আর ফাতিমা খুব করে কাঁদতে লাগলেন। তাঁর অস্থিরতা দেখে দ্বিতীয়বার তাঁর কানে-কানে কিছু একটা বললেন। তখন ফাতিমা হাসতে লাগলেন!

নবীজির স্ত্রীদের মধ্য থেকে আমি বলে উঠলাম, আমাদের উপস্থিতিতে আল্লাহর রাসূল সবার মাঝে আলাদা করে তোমাকে গোপনে একটা কথা বলেছেন, আর তুমি কাঁদছো। এরপর যখন নবীজি উঠে চলে গেলেন, তখন আমি ফাতিমাকে জিজ্ঞেস করলাম যে, আচ্ছা, উনি তোমাকে কানে-কানে কী বলেছিলেন? ফাতিমা বললেন, আমি রাসুলুল্লাহর গোপন কথা ফাঁস করবো না। এরপর যখন রাসূলুল্লাহর মৃত্যু হলো, আমি তাঁকে বললাম, তোমার ওপর আমার দাবি থেকে জানতে চাই, তুমি কি আমাকে তাঁর গোপন কথাটি বলবে না? ফাতিমা বললেন, হ্যাঁ, এখন তোমাকে জানাবো। প্রথমবার তিনি আমাকে গোপনে বলেছিলেন, জিবরীল প্রতি বছর এসে পূর্ণ কুরআন একবার আমার নিকট পেশ করতেন। কিন্তু এ বছর তিনি এসে তা আমার কাছে দু'বার পেশ করেছেন। এতে আমি ধারণা করছি যে, আমার চির বিদায়ের সময় চলে এসেছে। সুতরাং তুমি আল্লাহকে ভয় করে চলবে আর বিপদে ধৈর্যধারণ করবে। নিশ্চয়ই আমি তোমার জন্য উত্তম অগ্রগামী। তখন আমি কাঁদতে থাকি, যা তুমি নিজেই দেখেছো। আর এরপর অস্থিরতা দেখে আমাকে দ্বিতীয়বার কানে-কানে বললেন, ফাতিমা, তুমি কি এটা পছন্দ করো না যে তুমি মু'মিন নারীদের সর্দার হবে

অথবা এই উমাতের নারীদের সর্দার হবে? তখন আমি হেসে দিলাম, সেটাও তুমি দেখেছো। 116

সে বছর সফর মাসের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ একদিন মাঝরাতে আবু মুওয়াইহিবাকে ডেকে বললেন, 'আবু মুওয়াইহিবা, আমাকে বাক্বী'র অধিবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য আদেশ করা হয়েছে। চলো আমার সাথে।' আবু মুওয়াইহিবা ছিলেন আল্লাহর রাসূলের আযাদকৃত দাস। আল বাকী' হলো মদীনার কবরস্থান। সেখানে সমাহিত করা হয়েছে সেইসব সাহাবিদের যারা রাসূলুল্লাহর সাথে কষ্ট করেছেন, যুদ্ধ করেছেন, ইসলামের জন্য জান দিয়েছেন। গভীর রাত। রাসূলুল্লাহ বাকীতে গেলেন,

'হে কবরবাসী, তোমাদের প্রতি সালাম। তোমরা যে অবস্থায় আছো, সেটা জীবিতদের চাইতে ভালো। তোমরা সুখী হও। আঁধার রাতের মতো ধেয়ে আসছে ফিতনা-ফাসাদ-একটার পেছনে আরেকটা, আর প্রথমটার চাইতে পরেরটা ভয়াবহ।'

এরপর রাসূলুল্লাহ ও আবু মুওয়াইহিবার দিকে তাকালেন। বললেন, 'আমাকে এই দুই এর মাঝে একটি বাছাই করতে বলা হয়েছিল, হয় আমি দুনিয়ার সমস্ত রত্নভাণ্ডার আর সম্পদের চাবি নিয়ে শেষ পর্যন্ত থাকবো। এরপর জান্নাতে যাবো। অথবা আমার রবের সাথে সাক্ষাৎ এবং জান্নাত।'

আবু মুওয়াইহিবা বললেন, 'আমার পিতামাতা আপনার প্রতি কুরবান হোক। আপনি দুনিয়ার রত্নভাণ্ডার, শেষপর্যন্ত দুনিয়াতে থেকে তারপর জান্নাত -- এই সুযোগটাই বেছে নিন।' রাসূলুল্লাহ বললেন,

'না, আল্লাহর কসম, আমি আমার রবের সাথে মিলিত হওয়া এবং জান্নাতকেই বেছে নিয়েছি।'

বিশাল এক নেতা অথচ কত নির্মোহ। দুনিয়া, সম্পদ, বাড়িগাড়ি এসবের প্রতি রাসূলুল্লাহর কখনোই কোনো আকর্ষণ ছিল না, লোভ তো দূরেরই কথা। তাঁর উদ্বেগ ছিল উম্মাহকে ঘিরে, 'দুনিয়া ছিল রাসূলুল্লাহর চোখে তুচ্ছ, আর আল্লাহর কাছেও অতি তুচ্ছ, এতটাই

তুচ্ছ যে দুনিয়া ছেড়ে যাবার সময় রাসূলুল্লাহ কিছুই রেখে যাননি।' রাসূলুল্লাহ এই উম্মাহর জন্য জীবনভর কষ্ট করেছেন। আজকে সমগ্র আরব তাঁর পদানত, কিন্তু এই বিশাল অর্জন কোনো নিরাপদ , ঝুঁকিহীন, নির্ঝঞ্ঝাট পথে হয়নি।আরাম,আয়েশ বলে কোন বস্তু রাসূলের জীবনে ছিল না। এমনকি ঘুমের মধ্যেও তাঁর অন্তর জাগ্রত থাকতো। নবুওয়াতের সেই প্রথম দিন থেকেই বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে, প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। দারিদ্র্য, কষ্ট আর দুর্দশা ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। আর তাঁর এই ত্যাগ-তিতিক্ষার সুফল ভোগ করে আজ আমরা মুসলিম। তাঁর এই কষ্ট, তাঁর এই ত্যাগ ছিল আমাদের জন্য, আমার-আপনার কাছে দ্বীন ইসলামকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। নিঃসন্দেহে আমরা রাসূলুল্লাহ কাছে ঋণী। রাসূলুল্লাহ বাক্বী'বাসীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে সেখান থেকে চলে এলেন। এর পরপরই রাসূলুল্লাহ অসুস্থ হয়ে পড়েন।

বিদায়বেলা

আল্লাহর রাসূল মৃত্যুশয্যায় শায়িত। আইশা এ পাশেই ছিলেন। প্রচণ্ড মাথাব্যথায় কাতর হয়ে আইশা বলছিলেন, 'উহ ব্যথায় মারা যাচ্ছি।' রাসূলুল্লাহ তখন রসিকতা করে বললেন, 'যদি তা-ই হয়, আমি তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারবো, তোমার জন্য দুআ করতে পারবো।' আইশা ঞ্জ তখন স্বভাবসুলভ অভিমানী ভঙ্গিতে বললেন, 'হ্যাঁ, আপনি তো সেটাই চান। আমি মরে গেলে তো আপনি অন্য স্ত্রীদের কাছে যেতে পারবেন।' রাসূলুল্লাহ । তখন বললেন, 'আমারই বরং বলা উচিত- ব্যথায় মারা যাচ্ছি!'

রাসূলুল্লাহর ছিল প্রচণ্ড জ্বর। এক সাহাবি রাসূলুল্লাহর মাথায় হাত রেখে বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার তো প্রচণ্ড জ্বর!' রাসূলুল্লাহ তখন বললেন, 'হ্যাঁ, আমরা নবীরা অন্য যে কারো চেয়ে দ্বিগুণ কষ্ট ভোগ করে থাকি।' আল্লাহ আযযা ওয়া জাল তাঁদের বেশি ভালোবাসেন, তাই তাঁদের পরীক্ষাগুলো বেশি কঠিন, কষ্টগুলো বেশি তীব্র, আর পুরস্কারও অন্যদের চাইতে বেশি।

শেষ দিনগুলো আল্লাহর রাসূল কাটিয়েছেন স্ত্রী আইশার ঘরে। অন্য স্ত্রীরা তাতে সায় দিয়েছিলেন, কারণ রাসূলুল্লাহ তখন এতটাই অসুস্থ হয়ে পড়েন যে প্রত্যেকের ঘরে যাওয়া

তাঁর জন্য খুব কষ্টকর হয়ে পড়ে। দু'জনের কাঁধে ভর দিয়ে তাকে আইশার ঘরে আসতে হয়। শেষ দিনগুলোতে একদিন রাসূলুল্লাহ মসজিদে যেতে চাইলেন। তিনি চাইলেন মানুষদের কিছু নাসীহা দেবেন। বললেন, 'আমার গায়ে সাত বালতি পানি ঢেলে দাও, আমি মানুষের কাছে গিয়ে কিছু কথা বলতে চাই।' রাসূলুল্লাহর শরীরে ঠাণ্ডা পানি ঢালা হলো যেন শরীরের তাপমাত্রা কমে আসে আর তিনি মসজিদে যেতে পারেন। রাসূলুল্লাহকে মসজিদে নিয়ে যাওয়া হলো, তাঁর মাথা কালো কাপড়ে জড়ানো ছিল। রাসূলুল্লাহ একা হাঁটতে পারছিলেন না, তাঁর পা মাটিতে ঘষা খাচ্ছিল, তাই অন্যের ওপর ভর করে তাঁকে মসজিদে যেতে হলো।

রাসূলুল্লাহ প্রথমেই আল্লাহ আযযা ওয়াজালের প্রশংসা করলেন। এরপর উহুদের শহীদদের কথা স্মরণ করলেন, তাদের জন্য সালাত পাঠ করলেন এবং মাগফিরাতের দুআ করলেন। এরপর মুহাজিরদের উদ্দেশ্য করে বললেন,

'মুহাজিররা শোনো, তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু আনসারদের সংখ্যা কমে আসছে। শুরুর দিকে তারাই আমাকে সাহায্য করেছে। তোমরা তাদের প্রতি সদয় হবে। কাজেই, তাদের মধ্যে যারা উত্তম, তাদের সাথে ভালো আচরণ কোরো, আর যারা ভুল-ত্রুটি করে, তাদের ক্ষমা করে দিও।'

এরপর রাসূলুল্লাহ বললেন,

'আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এমন একজন বান্দা আছে যাকে দুনিয়ার শান- শওকত অথবা আল্লাহর কাছে যা আছে- এই দুইয়ের যেকোনো একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।'

আল্লাহর রাসূল আসলে নিজের কথাই বলছিলেন, কিন্তু কে এই বান্দা সেটা আবু বকর ছাড়া আর কেউই বুঝতে পারলো না। আবু বকর কাঁদতে শুরু করলেন। সাধারণ মানুষের কাছে মৃত্যুর ফেরেশতা হঠাৎ করে আসে। কিন্তু নবীদের কাছে জান কবজের আগে তাঁদের অনুমতি গ্রহণ করা হয়। আবু বকর কাঁদতে কাঁদতেই বললেন, 'আমরা আর আমাদের সন্তানরা আপনার জন্য কুরবান হয়ে যাক!'

রাসূলুল্লাহ আবু বকরকে থামিয়ে দিয়ে বললেন,

'বন্ধুত্ব আর অর্থ-সম্পদের ত্যাগ স্বীকারে যে মানুষটি আমার প্রতি সবচেয়ে বেশি ইহসান করেছে, সে হচ্ছে আবু বকর। আমি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে খলিল হিসেবে গ্রহণ করতাম, তাহলে আবু বকরকেই নিজের খলিল বানাতাম। কিন্তু আমার সাথে আবু বকরের সম্পর্ক হলো ইসলামের ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার। তোমরা মসজিদের খোলা দরজাগুলোর দিকে তাকাও। ওগুলো তোমরা বন্ধ করে দেবে, শুধু আবু বকরের দরজা ছাড়া।'

রাসূলুল্লাহ তাঁর জীবনের শেষপ্রান্তে এসে সবার সামনে আবু বকরের উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানিত অবস্থান সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছেন। খলিল হলো বন্ধুত্বেরও ওপরে একটি স্থান, যা অন্তরকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দেয়। যদি দুনিয়াতে রাসূলুল্লাহ কাউকে খলিল হিসেবে বেছে নিতেন, তাহলে সে স্থানটি আবু বকরের হতো। কিন্তু যেহেতু রাসূলুল্লাহ আল্লাহর খলিল, তাই আবু বকর হলেন তাঁর দ্বীনের ভাই, বন্ধু, সবচেয়ে আপনজন।

মসজিদে নববীর সাথে রাসূলুল্লাহর ঘর ছাড়াও আরও কিছু সাহাবিদের ঘর লাগোয়া ছিল আর সেই ঘর দিয়ে সরাসরি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করা যেত। সেগুলো ছিল অনেকটা ব্যক্তিগত দরজার মতো। রাসূলুল্লাহ বলছেন, কেবলমাত্র আবু বকরের দরজাই খোলা থাকবে আর বাকিগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। অনেক আলিম মনে করেন এই আদেশের মাধ্যমে আল্লাহর রাসূল তাঁর ইন্তেকালের পরে আবু বকরের খলিফা হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করছেন, তবে এটা তাঁর আদেশ ছিল না।

রাসূলুল্লাহ তাঁর উম্মাহকে নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। তিনি আশঙ্কা করতেন, তাঁর মৃত্যুর পর মুসলিমরা খ্রিস্টান ও ইহুদিদের অনুসরণ করা শুরু করতে পারে। মৃত্যুর চার দিন আগে তাই তিনি এই ব্যাপারে ওসিয়ত করে দিতে চাইলেন। তিনি বললেন,

'জাযিরাতুল আরব থেকে তোমরা ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুশরিকদের বের করে দেবে। আর প্রতিনিধিদলের সাথে আমি যেমন ব্যবহার করতাম, তেমন ব্যবহার করবে।'

আল্লাহর রাসূল দ্বীন ইসলামের বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করতে চেয়েছেন, তাই ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মকে সেখানে স্থান দিতে চাননি। তিনি ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ব্যাপারে আরও বললেন,

'আল্লাহর লানত ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের প্রতি। তারা তাদের নবীদের কবরের উপর মসজিদ বানাচ্ছে। তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে দিয়েছে।'

অর্থাৎ, তিনি মুসলিমদের নিষেধ করে দেন যেন তারা তাঁর কবরস্থানকে ইবাদাতের স্থান বানিয়ে না নেয়, যে ভুলটা ইহুদি ও খ্রিস্টানরা করেছে।

জীবনের অন্তিম পর্যায়ে আল্লাহর রাসূল আরও একটি বিষয়ের ওপর জোর দেন, সেটি হলো সালাহ। রাসূলুল্লাহ বলেন, সালাতের ব্যাপারে যত্নশীল হও। তিনি মুসলিমদের দাসদের প্রতি যত্নশীল হওয়ারও উপদেশ দেন। উপদেশ দেন নারীদের ব্যাপারে, যেন তাদের ওপর অবিচার করা না হয়। আর জিহাদের ব্যাপারে বলেন,

'মানুষ যখন জিহাদ ছেড়ে দেবে, তখনই অপদস্থ হবে।'
মৃত্যুর চার দিন আগ পর্যন্ত আল্লাহর রাসূল সালাতের ইমামতি করেছিলেন। কিন্তু ইশার ওয়াক্তে তাঁর শরীর এত খারাপ হয়ে গেল যে তিনি কোনোভাবেই উঠে দাঁড়াতে পারছিলেন না। বারবার বেঁহুশ হয়ে পড়ছিলেন। শেষ পর্যন্ত বললেন, আবু বকর যেন ইমামতির দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু আইশা চাচ্ছিলেন না তার বাবা আবু বকর সালাতে নেতৃত্ব দিক। তিনি বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার বাবা তো খুব নরম মনের মানুষ। আমি ভয় পাচ্ছি উনি যদি আপনার স্থানে দাঁড়ান তাহলে হয়তো উনার পক্ষে ইমামতি করাই অসম্ভব হয়ে যাবে।' রাসূলুল্লাহ আবার বললেন, 'আবু বকরকে বলো সালাতে ইমামতি করতে।' আইশা আবারও একই কথা বললেন। এভাবে তিনবার। এরপর রাসূলুল্লাহ বলেন, 'তোমরা নারীরা হলে ইউসুফের নারীদের মতো। আবু বকরকে বলো সালাতে ইমামতি করতে।'

ইউসুফের নারীর সাথে তুলনা দেওয়ার কারণ হলো, আযীযের স্ত্রী যখন অন্য নারীদের দাওয়াত দিয়েছিল, বাহ্যত মনে হবে, সেটা স্রেফ নারীদের জন্য একটা আসর বা আড্ডার আয়োজন। কিন্তু তার আসল উদ্দেশ্য ছিল সবাই যেন ইউসুফকে দেখতে পায়। অর্থাৎ,

তার মুখের কথা ছিল এক, আর মনের কথা ছিল আরেক। যখন আল্লাহর রাসূল আবু বকরকে দিয়ে ইমামতি করানোর আদেশ করেছেন, তখন আইশা কারণ হিসেবে দেখিয়েছিলেন তার বাবা খুব নরম মনের মানুষ, তাই তিনি ইমামতি করতে গিয়ে হয়তো আবেগপ্রবণ হয়ে পড়তে পারেন, কাজেই তিনি ইমামতি না করলেই ভালো। তবে আসল কারণ সেটা ছিল না। আসল কারণ কী ছিল সেটা আইশা পরবর্তীতে নিজেই বলেছেন, 'আমি চাইনি আমার বাবা সালাত পড়ান তার কারণ হলো, মানুষ হয়তো আল্লাহর রাসূলের স্থানে দাঁড়ানোর জন্য তাকে অপছন্দ করতে পারে।' আল্লাহর রাসূলের স্থানে অন্য কাউকে দেখতে উম্মাহ অভ্যস্ত নয়। কিন্তু আল্লাহর রাসূল আবু বকরকেই ইমামতির জন্য নির্ধারিত করে দিয়ে গেছেন।

আইশা বলেন, 'যখন রাসূলুল্লাহ অসুস্থ বোধ করতেন, তখন মুআউয়্যিযাত (সূরা নাস, সূরা ফালাক) পরে নিজের হাতে ফুঁ দিয়ে শরীরে মুছে নিতেন। কিন্তু এবার রাসূলুল্লাহ এতটাই অসুস্থ হয়ে পড়লেন যে নিজ হাতে সেটা করতে পারছিলেন না, তাই আইশা সূরাগুলো পড়ে রাসূলুল্লাহর হাতে ফুঁ দিতেন এবং তাঁর হাত

দিয়েই তাঁর শরীর মুছে দিতেন, কেননা রাসূলুল্লাহর হাত আইশার হাতের চেয়ে বেশি বরকতময়।

উসামা ইবন যাইদের সেনাবাহিনী অবস্থান করছিল মদীনার বাইরে জুরফে। রাসূলুল্লাহ খুব অসুস্থ হয়ে পড়লে উসামা ইবন যাইদ তাঁকে দেখতে মদীনায় আসলেন। রাসুলুল্লাহ তখন এতটাই অসুস্থ যে কথা বলার শক্তিটুকু পর্যন্ত ছিল না। উসামা ইবন যাইদ ৪৪ বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ও তাঁর হাত উঠিয়ে আমার দিকে ইঙ্গিত করলেন, আমি বুঝতে পারলাম রাসূলুল্লাহ আমার জন্য দুআ করছেন।' কী যন্ত্রণা আর কষ্টের মাঝেও রাসূলুল্লাহ উসামা ইবন যাইদের জন্য দুআ করছিলেন। এতে বোঝা যায় উসামার জন্য রাসূলুল্লাহর ভালোবাসা কত প্রবল ছিল।

মৃত্যুর দু'দিন আগে রাসূলুল্লাহ কিছুটা সুস্থ বোধ করছিলেন। তিনি মসজিদে যেতে চাইলেন। দুইজনের কাঁধে ভর করে মসজিদে প্রবেশ করলেন। সে সময় সালাতে ইমামতি করাচ্ছিলেন আবু বকর। রাসূলুল্লাহকে দেখতে পেয়ে আবু বকর পেছনে সরে আসতে

চাইলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ তাকে ইঙ্গিতে বোঝালেন যেন তিনি সেখানেই থাকেন। এরপর রাসূলুল্লাহ আবু বকরের পাশে গিয়ে বসলেন। আবু বকর তখন সালাতে রাসূলুল্লাহর অনুসরণ করলেন আর বাকিরা আবু বকরের অনুসরণ করে সালাত আদায় করলো।

উম্মাহর জীবনে বিষাদতম দিন

দিনটা ছিল সোমবার। আল্লাহর রাসূল সেদিন আমাদের ছেড়ে চলে যান। কেমন ছিল সেই দিন? ফজরের ওয়াক্তে আবু বকর মুসলিমদের সালাত পড়াচ্ছেন, রাসূলুল্লাহ ও তাঁর ঘরের পর্দা সরিয়ে মসজিদের ভেতর তাকালেন। তিনি চোখ ভরে তাঁর উম্মাহকে দেখছিলেন। তাঁর উম্মাহ সারিবদ্ধভাবে সালাহ আদায় করছে। তাওহীদের যে বীজ তিনি রোপণ করেছিলেন, সেই চারাগাছ আজ সুবিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়েছে। তাঁর দাওয়াহ সফল, তাঁর মিশন সম্পূর্ণ। মুসলিমরা আজ নিজেরাই জামাতবদ্ধ হয়ে সালাত আদায় করছে। রাসূলুল্লাহর মন এক অপার আনন্দে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেল।

তিনি মুচকি হাসলেন। রাসূলুল্লাহর হাসিমুখ দেখে সাহাবিরাও খুশিতে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। আনন্দের আতিশয্যে তাদের সালাত ভেঙে যাবার উপক্রম। আনাস ইবন মালিকের বর্ণনায়,

'আল্লাহর রাসূলের মুখ সেদিন যেন কুরআনের পাতার মতো ঝলমল করছিল।'

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

'তাঁর চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল যেন এক ফালি চাঁদ।'

আবু বকর রাসূলুল্লাহকে ইমামতিতে দাঁড়ানোর সুযোগ করে দিতে পেছনে ফিরে আসছিলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ইশারায় জানিয়ে দিলেন তারা যেন নিজেরাই সালাত আদায় করে নেন। এরপর রাসূলুল্লাহ পর্দা ফেলে আবার ভেতরে চলে গেলেন।

রাসূলুল্লাহ ও তাঁর উম্মাহর সর্বশেষ যে দৃশ্যটি দেখেছেন সেটি হলো সালাতের জামাত। এই দৃশ্য দেখেই রাসূলুল্লাহর মন আনন্দে ভরে উঠেছিল। নিশ্চয়ই তাওহীদের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো সালাহ।

রাসূলুল্লাহকে দাঁড়াতে দেখে সাহাবিরা হয়তো উন্নতি হয়েছে। তাই আবু বকর করতে আস-সুনহে চলে গেলেন, সেটা ছিল ভাবলেন রাসূলুল্লাহর শারীরিক অবস্থার উন্নতি দেখে আবু বকর (রা:)অনুমতি নিয়ে তার দ্বিতীয় স্ত্রীর সাথে দেখা করতে মদীনার কিছু দূরে গিয়েছিলেন।

সোমবারের ফজর সালাহ ছিল রাসূলুল্লাহর শেষ সালাহ। আইশার ভাই আবদুর রহমান তাদের ঘরে এলেন, তার হাতে একটা মিসওয়াক ছিল।

আইশা তাঁর চাহনি দেখেই বুঝতে পারলেন রাসূলুল্লাহ মিসওয়াকটি ব্যবহার করতে চাইছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি এটা চান?' রাসূলুল্লাহ ইঙ্গিতে বললেন, হ্যাঁ চাই। আইশা তখন মিসওয়াকটি তার ভাইয়ের কাছ থেকে নিয়ে এর অন্য পাশ নরম করে রাসূলুল্লাহকে এগিয়ে দিলেন। আইশা বলেন, তিনি এমনভাবে মিসওয়াক করছিলেন যে দেখে মনে হচ্ছিল যেন তিনি একদম সুস্থ। জীবনের একদম শেষ প্রান্তে এসেও রাসূলুল্লাহ মিসওয়াক ব্যবহারের সুন্নাহ ত্যাগ করেননি।

রাসূলুল্লাহর কষ্ট, যন্ত্রণা বাড়তে থাকে। তাঁর কষ্ট দেখে ফাতিমা বলে উঠলেন, 'বাবার কতই না কষ্ট হচ্ছে।' সেই কষ্টের মুহূর্তেও তিনি মেয়ের কথার উত্তর দিলেন, বললেন, 'আজকের দিনের পর তোমার বাবার আর কোনো কষ্ট নেই মা!'

মৃত্যুর মুহূর্তে আল্লাহর রাসূল শুয়ে ছিলেন আইশার পাত্রে হাত ভিজিয়ে বারবার নিজের মুখ মুছে বলছিলেন, মাবুদ নেই। নিশ্চয়ই মৃত্যু বড়ই কঠিন।' রাসূলুল্লাহ সেরা সৃষ্টি, তাঁকেও মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছিল। কোলে মাথা রেখে। পানির 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ছিলেন সমগ্র মানবজাতির

শেষ সময় ঘনিয়ে এল। রাসূলুল্লাহ ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে সূরা নিসার একটি আয়াত পড়ে আল্লাহর কাছে দুআ করছিলেন, বলছিলেন,

'হে আল্লাহ! আমাকে অন্তর্ভুক্ত করো নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎ ব্যক্তিদের

সাথে, যাদের আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন।

হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমার ওপর রহম করো। আমাকে সর্বোচ্চ সাথীর কাছে মিলিত করো।'

মৃত্যুর একেবারে শেষ মুহূর্তে আল্লাহর রাসূল তাঁর তর্জনী উপরে তুলে বলছিলেন,

ফীর-রফিকুল আ'লা।

ফীর-রফিকুল আলা।

ফীর-রফিকুল আলা।

রাসূলুল্লাহর ও চোখের পাতা ভারী হয়ে এল। রাসূলুল্লাহ ইন্তেকাল করলেন, দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন তাঁর সর্বোচ্চ সঙ্গী আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে। জীবনের শেষ মুহূর্তেও উচ্চারণ করছিলেন তাঁর জীবনভর চেয়ে যাওয়া ইচ্ছার কথা ওয়ালহিকনী বির-রফিকিল আ'লা আমাকে সর্বোচ্চ সঙ্গীর (আল্লাহ) সাথে সাক্ষাত করিয়ে দিন।

মুসলিম উম্মাহর জীবনের সবচেয়ে বড় দুর্যোগ ছিল রাসূলুল্লাহর । মৃত্যু। মুসলিম উম্মাহ হারালো তাদের সবচেয়ে আপনজনকে। মাথার ওপর ছায়া হয়ে থাকা নেতাকে, বাবার মতো বুকের মাঝে আগলে রাখা মানুষটাকে। ভয়ে-কষ্টে-বিপদে-দ্বন্দ্বে সবাই যার কাছে ছুটে যেতো, যার কাছে সবাই নির্বিঘ্নে সব সমস্যার কথা বলতে পারত, যিনি ছিলেন সবার আশ্রয়, সেই মানুষটা আজ চলে গেলেন। উম্মাহর জীবনে সবচেয়ে বড় ফিতনা সেই দিন। সবচেয়ে অন্ধকার আর বিষাদমাখা একটা দিন।

সাহাবিরা এই খবর মেনে নিতে পারলেন না। সবাই খুব বড়সড় একটা ধাক্কা খেলেন। কারো মাথা আর কাজ করছে না। কেউ স্তব্ধ হয়ে গেছে, কেউ নির্বাক হয়ে বসে পড়েছে, উঠে দাঁড়িয়ে কথা বলার মতো শক্তিটুকুও যেন আর নেই। কেউ কেউ তো রীতিমতো অবিশ্বাস করলেন। উমার ইবন খাত্তাব কোনোভাবেই মানতে পারলেন না রাসূলুল্লাহ তাদের ছেড়ে চলে গেছেন। মসজিদের দিকে ছুটে গেলেন, উমারের পিছু পিছু সবাই মসজিদের দিকে ছুটলো। চারদিকে হাহাকার, হৃদয়গুলো ক্ষত-বিক্ষত, আজ মদীনার বাতাস ভারী হয়ে আছে কান্নায়। রাসূলুল্লাহর মৃত্যুর সংবাদ মেনে নেওয়া সাহাবিদের জন্য কতটা কঠিন ছিল সেটা আমরা কখনো অনুভব করতে পারবো না, কারণ রাসূলুল্লাহর ও প্রতি আমাদের সেই পরিমাণ ভালোবাসাই নেই। সাহাবিরা রাসূলুল্লাহর ও সাথে বছরের পর বছর থেকেছেন। রাসূলুল্লাহ ছিলেন তাদের সব, সবকিছু। তাদের নেতা, তাদের পরামর্শদাতা, তাদের শিক্ষক, তাদের সুখ-দুঃখের বন্ধু, তাদের রাসূল!

উমার বলে উঠলেন,

'না! না। আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ ও মারা যাননি! তিনি তাঁর রবের সাথে সাক্ষাৎ করতে গেছেন, মুসা (আ) যেমন তাঁর রবের সাথে দেখা করতে চল্লিশ দিনের জন্য তাঁর সম্প্রদায়কে রেখে চলে গিয়েছিলেন আর এরপর আবার ফিরে এসেছেন। আল্লাহর রাসূলও তেমনি ফিরে আসবেন, অবশ্যই আসবেন, আল্লাহর কসম করে বলছি। আর ফিরে এসে তিনি তাদের হাত-পা কেটে ফেলবেন যারা বলছে তিনি মারা গেছেন।'

উমার ভাবতেই পারছেন না রাসূলুল্লাহ আর নেই। তিনি ভাবছেন, সব মুনাফিককে হত্যা করার আগে রাসূলুল্লাহ মারা যেতেই পারেন না। তরবারি কোষমুক্ত করে অবুঝের মতো উমার হুমকি দিয়ে বললেন, 'যে এ কথা বলবে যে রাসূলুল্লাহ মারা গেছে, আমি তার মাথা এই তরবারি দিয়ে আলাদা করে দেবো।'

যে উমার জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে অসম্ভব দৃঢ়তা দেখিয়েছেন, শক্তি-সাহস আর বীরত্বের পরিচয় দিয়ে যাকে সবাই চেনে, যাকে দেখে শয়তানও ভয়ে অন্য পথ ধরতো, সেই উমার আজ মুষড়ে পড়লেন। এমন কি হওয়ার কথা ছিল? হ্যাঁ, সাহাবিরাও মানুষ। রক্ত-মাংসের

জলজ্যান্ত মানুষ। যাদের শরীরে লাল রক্ত আছে আছে, যাদের আবেগ আছে, অনুভূতি আছে, দুর্বলতাও আছে। তাই উমারের মতো শক্ত-সমর্থ মানুষটাও সেদিন অবুঝ শিশুর মতো ভেঙে পড়েছিলেন।

কিন্তু একজন ভেঙে পড়েননি। সেই সংকটময় মুহূর্তে যখন কেউ নির্বাক, কেউ হতবিহ্বল, তখন একটা মানুষ বটবৃক্ষের মতো সব ঝড় সামলে নিলেন। কে সেই মানুষটি? আল্লাহর রাসূলের সবচেয়ে কাছের মানুষ, আল্লাহর রাসূলের বন্ধু, ভাই, সাহাবি আবু বকর। নবুওয়াতের প্রথম থেকে যেই মানুষটা পায়ে পায়ে রাসূলের সাথে লেগে ছিলেন, সেই আবু বকর। আল্লাহর রাসূলের সমস্ত সুন্নাহ, সমস্ত শিক্ষা যিনি বুক পেতে গ্রহণ করেছেন, সেই আবু বকর। আল্লাহর রাসূলের দাওয়াতের সবচেয়ে উত্তম দৃষ্টান্ত, আবু বকর ৪৪।

সবচেয়ে কাছের মানুষটিকে হারিয়েও তিনি ঈমানী শক্তিতে নিজেকে সামলে নিলেন। সমুদ্রে ঝড় উঠলে যেভাবে শক্ত হাতে জাহাজের হাল ধরতে হয়, তেমনি করেই পুরো উম্মাহর হাল ধরলেন তিনি। রাসূলুল্লাহর ইন্তেকালের সময়ে আবু বকর মদীনায় ছিলেন না, ছিলেন মদীনার কাছাকাছি আস-সুনহে। খবর পেয়ে তিনি সোজা আইশার ঘরে প্রবেশ করলেন। সেখানে রাসূলুল্লাহর শরীর কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল। রাসূলুল্লাহর মুখ অনাবৃত করে আবু বকর কেঁদে উঠলেন, রাসূলুল্লাহকে চুমু দিলেন আর বললেন, 'আপনি জীবিত অবস্থায়ও পবিত্র ছিলেন, মৃত্যুর পরও আপনি পবিত্র। আল্লাহর কসম, আল্লাহ আপনাকে দ্বিতীয়বার মৃত্যুবরণ করাবেন না। যে মৃত্যু আপনার জন্য নির্ধারিত ছিল, তা সম্পন্ন হয়ে গেছে।' এরপর আবু বকর আইশার এ ঘর থেকে বেরিয়ে মসজিদে গেলেন। সেখানে তখন উমার চিৎকার করছিলেন। উমারকে থামিয়ে আবু বকর বললেন, 'বসো, উমার, বসো।'

উমার আবু বকরের কথায় কোনো ভ্রুক্ষেপ করলেন না। আবু বকর আবার

বললেন, 'উমার, বসো বলছি, বসো।' তবুও উমার থামলেন না। আসলে উমার বলালিকভাবে এতটাই বিধ্বস্ত ছিলেন যে, কিচ্ছু বুঝে উঠতে পারছিলেন না। আবু বকর * উমারকে উপেক্ষা করেই সামনে এগিয়ে গেলেন। লোকেরা উমারকে মার বক তখন আবু বকরের কাছে ভিড় জমালো। তখন আবু বকরের ৪ সেই দিনের কথাগুলো উম্মাহ এত বছর পরেও স্মরণ করে। তিনি বলেছিলেন,

'যে মুহাম্মাদের ইবাদত করে, সে জেনে রাখুক মুহাম্মাদ মারা গেছে। আর যে আল্লাহর ইবাদত করতো সে জেনে রাখুক আল্লাহ চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই।'

এরপর তিনি কুরআনের একটি আয়াত পাঠ করলেন,

'মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল ব্যতীত অন্য কিছু নন। তাঁর আগেও অনেক রাসূল গত হয়েছেন। তাই যদি তাঁরও মৃত্যু হয়, তবে কি তোমরা পেছনে ফিরে যাবে? যারা পেছনে ফিরে যায়, তারা আল্লাহর কোনো ক্ষতিই করতে সক্ষম নয়। শীঘ্রই আল্লাহ কৃতজ্ঞদের পুরষ্কৃত করবেন।' (সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৪৪)
কথাগুলো শুনে উমার বসে পড়লেন, তিনি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলেন না। তার ভাষায়, 'আমি বুঝতে পারলাম আল্লাহর রাসূল আসলেই আর নেই।' এমন নয় উমার কুরআনের এই আয়াত জানতেন না, কিন্তু অদ্ভুত শূন্যতার সেই মুহূর্তে আবু বকরের মুখে আল্লাহ তাআলার এই আয়াত যেন ঝাঁকুনি দিয়ে সবার মাঝে সম্বিৎ ফিরিয়ে আনলো।

আল্লাহর রাসূলের মৃত্যু সংবাদে উমার ছিলেন দিশেহারা। উসমান হয়ে যান নির্বাক। আলী সবার থেকে লুকিয়ে কোথায় যেন চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু আবু বকর সূরা আলে-ইমরানের এই আয়াতটির অর্থ জানতেন যে, মুসলিমরা আল্লাহর জন্য বাঁচে, ব্যক্তি মুহাম্মাদের জন্য নয়। মুহাম্মাদ হলেন আল্লাহর রাসূল, তাঁর মৃত্যু হতে পারে, কিন্তু তাঁর আনীত দ্বীন চলবে কিয়ামত পর্যন্ত। সেদিন মদীনায় কত হাফেজ ছিল, কত আলেম ছিল, কিন্তু কেউ এই আয়াতকে কাজে লাগাতে পারলো না। সঠিক সময়ে সঠিক কাজ করেছিলেন মাত্র একজন, আল্লাহর রাসূলের গুণ ছায়া যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি, সেই আবু বকর । ইমাম কুরতুবি মন্তব্য করেন,

'সাহসিকতার মানে যদি হয় বিপদ আর কষ্টকর পরিস্থিতিতে দৃঢ় আর অবিচল থাকা, তবে আবু বকরের সাহসিকতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো কুরআনের এই আয়াত আর এই ঘটনা। কেননা রাসূলুল্লাহর স্তর মৃত্যুর চাইতে বড় ফিতনা উম্মাহর জীবনে হাল ছিল নাকামনি রাসূলুল্লাহর ও মৃত্যুর চড়য়ে পড়ার উপক্রম, তখন যিনি হাল ধরেছিলেন তিনি হলেন আবু বকর।'

আবু বকর আল্লাহর রাসূলের ৬ শিক্ষার সবটা আমল করেছিলেন, এজন্যই তিনি হলেন নবী-রাসূলদের পর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব।

নবীজীর দাফন

রাসূলুল্লাহর ও পরিবারের সদস্যরা রাসূলুল্লাহর গোসল ও দাফনের দায়িত্ব পালন করেন। এই কাজে নিয়োজিত ছিলেন আল আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব, আলী ইবন আবি তালিব, আল ফাযাল ইবন আব্বাস, কুসাম ইবন আব্বাস, উসামা ইবন যায়েদ এবং রাসূলুল্লাহর আযাদকৃত দাস শুকরান। আনসারী সাহাবি আওস ইবন খাওলি আলীকে বললেন, 'আল্লাহর কসম এবং রাসূলুল্লাহর ওপর আমাদের হকের দোহাই দিয়ে বলছি, আমাকে ভেতরে আসতে দিন।' তাকে ভেতরে আসতে দেওয়া হলো এবং তিনি গোসলের সময় উপস্থিত ছিলেন।

আইশা বলেন, 'গোসলের সময় তারা বললো, আমরা তো বুঝতে পারছি না, রাসূলুল্লাহর গায়ের কাপড় খুলে গোসল দেবো, যেভাবে করে আমরা অন্যদের গায়ের কাপড় খুলে গোসল দিই, নাকি কাপড় রেখেই যেভাবে আছে সেভাবে গোসল দেবো। যখন তারা এটা নিয়ে বিতর্ক করছিল, তখন আল্লাহ তাদের তন্দ্রাচ্ছন্ন করে দেন, সেই তন্দ্রায় তাদের প্রত্যেকের মাথা ঢলে পড়লো। এরপর ঘরের পাশ থেকে একটা আওয়াজ এল -- রাসূলুল্লাহর গায়ের কাপড় থাকা অবস্থাতেই তাকে গোসল দাও। কেউ জানে না এই কথা কে বলেছিল। তাই তারা রাসূলুল্লাহর জামার ওপর দিয়েই পানি ঢালে এবং তারা তাদের হাত না দিয়ে জামার ওপর দিয়ে তাঁর শরীর ঘষে দেয়।'

গোসল শেষে রাসূলুল্লাহর শরীরে তিন টুকরো কাপড় জড়ানো হলো। রাসূলুল্লাহর * জানাযার সালাত এক জামাতে আদায় করা হয়নি। আইশার ঘরে যতটুকু জায়গা হতো তত মানুষ আসতো, জানাযার সালাত আদায় করে চলে যেতো। এক দলের সালাত আদায় শেষ হলে আরেক দল এভাবে সালাত আদায় করা হলো। প্রথমে পুরুষরা, তারপর নারীরা,

তারপর শিশুরা আর সবশেষে দাসরা। রাসূলুল্লাহর সালাতে কোনো ইমাম ছিল না, প্রত্যেকে আলাদাভাবে সালাত আদায় করে।

রাসূলুল্লাহর শরীর ছিল আইশার ঘরে। উম্ম সালামা বলেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহর স্ত্রীরা খুব কাঁদছিলাম, কিন্তু তখন অতটুকু সান্ত্বনা ছিল যে আমরা রাসূলুল্লাহর মৃতদেহটা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু বুধবার গভীর রাতে যখন কবরের মাটি খোঁড়ার শব্দ পেলাম, তখন আমরা কান্নায় ভেঙে পড়ি, চিৎকার করে উঠি। মসজিদ থেকে আমাদের চিৎকার শুনতে পেয়ে তারাও চিৎকার করে কেদে উঠে। পুরো মদিনা শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ল।
ফজরের সময় হলে প্রতিদিনের মতোই বিলাল আজান দিতে গেলেন। 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল্লা ইলাহ

ইল্লাল্লাহ।' এরপর আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলতে গিয়ে আর বলতে পারলেন না, গলার কাছে আওয়াজগুলো যেন সব দলা পাকিয়ে গেল। কান্নায় ভেঙে পড়লেন বিলাল, আজান শেষ করতে পারলেন না। বিলাল ছিলেন আল্লাহর রাসূলের মুয়াজ্জিন, রাসুলের মৃত্যুর পর তিনি আর কারো জন্য আজান দেননি।

আইশার ঘরে খনন করা হলো রাসূলুল্লাহর কবর। নবীরা যে স্থানে মৃত্যুবরণ করেন, সেখানেই তাঁদের কবর দেওয়া হয়, এটাই নবীদের সুন্নাহ। আইশা একটি স্বপ্নে দেখেছিলেন তিনটি চাঁদ তার কোলে পতিত হয়েছে। আবু বকর এই স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বলেছিলেন, 'যদি তোমার স্বপ্ন সত্যি হয়, তাহলে পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠ তিন ব্যক্তির কবর তোমার ঘরে হবে।' যখন রাসূলুল্লাহর দাফনের সময় এল তখন আবু বকর বলেন, 'তোমার চাঁদগুলোর মধ্যে এটা হলো সর্বশ্রেষ্ঠ চাঁদ।'

রাসূলুল্লাহ মৃতদেহ কবরস্থ করার সময় এল। এই কাজটিও রাসূলুল্লাহর পরিবারের লোকেরা সম্পন্ন করলেন। কবরে নেমেছিলেন আলী, ফাদল ইবন আব্বাস, কুসাম ইবন আব্বাস আর শুকরান। একটি বর্ণনা অনুযায়ী, রাসূলুল্লাহকে কবরস্থ করার সময় মুগীরা ইবন শু'বা ইচ্ছে করে তার একটি আংটি কবরের মধ্যে ফেলে দেন এবং এরপর সবাইকে বলেন, 'দাঁড়ান, দাঁড়ান। আমার আংটিটা নিয়ে নিতে দিন।' এই বাহানায় তিনি রাসূলুল্লাহ

এর কবরে নামেন যেন তিনি রাসূলুল্লাহ স্পর্শ করা শেষ ব্যক্তিটি হতে পারেন। এরপর তিনি উঠে আসেন।

দাফনকাজ শেষ করে সবাই একে একে ফিরে এল। তখন ফাতিমা : আনাসকে বললেন, 'আনাস, তোমরা কীভাবে পারলে আল্লাহর রাসূলের শরীরের ওপর মাটি নিক্ষেপ করতে!' আসলে রাসূলুল্লাহর মৃত্যু, তাঁর গোসল, তাঁর দাফন সবই তাদের জন্য খুবই কষ্টদায়ক ছিল। সেজন্য রাসূলুল্লাহ বলেছেন, 'যখনই তোমাদের কারো উপর কোনো বিপদ আসবে, তখন আমার মৃত্যুর কথা স্মরণ করবে।' কারণ, একজন মুসলিমের ওপর সবচেয়ে বড় যে বিপদ আসতে পারে, সেটা ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে আর তা হলো আল্লাহর রাসূলের জীবনাবসান। আর কোনো মুসিবতই এর সাথে তুলনা করার মতো নয়। আনাস ইবন মালিক ছিলেন আল্লাহর রাসূলের ঘরে বড় হওয়া সাহাবি। তিনি বলেন,

'আমার জীবনের সবচেয়ে বিশেষ দিন দুইটা একটা সবচেয়ে আনন্দের, আরেকটা সবচেয়ে কষ্টের। আনন্দের দিনটি হলো রাসূলুল্লাহর ও মদীনায় আসার দিন। সেদিন সবকিছু ছিল আলোকিত। আর সবচেয়ে কষ্টের দিন হলো রাসূলুল্লাহর মৃত্যুর দিন। সেদিন সবকিছু যেন আঁধারে ছেয়ে গেল। রাসূলুল্লাহকে কবর দেওয়ার পর যখন আমরা হাত থেকে ধুলো ঝাড়ছিলাম, তখন থেকেই মনে হতে লাগলো, আমাদের অন্তরগুলো আর আগের মতো নেই।'

রাসূলুল্লাহর সাথে থাকা সাহাবিদের জন্য একটা অন্যরকম অনুভূতি। যখন তিনি

চলে গেলেন, তখন তাদের মনে হচ্ছিল যেন সবকিছু বদলে গেছে। একদিন আবু বকর আর উমার উমা আইমানের সাথে দেখা করতে যান। উমা আইমান তাদের দেখে কাঁদতে শুরু করেন। তারা জানতে চাইলেন, 'আপনি কেন কাঁদছেন?' উমা আইমান বললেন,

'আমি জানতাম আল্লাহর রাসূল একদিন না একদিন চলেই যাবেন। আমি কাঁদছি এ কারণে যে আর কখনো ওয়াহী নাযিল হবে না।'

তারা শুধু রাসুলল্লাহর অভাব বোধ করছিলেন তা নয়, তারা রাসূলুল্লাহর মাধ্যমে যে ওয়াহী পেতেন সেটার অভাবও অনুভব করছিলেন।

রাসূলুল্লাহ মারা যান হিজরী একাদশ বছরের বারো রবিউল আউয়াল। মৃত্যুর সময় রাসূলুল্লাহ ছিলেন সমগ্র আরবের অবিসংবাদিত শাসক। তিনি এমন একটা সময়ে চলে যান যখন অনারবের রাজা-বাদশাহরা তাঁকে সমীহ করতে শুরু করেছে। কিন্তু এই প্রতাপ আর প্রতিপত্তি থাকা মানুষটি কোনো সম্পদ রেখে যাননি। মৃত্যুর একদিন আগে তিনি সব দাস-দাসীকে মুক্ত করে দেন। সাত দিনার ছিল, সেগুলোও সাদাকা করে দেন। তাঁর একটি বর্ম এক ইহুদির কাছে বন্ধক রাখা ছিল। সেটার বিনিময়ে তিনি কিছু যব নিয়েছিলেন পরিবারের জন্য। তিনি রেখে গেছেন কেবল একটি সাদা খচ্চর, কিছু অস্ত্র আর এক টুকরো জমি। এই জমিটিও তিনি মুসাফিরদের জন্য সাদাকাহ করে দিয়ে গেছেন। না ছিল সম্পদের বাহার, না ছিল সোনা-রুপার বহর, কিছুই না।

তবে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ এই মানুষটি রেখে গেছেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্ম। সেই প্রজন্ম গড়েছে এক নতুন ইতিহাস। মুসলিম জাতির আগে দুনিয়ার বুকে আল্লাহর মনোনিত জাতি ছিল বনী ইসরাঈল। তাদেরকে সৎপথে টিকিয়ে রাখার জন্য আল্লাহ তাদের কাছে একের পর এক নবী পাঠাতেন। কিন্তু আল্লাহর রাসূল যে উম্মাহকে রেখে গেছেন, সে উম্মাহর জন্য আর কোনো নবী পাঠানোর প্রয়োজন নেই, শেষ নবীই তাদের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত যথেষ্ট। এটা মুসলিম উম্মাহর জন্য এক অভাবনীয় সম্মাননা।

আল্লাহর রাসূল যেখানে শেষ করেছেন, সাহাবিরা সেখান থেকে এক নতুন যুগের সূচনা করেছেন। সে যুগ গৌরবের, সে যুগ সমীহ জাগানিয়া। রাসূলুল্লাহর যাওয়ার অল্প ক'বছরের মাথায় পৃথিবীর তৎকালীন দুই পরাশক্তি রাসূলুল্লাহর চলে অনুসারী সাহাবিদের ভয়ে থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে। সে আরেক ইতিহাস। আপাতত, এতটুকুই।

ফেরার পথে

নবিজিকে কবরে রেখে বাড়ি ফিরে যাওয়ার সময় ঘনিয়ে আসে। এত দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে তারা বাড়ি ফিরবেন কী করে! দুনিয়ার সবকিছুই তার সমস্ত স্বাদ-গন্ধ, রং আর চমক হারিয়ে ফেলেছে। পথঘাটে, কাপড়-চোপড়ে, কণ্ঠস্বরে আর মানুষের চেহারায়, কেবল ধূসর রং। পুরো মদিনা মলিন ও নিষ্প্রভ চেহারায় দাঁড়িয়ে আছে স্তব্দ হয়ে। একটা হাহাকার, একটা অস্ফুট আর্তনাদ মদিনার বাতাসে ক্ষণে-ক্ষণে গুঞ্জরিত হতে থাকে।

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু সেই অনুভূতির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, 'আমরা নিজেদের যেন চিনতে পারছিলাম না।' শুধু অলিগলি আর পথঘাট নয়, আমরা যেন নিজেদেরই চিনতে পারছিলাম না।

তালহা ইবনু উবাইদিল্লাহর মনে হচ্ছিল, যেন তিনি তালহা নন। আবু হুরায়রার মনে হচ্ছিল, তার ভেতরে আবু হুরায়রা নয়, অন্য কারো বসবাস। আর আনাস ইবনু মালিক হারিয়ে ফেলেছিলেন স্বয়ং আনাস ইবনু মালিককে।

পাখিদের নীড়:

আবু বকর এবং উমার আল্লাহর রাসুলের স্মৃতি জাগ্রত রাখতে সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। একদিন তারা সিদ্ধান্ত নিলেন, উম্মু আইমানকে [১] দেখতে যাবেন। যেমনিভাবে আল্লাহর রাসুল তাকে দেখতে যেতেন। তারা যখন উম্মু আইমানের কাছে পৌঁছলেন, উম্মু আইমান কাঁদতে শুরু করলেন। তারা জানতে চাইলেন, 'আপনি কাঁদছেন কেন? নিশ্চয় আল্লাহর কাছে যা আছে, তা-ই তাঁর রাসুলের জন্য উত্তম।'

উম্মু আইমান বললেন, 'আমি জানি, আল্লাহর কাছে যা আছে তা-ই আল্লাহর রাসূলের জন্য উত্তম এবং আল্লাহর রাসুল যেখানে ছিলেন তার চেয়ে উত্তম স্থানে চলে গিয়েছেন। কিন্তু আমি কাঁদছি এই কারণে যে, আসমান থেকে ওহি আসা বন্ধ হয়ে গেল!'

উম্মু আইমানের এই কথায় আবু বকর ও উমার অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না। উম্মু আইমানের সাথে তারাও কাঁদতে লাগলেন।

আল্লাহর রাসুলের মৃত্যুর পর সাহাবিগণ হতবিহ্বল হয়ে পড়েন। সকল চেহারায় যেন তারা প্রিয় হাবিবের মুখ দেখতে পান, সমস্ত খুশবুতে যেন প্রিয় হাবিবের সুগন্ধি খুঁজে পান, সকল আওয়াজেই যেন কেবল তারই আওয়াজ শোনা যায়।

বিলাল ইবনু রাবাহর সেই দরাজ কণ্ঠের আজান কেমন যেন নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। আগের মতো আজানের সেই আওয়াজ আর ছড়িয়ে দিতে পারেন না তিনি। তার কণ্ঠনালি যেন অবশ হয়ে পড়েছে, আজান দেওয়া ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। তার

[১] উম্মু আইমান হচ্ছেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিচারিকা। যিনি শিশুবেলায় নবিজিকে মাতৃস্নেহে প্রতিপালন করেন। নবিজি তাকে শ্রদ্ধা করতেন, তার খোঁজখবর নিতেন।আজানের ধ্বনিতে আপন নীড়ে ফিরতে থাকা পাখিরা এখন উড়তে ভুলে গেছে। মহান মানুষটি এই পৃথিবীতে থাকাকালীন যেভাবে তারা আকাশে উড়ে বেড়াত, এখন আর সেভাবে উড়তে পারে না।

দুর্বল আর নিঃশেষিত হতে হতে বিলাল কিছুদিন মদিনায় অবস্থান করেন। নবিজির মসজিদ, তার মিম্বার, ঘরবাড়ি-সবকিছুই প্রতিমুহূর্তে বিলালকে স্মৃতির অনলে পোড়াতে থাকে। স্মৃতির দহন থেকে বাঁচতে বিলাল মদিনা ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। ব্যথিত চিত্ত হালকা করতে তিনি যাত্রা করেন শামের পথে। আহ বিলাল! সেই যাত্রাপথের প্রতিটি ধূলিকণা থেকেও যেন শোনা যাচ্ছিল কান্নার করুণ সুর। শোকের মাতমে যেন সেই পথের আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠেছিল।

স্মৃতির আঙিনা:

স্মৃতির যন্ত্রণা বড়ই অসহনীয়! স্মৃতির আঙিনায় যন্ত্রণা ফিরে আসে শতগুণ। মসজিদ ও মিম্বারে সেই ঘ্রাণ অনুভূত হয়, প্রতিটি কথায় তার সুরের ধ্বনি বেজে ওঠে। প্রতিটি আজানে

সেই বরকতময় চেহারা ভেসে ওঠে, সেই স্নিগ্ধ হাসির কমনীয়তা উদ্ভাসিত হয় হৃদয়ের আঙিনায়।

নিঃস্ব ও অসহায় মুআয! কেউ কাঁধে হাত দিলে চমকে তাকান, খুঁজে ফেরেন প্রাণের নবিকে। কিন্তু কোথায় সেই মহান মানুষটি? কোথায় সেই পবিত্র হাতের স্পর্শ? তিনি যে আর কোথাও নেই!

বিষণ্ণ ও শোকাহত আবু বকর। বাতাসের প্রবাহে যখন ঘরের দরজা কেঁপে ওঠে, দ্রুতপদে বের হয়ে আসেন। তবু দেখা মেলে না প্রিয়তম মানুষটির।

ছোট্ট শিশু আবু উমাইর। হায় আবু উমাইর! আর কেউ কখনো আসেনি তাকে জিজ্ঞেস করতে-কেমন আছে তোমার ছোট্ট নুগাইর?

সর্বহারা বিলাল! সেই মহান কণ্ঠস্বর তিনি আর কখনো শুনতে পাননি, যা তাকে সর্বদাই বলত-চলো বিলাল, আমাদেরকে সালাতে আহ্বানের মাধ্যমে প্রশান্তি দান করো।

অভাগা উমার! কেউ তাকে আর বলেনি-ভাই আমার, তোমার দুআয় আমাকে ভুলো না যাও।

দুখিনী মদিনা! তার আকাশে উদিত মহান আলোকরশ্মিটিকে সে হারিয়ে ফেলেছে চিরতরে। তার স্থলে-জলে, লতায়-পাতায়, ফুলে-ফলে ছড়ানো মুগ্ধকর সুবাসটিকে সে আর খুঁজে পাবে না কোথাও। মদিনা আজ নিঃস্ব, অসহায়। সে খুইয়ে ফেলেছে জগতের রহমতকে, হারিয়ে ফেলেছে ধরণির মহত্তম ও শ্রেষ্ঠতম মানুষটিকে।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

তথ্যসূত্র

১.রেইনড্রপস (সীরাহ)
২.সীরাতে খাতামুল আম্বিয়া
৩.মাহাবুবে খোদা
৪.আমার প্রানের নবী